ঐতিহাসিক সিরিজ উপন্যাস
সুলতান মাহমুদ গজনবীর
ভারত অভিযান

ভারত অভিযান - ৪

ভারত অভিযান

(চতুর্থ খণ্ড)

এনায়েতুল্লাহ

অনুবাদ
শহীদুল ইসলাম

এদারায়ে কোরআন
৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা -১১০০

প্রথম প্রকাশ ঃ সেপ্টেম্বর — ২০০৮

প্রকাশক ▶ **আরিফ বিল্লাহ্**, এদারায়ে কুরআন, ৫০, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, **স্বত্ব** ▶ সংরক্ষিত, **প্রচ্ছদ** ▶ নাজমুল হায়দায়

কম্পিউটার কম্পোজ ▶ এম. হক কম্পিউটার্স, মুদ্রণ ▶ সুবহান প্রিন্টিং প্রেস

মোবাইল ঃ ০১৭১৫-৭৩০৬১৬

মূল্য ঃ একশত ষাট টাকা মাত্র

BHAROT OVIJAN-3 : Writer Enayatullah, Translated by Shahidul Islam, Published by Edara-e- Quran, 50 Banglabazar, Dhaka-1100, Printed by Subhan Printing Press. Date of Publication September 2008.

RICE TAKA ONE HUNDRED SIXTY ONLY

ISBN 984-70109-0000-3 SET

উৎসর্গ

বঙ্গবীর মীর নেছার আলী তিতুমীর, যিনি স্বদেশীয় জাতীয়তা, ইসলামী ইতিহাস ঐতিহ্যকে সমুন্নত রাখার জন্যে এবং দখলদার বেনিয়াদ ইংরেজদের বিতারণের উদ্দেশ্যে সম্পূর্ণ ঈমানী শক্তিতে বলীয়ান হয়ে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন, যার ফলে ইংরেজ দখলদার গোষ্ঠী অনুভব করেছিল এ দেশকে আর বেশীদিন পদানত রাখা সম্ভব হবে না।

—অনুবাদক

প্রকাশকের কথা

আলহামদুলিল্লাহ! 'এদারায়ে কুরআন' কর্তৃক প্রকাশিত সুলতান মাহমূদ এর ভারত অভিযান সিরিজের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড পাঠক মহলে সাড়া জাগিয়েছে। এজন্য আমরা মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি এবং পাঠক মহলকে জানাচ্ছি মোবারকবাদ। নিয়মিত বিরতি দিয়ে এর প্রতিটি খণ্ড প্রকাশের ব্যাপারে আমাদের চেষ্টার কোন ত্রুটি ছিল না কিন্তু দেশের সার্বিক পরিস্থিতি ও মুদ্রণ সামগ্রির উচ্চমূল্য আমাদের টুঁটি চেপে ধরেছে। ফলে কিছুটা বিলম্বিত হয়েছে এই সিরিজের প্রকাশনা।

আল্লাহর অশেষ মেহেরবানীতে মাহে রমজান '০৮ এর বইমেলা উপলক্ষে এই সিরিজের চতুর্থ খণ্ডটি পাঠকের হাতে তুলে দিতে পেরে সুখানুভব করছি।

নানাবিধ সীমাবদ্ধতার পরও আমরা এ খণ্ডটি আগেরগুলোর চেয়ে আরো সুন্দর করার চেষ্টা করেছি। তবুও মুদ্রণ প্রমাদ ভুল-ত্রুটি থাকা স্বাভাবিক। বিজ্ঞমহলের কাছে যে কোন ত্রুটি সম্পর্কে আমাদের অবহিত করার বিনীত অনুরোধ রইল।

প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডের মতো চতুর্থ খণ্ডটিও পাঠক-পাঠিকা মহলে আদৃত হলে আমাদের সার্বিক প্রয়াস সার্থক হবে।

—প্রকাশক

লেখকের কথা

"মাহমূদ গজনবীর ভারত অভিযান" সিরিজের এটি চতুর্থ খণ্ড। উপমহাদেশের ইতিহাসে সুলতান মাহমূদ গজনবী সতের বার ভারত অভিযান পরিচালনাকারী মহানায়ক হিসেবে খ্যাত। সুলতান মাহমূদকে আরো খ্যাতি দিয়েছে পৌত্তলিক ভারতের অন্যতম দু' ঐতিহাসিক মন্দির সোমনাথ ও থানেশ্বরীতে আক্রমণকারী হিসেবে। ঐসব মন্দিরের মূর্তিগুলোকে টুকরো টুকরো করে ধূলিসাৎ করে দিয়েছিলেন মাহমূদ। কিন্তু উপমহাদেশের পাঠ্যপুস্তকে এবং ইতিহাসে মাহমূদের কীর্তির চেয়ে দুষ্কৃতির চিত্রই বেশী লিখিত হয়েছে। হিন্দু ও ইংরেজদের রচিত এসব ইতিহাসে এই মহানায়কের চরিত্র যেভাবে চিত্রিত হয়েছে তাতে তাঁর সুখ্যাতি চাপা পড়ে গেছে। মুসলিম বিদ্বেষের ভাবাদর্শে রচিত ইতিহাস এবং পরবর্তীতে সেইসব অপইতিহাসের ভিত্তিতে প্রণীত মুসলিম লেখকরাও মাহমূদের জীবনকর্ম যেভাবে উল্লেখ করেছেন তা থেকে বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মের বোঝার উপায় নেই, তিনি যে প্রকৃতই একজন নিবেদিতপ্রাণ ইসলামের সৈনিক ছিলেন, ইসলামের বিধি-বিধান তিনি অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলতেন। জাতিশত্রুদের প্রতিহত করে খাঁটি ইসলামী শাসন ব্যবস্থা সম্প্রসারণ ও দৃঢ় করণের জন্যেই নিবেদিত ছিল তার সকল প্রয়াস। অপলেখকদের রচিত ইতিহাস পড়লে মনে হয়, সুলতান মাহমূদ ছিলেন লুটেরা, আগ্রাসী ও হিংস্র। বারবার তিনি ভারতের মন্দিরগুলোতে আক্রমণ করে সোনা-দানা, মণি-মুক্তা লুট করে গজনী নিয়ে যেতেন। ভারতের মানুষের উন্নতি কিংবা ভারত কেন্দ্রিক মুসলিম সালতানাত প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা তার কখনো ছিলো না। যদি তৎকালীন ভারতের নির্যাতিত মুসলমানদের সাহায্য করা এবং পৌত্তলিকতা দূর করে ইসলামের আলো ছড়িয়ে দেয়ার একান্তই ইচ্ছা তাঁর থাকতো, তবে তিনি কেন মোগলদের মতো ভারতে বসতি গেড়ে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা গড়ে তুলতেন না? ইত্যাকার বহু কলঙ্ক এঁটে তার চরিত্রকে কলুষিত করা হয়েছে।

মাহমূদ কেন বার বার ভারতে অভিযান চালাতেন? মন্দিরগুলো কেন তার টার্গেট ছিল? সফল বিজয়ের পড়ও কেন তাকে বার বার ফিরে যেতে হতো গজনী? ইত্যাদি বহু প্রশ্নের জবাব; ইসলামের জন্য নিবেদিত প্রাণ সৈনিক সুলতান মাহমূদকে তুলে ধরার জন্যে আমার এই প্রয়াস। নির্ভরযোগ্য দলিলাদি ও বিশুদ্ধ ইতিহাস ঘেটে আমি এই বইয়ে মাহমূদের

প্রকৃত জীবন চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। প্রকৃত পক্ষে সালাহ্ উদ্দীন আইয়ুবীর মতোই মাহমূদকেও স্বজাতির গাদ্দার এবং বিধর্মী পৌত্তলিকদের বিরুদ্ধে একই সাথে লড়াই করতে হয়েছে। যতো বার তিনি ভারত অভিযান চালিয়েছেন, অভিযান শেষ হতে না হতেই খবর আসতো, সুযোগ সন্ধানী সাম্রাজ্যলোভী প্রতিবেশী মুসলিম শাসকরা গজনী আক্রমণ করছে। কেন্দ্রের অস্তিত্ব রক্ষার্থে বাধ্য হয়েই মাহমূদকে গজনী ফিরে যেতে হতো। একপেশে ইতিহাসে লেখা হয়েছে, সুলতান মাহমূদ সতের বার ভারত অভিযান চালিয়েছিলেন, কিন্তু একথা বলা হয়নি, হিন্দু রাজা-মহারাজারা মাহমূদকে উৎখাত করার জন্যে কতো শত বার গজনীর দিকে আগ্রাসন চালিয়ে ছিল।

সুলতান মাহমূদের বারবার ভারত অভিযান ছিল মূলত শত্রুদের দমিয়ে রাখার এক কৌশল। তিনি যদি এদের দমিয়ে রাখতে ব্যর্থ হতেন, তবে হিন্দুস্তানের পৌত্তলিকতাবাদ সাগর পাড়ি দিয়ে আরব পর্যন্ত বিস্তৃত হতো।

মাহমূদের পিতা সুবক্তগীন তাকে অসীয়ত করে গিয়েছিলেন, "বেটা! ভারতের রাজাদের কখনও স্বস্তিতে থাকতে দিবে না। এরা গজনী সালাতানাতকে উৎখাত করে পৌত্তলিকতার সয়লাবে কাবাকেও ভাসাতে চায়। মুহাম্মদ বিন কাসিমের সময়ের মত ভারতীয় মুসলমানদেরকে হিন্দুরা জোর জবরদস্তি হিন্দু বানাচ্ছে। এদের ঈমান রক্ষার্থে তোমাকে পৌত্তলিকতার দুর্গ গুড়িয়ে দিতে হবে। ভারতের অগণিত নির্যাতিত বনি আদমকে আযাদ করতে হবে, তাদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌছাতে হবে।"

আলবিরুনী, ফিরিশ্‌তা, গারদিজী, উতবী, বাইহাকীর মতো বিখ্যাত ও নির্ভরযোগ্য ইতিহাসবিদগণ লিখেছেন, সুলতান মাহমূদ তৎকালীন সবচেয়ে বড় বুযুর্গ ও ওলী শাইখ আবুল হাসান কিরখানীর মুরীদ ছিলেন। তিনি বিজয়ী এলাকায় তার হেদায়েত মতো পুরোপুরি ইসলামী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

তিনি নিজে কিরখানীর দরবারে যেতেন। কখনও তিনি তাঁর পীরকে তাঁর দরবারে ডেকে পাঠাননি। উপরন্তু তিনি ছদ্মবেশে পীর সাহেবের দরবারে গিয়ে ইসলাহ ও পরামর্শ গ্রহণ করতেন। তিনি আত্মপরিচয় গোপন করে কখনও নিজেকে সুলতানের দূত হিসেবে পরিচয় দিতেন। একবার তো আবুল হাসান কিরখানী মজলিসে বলেই ফেললেন, "আমার একথা ভাবতে ভালো লাগে যে, গজনীর সুলতানের দূত সুলতান নিজেই হয়ে থাকেন। এটা প্রকৃতই মুসলমানের আলামত।"

মাহমূদ কুরআন, হাদীস ও দীনি ইলম প্রচারে খুবই যত্নবান ছিলেন। তাঁর দরবারে আলেমদের যথাযথ মর্যাদা ছিল। সব সময় তার বাহিনীতে শত্রু পক্ষের চেয়ে সৈন্যবল কম হতো কিন্তু তিনি সব সময়ই বিজয়ী হতেন। বহুবার এমন হয়েছে যে, তার পরাজয় প্রায় নিশ্চিত। তখন তিনি ঘোড়া থেকে নেমে ময়দানে দু'রাকাত নামায আদায় করে মোনাজাত করতেন এবং চিৎকার করে বলতেন, "আমি বিজয়ের আশ্বাস পেয়েছি, বিজয় আমাদেরই হবে।" বাস্তবেও তাই হয়েছে।

অনেকেই সালাহ্ উদ্দীন আইয়ুবী আর সুলতান মাহমূদকে একই চরিত্র ও বৈশিষ্ট্যের বীর সেনানী মনে করেন। অবশ্য তাদের লক্ষ্য উদ্দেশ্য একই ছিল। তাদের মাঝে শুধু ক্ষেত্র ও প্রতিপক্ষের পার্থক্য ছিল। আইয়ুবীর প্রতিপক্ষ ছিল ইহুদী ও খৃস্টশক্তি আর মাহমূদের প্রধান প্রতিপক্ষ ছিল হিন্দু পৌত্তলিক রাজন্যবর্গ। ইহুদী ও খৃস্টানরা সালাহ্ উদ্দীন আইয়ুবীর সেনাদের ঘায়েল করতো প্রশিক্ষিত সুন্দরী রমণী ব্যবহার করে নারী গোয়েন্দা দিয়ে আর এর বিপরীতে সুলতান মাহমূদের বিরুদ্ধে এরা ব্যবহার করতো শয়তানী যাদু। তবে ইহুদী-খৃস্টানদের চেয়ে হিন্দুদের গোয়েন্দা তৎপরতা ছিল দুর্বল কিন্তু সুলতানের গোয়েন্দারা ছিল তৎপর ও চৌকস।

তবে একথা বলতেই হবে, সালাহ্ উদ্দীন আইয়ুবীর গোয়েন্দারা যেমন দৃঢ়চিত্ত ও লক্ষ্য অর্জনে অবিচল ছিল, মাহমূদের গোয়েন্দারা ছিল নৈতিক দিক দিয়ে ততোটাই দুর্বল। এদের অনেকেই হিন্দু নারী ও যাদুর ফাঁদে আটতে যেতো। অথবা হিন্দুস্তানের মুসলিম নামের কুলাঙ্গররা এদের ধরিয়ে দিতো। তারপরও সালাহ্ উদ্দীন আইয়ুবীর চেয়ে সুলতান মাহমূদের গোয়েন্দা কার্যক্রম ছিল বেশি ফলদায়ক।

ইতিহাসকে পাঠকের কাছে সুখপাঠ্য, বিশেষ করে তরুণদের কাছে হৃদয়গ্রাহী করে পরিবেশনের জন্যে গল্পের মতো করে রচনা করা হয়েছে এই গ্রন্থ। বাস্তবে এর সবটুকুই সত্যিকার ইতিহাসের নির্যাস। আশা করি আমাদের নতুন প্রজন্ম ও তরুণরা এই সিরিজ পড়ে শত্রু-মিত্রের পার্থক্য, এদের আচরণ ও স্বভাব জেনে এবং আত্মপরিচয়ে বলীয়ান হয়ে পূর্বসূরীদের পথে চলার দিশা পাবে।

এনায়েতুল্লাহ
লাহোর।

বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

খুন কন্নৌজ আঘাতের পূর্বাঘাত

বর্তমান গযনী শহর তিন দশক ধরে একের পর এক পরাশক্তির আগ্রাসনে পর্যুদস্ত। দখলদার রাশিয়ার কবল থেকে দীর্ঘদিন রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর মুক্ত হয়ে মরার উপর খাড়ার ঘা এর মতো গৃহযুদ্ধের বিপর্যয় কাটিয়ে উঠতে না উঠতেই আবারো আমেরিকার আগ্রাসনের শিকার হয়েছে সুলতান মাহমূদের প্রিয় ভূমি গযনী। হয়েছে অত্যাধুনিক মারণাস্ত্রের পরীক্ষাগার। বিশ্বের সবচেয়ে বেশী ক্ষতিকর বোমাগুলোর বিস্ফোরণস্থল বানানো হয়েয়ে সুলতান মাহমূদের গযনীকে। ইসলাম বিদ্বেষী ইহুদী খ্রিস্টানদের হাইড্রোসেন বোমার গবেষণগারে পরিণত হয়েছে অমিততেজী স্বাধীন ঈমানদীপ্ত সুলতানের জন্মভূমি। শুধু গযনী নয় গোটা আফগানিস্তানের প্রতি ইঞ্চি জমি আজ বহুজাতিক বাহিনীর নিক্ষিপ্ত বোমা ও গোলার আঘাতে বিষাক্ত।

হাজার বছরের স্থাপনা ও ইসলামী ঐতিহ্যের চিহ্নগুলো বছরের পর বছর ধরে চলে আসা যুদ্ধান্মদনায় ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়ে হারিয়ে যেতে বসেছে। সেই সুলতান মাহমূদের দুর্বার অভিযান আর স্বজাতি ও ইসলামকে সুউচ্চে উচ্চকিত করার সেই সোনালি দিনগুলো আজকে শুধুই স্মৃতি। মুষ্টিমেয় লোক ছাড়া সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষই পার্থিব স্বার্থে স্বজাতির চিহ্নিত দুশমনদের সাথে বিনাশী দোস্তিতে মত্ত। জাতির ঘাড়ে চেপে বসেছে কথিত দেশপ্রেমিকের বেশে বিদেশী বরকন্দাজ। তবে গযনীর মাটি এখনো সম্পূর্ণ ভুলে যায়নি হয়নি তার অতীত।

এখনো গযনীর মাটিতে একদল আল্লাহর সৈনিকের পদচারণা রয়েছে। সুলতানি না থাকলেও মাহমূদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেই একদল অমিত সাহসী যোদ্ধা বিদেশী দখলদারদের বিতাড়িত করে গোটা আফগানিস্তানকে পুনর্বার

ইসলামী পতাকার ছায়াতলে আনার জন্যে অকাতরে জীবন বিলিয়ে দিচ্ছে। বিগত তিনদশক ধরেই গযনী ও সংশ্লিষ্ট এলাকার মায়েরা তাদের সন্তানদের পায়ে বেড়ি না বেঁধে আল্লাহর পথে জিহাদের জন্যে অনুপ্রেরণা যুগিয়ে যাচ্ছে। আজো শত শত কন্যা জায়া জননী তাদের পিতা স্বামী সন্তান ভাইকে ইসলামের জন্যে উৎসর্গ করছে। বিলীন হয়ে যায়নি সুলতান মাহমূদের স্মৃতি, হারিয়ে যায়নি সুলতান মাহমূদের অভিযান। একদল মর্দেমুজাহিদ নিজেদের জীবন ও দেহের তাজা খুন ঢেলে দিয়ে নতুন করে রচনা করছে ত্যাগ ও জীবন দানের নতুন ইতিহাস। ঈমান ও ইসলামকে আল্লাহর জমিনে প্রতিষ্ঠিত করার নতুন অধ্যায়।

একজন মূর্তি সংহারীর জন্মভূমি হিসেবেই শুধু ইতিহাসে গযনী স্মরণীয় ছিল না। গযনী খ্যাতি পেয়েছিল সেখানকার অসাধারণ স্থাপত্য কীর্তি ও অসংখ্য শৈল্পিক ধাচে নির্মিত দালান কোঠা ও বড় বড় অট্টালিকার জন্যে।

সুলতান মাহমূদ কন্নৌজ বিজয়ের পর হিন্দুস্তান থেকে গযনী ফিরে এসে তৎকালীন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ নির্মাণশিল্পীদের দিয়ে গযনীতে মর্মর পাথরের একটি ঐতিহাসিক মসজিদ নির্মাণ করিয়েছিলেন। সেই সাথে মসজিদ সংলগ্ন স্থানেই গড়ে তুলেছিলেন সর্বাধুনিক কারিকুলাম ও তথ্যসমৃদ্ধ একটি বিশ্ববিদ্যালয়। সেই সময়ের সব জ্ঞান-বিজ্ঞানই এ বিশ্ববিদ্যালয়ে চর্চিত হতো।

এ মসজিদ নির্মিত হয়েছিল মথুরা জয়ের স্মারক হিসেবে। হিন্দুস্তান অভিযানে যেসব মুজাহিদ শাহাদত বরণ করেছিল তাদের স্মৃতি হিসেবে তিনি সুউচ্চ মিনার নির্মাণ করেন। কারণ, মথুরা ভারতের হিন্দুদের কাছে এমনই পবিত্র যেমনটি মুসলমানের কাছে মক্কা মদীনা।

মথুরা হিন্দুদের দেবতা শ্রীকৃষ্ণের জন্মভূমি। মথুরার প্রধান মন্দিরের মূর্তিগুলোকেও পবিত্র বলে মনে করা হতো।

মসজিদ তৈরি করার জন্যে দেশ-বিদেশ থেকে নামী-দামী নির্মাণ শিল্পীদের আনা হলো। তারা সুলতান মাহমূদের কল্পনা ও ভাবনার চেয়েও বেশী সুন্দর মসজিদ নির্মাণ করে ফেলল। সুলতান মাহমূদ মসজিদের দেয়াল গাত্রের বিভিন্ন কারুকার্যে সোনা-রুপা গলিয়ে কারুকার্যকে আরো দৃষ্টিনন্দন করে তুললেন। মসজিদের ভেতরে সুদৃশ্য গালিচা বিছানো হলো। মসজিদ সংলগ্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে

বিভিন্ন ভাষার গ্রন্থরাজি সংগ্রহ করা হলো। বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে একটি যাদুঘরও তৈরী করা হলো। সেখানে সংরক্ষণ করা হলো বিভিন্ন ঐতিহাসিক নিদর্শন।

সুলতান মাহমূদ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষার্থী ও গবেষকদের জন্যে আলাদা তহবিল গড়ে তুললেন।

মসজিদ ও বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণে সুলতানের আগ্রহ দেখে গযনীর বিত্তশালী ব্যক্তি ও সরকারের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারাও তাদের রুচি ও আভিজাত্যের সমন্বয়ে বহু মসজিদ, নান্দনিক স্থাপত্যশৈলীর বাড়ি নির্মাণ করলেন। ফলে গযনী শহর আধুনিক স্থাপত্য শিল্প ও ইমারতে জাকজমকপূর্ণ হয়ে উঠলো। সুলতান মাহমূদ ও তার প্রিয় গযনীবাসীর এই উন্নতি এমনিতেই হয়নি। এ জন্যে তাকে একের পর এক অভিযান পরিচালনা করতে হয়েছে।

আধুনিক গযনী গড়ে ওঠার মূলে হাজারো গযনীবাসীর জীবন যৌনব বিসর্জন দিতে হয়েছে। গযনীর হাজার হাজার মর্দেমুজাহিদদের লাশ গযনী থেকে দূরে বহু দূরে বুলন্দশহর, মথুরা, মহাবন, কন্নৌজের মাটিতে, গঙ্গা যমুনার স্রোতধারায় ভেসে গেছে। যমুনা গঙ্গার তীরে হাজারো মুজাহিদের লাশ কবর দিতে হয়েছে। যাদের চিহ্নও কালের স্রোতে হারিয়ে গেছে। সেইসব মর্দেমুজাহিদ হিন্দুস্তানের কুফরীর জগদ্দল পাথর থেকে সেখানকার নির্যাতিত নিপীড়িত সাধারণ মানুষদের মুক্তি দেয়ার এক অদৃশ্য বাসনা নিয়ে স্ত্রী, পুত্র, পিতামাতা আত্মীয়-স্বজন ছেড়ে গযনী থেকে শত শত মাইল দূরবর্তী হিন্দুস্তান অভিযানে শরীক হয়েছিলেন। তাদের ঈমানী শক্তি, বিজয়ের জয়দীপ্ত ব্যাকুলতা, আল্লাহর বাণীকে কুফরস্তানে উচ্চকিত করার আকাঙ্ক্ষা তাদেরকে স্থির থাকতে দেয়নি। তাদের হৃদয়ে ছিল আল্লাহ্ প্রেমের আগ্নেয়গিরি। বুকের ভেতরে ছিল কুফরী নির্মূলের দাবানল। ঈমানের উত্তাপ তাদেরকে আমৃত্যু লড়াই করে যেতে অনিঃশেষ শক্তি সঞ্চার করেছিল।

১০১৮ সালের শেষ দিকে সুলতান মাহমূদের সৈন্যরা মথুরা থেকে বুলন্দশহর পর্যন্ত প্লাবনের মতো ছড়িয়ে পড়ে। এখনো ওই অঞ্চলের মানচিত্র খুলে ধরলে তাদের দুর্ধর্ষ অভিযানের কথা বিস্ময়কর মনে হয়। এমনও হয়েছে একটি অভিযান চালাতে গিয়ে তাদেরকে প্রমত্তা গঙ্গা কয়েকবার পাড়ি দিতে

হয়েছে। সমর বিশারদগণ অভিভূত হয়ে যান গযনী থেকে তিন মাসের দূরত্বে এসে এমন কঠিন ও বন্ধুর পথ অতিক্রম করে শত বেড়াজাল ডিঙিয়ে একের পর এক দুর্গ ও যুদ্ধে জয়লাভ করলো কিভাবে তা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে কোন যুদ্ধবাজ জেনারেলের পক্ষে সম্ভব ছিলো না বলে তারা অকপটে স্বীকার করেছেন। এজন্য দরকার ছিল অস্বাভাবিক ধীশক্তির দূরদর্শী সামরিক জ্ঞান ও অলৌকিক শক্তিতে বলীয়ান কোন নেতৃত্বের। বাস্তবে এসব গুণাবলীর সমন্বয় ছিল সুলতান মাহমূদের মধ্যে। সুলতান মাহমূদ শুধু একজন সমরনায়কই ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন ন্যায়পরায়ণ, খোদাভীরু শাসক। নিজেকে যিনি আল্লাহর জমিনে আল্লাহর প্রতিনিধির উর্ধ্বের মনে করতেন না।

মথুরা ছিল সুলতান মাহমূদের জন্যে খুব মূল্যবান টার্গেট। যে কোন মূল্যে হিন্দুরা মথুরাকে সুলতানের কব্জা থেকে রক্ষার জন্যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলো। কিন্তু সুলতান হিন্দুদের সকল দর্প চূর্ণ করে মথুরাকে দখল করে নেন এবং হাজার হাজার বছরের প্রাচীন মূর্তি গুড়িয়ে দেন। মথুরার ঐতিহাসিক দেবমন্দিরে মুসলমানরা আযানের উচ্চকিত করে এবং মন্দিরকে মসজিদে রূপান্তর ঘটায়।

মথুরা বিজয়ের পর ক্লান্ত শ্রান্ত যোদ্ধাদের খানিক বিশ্রাম দেয়ার জন্যে সুলতান সেখানে কয়েকদিন অবস্থান করেন। এই অবসরে তিনি কন্নৌজ অভিযানের প্রস্তুতি নেন। সেনাবাহিনীকে নতুন করে বিন্যাস করেন।

কন্নৌজ সম্পর্কে গোয়েন্দারা সুলতানকে খবর দিয়েছিল, কন্নৌজ বিজয় সহজসাধ্য হবে না। কারণ, হিন্দুস্তানের অন্যান্য রাজা মহারাজাদের কাছে কন্নৌজের মহারাজা অত্যন্ত মর্যাদার অধিকারী।

বাস্তবেও কন্নৌজের মহারাজা রাজ্যপাল ছিলেন বুদ্ধিমান। এ কারণে কন্নৌজ আক্রমণের আগে সুলতান মাহমূদ সৈন্যদের কিছুটা বিশ্রাম দিয়ে তাদের ক্লান্তি দূর করে নতুন করে সেনা কমান্ড সাজানোর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন। কন্নৌজ আক্রমণের আগেই তিনি আশপাশের এলাকায় তার গোয়েন্দাদের ছড়িয়ে দিলেন।

তার গোয়েন্দাদের পাঠানো তথ্য মতে কন্নৌজের আগে আরো দুটো ছোট্ট রাজ্যের অস্তিত্ব পাওয়া গেলো। এই রাজ্য দুটোর শাসকেরা মহারাজা ছিলো না, তাদেরকে রায়বাহাদুর বলা হতো। এরা ছিল বড় রাজত্বের করদাতা ছোট

সামন্তরাজা। নিজেদেরকে রাজা হিসেবে ঘোষনা দেয়ার অধিকার তাদের ছিল না। কিন্তু তারা সীমিত আকারে সৈন্য লালন পালন ও কর আদায় করতে পারতো। এই রায়দের একজন ছিলেন রায়চন্দ্র। রায়চন্দ্র ছাড়াও আরো বেশ কয়েকটি ছোট্ট রাজ্য ছিল কন্নৌজ রাজা রাজ্যপালের অধীন।

সুলতান মাহমূদের স্থানীয় গোয়েন্দাদের খবরে জানা যায়, লাহোরের মহারাজা ভীমপালও এই অঞ্চলেই অবস্থান করছেন। রাজা ভীমপাল এই অঞ্চলের রাজাদেরকে সুলতানের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ করে তুলছেন এবং তাদের মধ্যে ঐক্য গড়ে তুলতে চেষ্টা করছেন। রাজা ভীমপালের পক্ষে সুলতান মাহমূদের মুখোমুখি হওয়া সম্ভব ছিলো না। কারণ, তিনি ছিলেন সুলতানের কাছে বশ্যতা স্বীকারকারী অধীনতামূলক চুক্তিতে আবদ্ধ। ভীমপাল সুলতানের সাথে কোনরূপ যুদ্ধ না করার চুক্তি করেছিলেন এবং সুলতানের সেনাবাহিনীকে সব ধরনের সহযোগিতা করার ব্যাপারটিও চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত ছিলো।

সুলতান মাহমূদ ভীমপালকে খুঁজে বের করে জীবিত গ্রেফতার করে নিয়ে আসার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু গোয়েন্দারা গভীর অনুসন্ধান করেও ভীমপালকে কোথাও খুঁজে পায়নি।

মথুরা থেকে প্রায় দেড়শ মাইল দূরে গঙ্গা নদীর ডান তীরে ছিল কন্নৌজ শহর। আর যমুনা নদীর ডান তীরে ছিল মথুরা শহর। ফলে সুলতান মাহমূদকে উভয় নদী অতিক্রম করতে হয়েছিল। কিন্তু নিরাপদে নদী পারাপারের জন্য সুলতানকে পথের কাঁটাস্বরূপ সকল হিন্দু রায় ও ছোট্ট ছোট্ট রাজাদেরকে অস্ত্রমুক্ত করতে হয়েছিল। অন্যান্য হিন্দু রাজাদের নিরস্ত্র না করলে আশংকা ছিল এরা সবাই মিলে কন্নৌজ অবরোধে ব্যস্ত সুলতানের বাহিনীর উপর পেছন থেকে আক্রমণ করে বসবে। সুলতান খুব দ্রুত অভিযান চালাতে চাচ্ছিলেন, যাতে কন্নৌজের সৈন্যরা প্রতিরোধ ব্যবস্থা অতটা শক্তিশালী না করতে পারে।

পথিমধ্যে যমুনা নদীর বাম পাড়ে মনুজ নামের একটি ছোট্ট দুর্গ ও রাজ্য ছিল। সে সময় এটিকে ব্রাক্ষণ দুর্গ নামেও ডাকা হতো। কন্নৌজ ও মনুজের মধ্যে ব্যবধান ছিল মাত্র সাতাশ মাইল। মনুজ ছিল হিন্দু রাজপুতদের আবাসস্থল। এরা ছিল স্বভাবজাত লড়াকু। এদের মেয়েরা পর্যন্ত যুদ্ধ বিগ্রহে পিছপা হতো না। মনুজের রাজপুতেরা ছিল কন্নৌজ রাজার খুবই বিশ্বস্ত। রাজা

রাজ্যপাল মনুজের রাজপুতদের সাথে সামরিক সখ্য গড়ে তুলেছিলেন। তাদের মধ্যে পারস্পারিক সামরিক সহযোগিতা চুক্তিও বিদ্যমান ছিল।

একদিন মনুজের কিছু অধিবাসী যমুনা নদীতে গোসল করছিল। পুরুষদের পাশাপাশি মহিলারাও নদীতে গোসল করছিল। সাধারণত তারা সকাল বেলায় গোসল সেরে নেয়াটাকে ধর্মীয় অনুসঙ্গ মনে করে। মনুজ দুর্গের অবস্থান ছিল একেবারে নদীর তীর ঘেঁষে। হঠাৎ মহিলাদের মধ্যে চেচামেচি শুরু হয়ে গেল। তারা নদী থেকে হাচড়ে পাছড়ে উঠে বাড়ীর দিকে দৌড়াতে শুরু করল। মহিলাদের আর্তচিৎকার শুনে পুরুষেরা দৌড়ে এলো। তারা মনে করল হয়তো নদীতে কোন জলহস্তি কিংবা কোন জলজ প্রাণী দেখে মহিলারা আতংকিত হয়েছে। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই তাদের ভুল ভেঙ্গে গেল। তারা নদীর পানিতে স্রোতের সঙ্গে মানুষের মরদেহ ভেসে আসতে দেখতে পেল এবং নদীর পানির রংও তাদের কাছে পরিপবির্তত মনে হলো।

প্রথমে তারা মাত্র কয়েকটি মরদেহ দেখতে পেয়েছিল। কিন্তু কিছুক্ষণ পর তাদের চোখে পড়ল সারি সারি লাশ। যেনো নদীতে পানি নয় শুধু মরদেহ প্রবাহিত হচ্ছে।

নদীর জলে স্নানরত যে ক'জন পুরোহিত ও পণ্ডিত শ্রেণীর লোক ছিল, তারা নদীতে হাঁটু গেড়ে বসে ভজন আওড়াতে শুরু করল। তারা ভয় ও আতংকে কাঁপছিল। তাদের কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে উচ্চারিত হচ্ছিল ভজন।

এই অবস্থা দুর্গের দেয়ালের উপর থেকে প্রহরীরা যখন দেখতে পেল, তাদের মধ্যেও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল। রাজপুতেরা ভীতু ছিলো না। যুদ্ধ বিগ্রহে তাদের মধ্যে কোন বেশ উৎসাহী ছিল। কিন্তু এতো বিপুল সংখ্যক মানুষের মরদেহ তাদের মধ্যে আতংক সৃষ্টি করল। তারা এটিকে কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ বলে অনুমান করল।

যে সব পুরোহিত নদী থেকে উঠে এসেছিল, তারা মন্দিরে এসে ঘণ্টা বাজাতে শুরু করল। মন্দিরের বিশেষ ঘণ্টার আওয়াজ শহরে আতংক ছড়িয়ে দিল। রাজা রায়চন্দ্রের কাছে যখন খবর পৌছালো, তিনি পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের জন্যে দ্রুত দুর্গ প্রাচীরে গিয়ে দাঁড়ালেন। রাজার সাথে তার একান্ত নিরাপত্তা কর্মকর্তা ও দরবারী লোকজনও দুর্গ প্রাচীরে সমবেত হলো।

অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে রাজা তার নিরাপত্তা কর্মকর্তা ও দরবারীদের উদ্দেশ্যে বললেন, 'তোমরা কি জানো এসব মরদেহ কোত্থেকে এসেছে?

এসব মরদেহ মথুরা ও মহাবনের অধিবাসীদের। তোমরা কি শোনানি, মুসলমানরা মথুরা ও মহাবন দখল করে ওখানকার সকল মন্দির ধ্বংস করে দিয়েছে?

রাজা রায়চন্দ্র দুর্গ প্রাচীরের উপর থেকে দেখতে পেলেন, লোকজন নদীতে লাশের সারি দেখে আতংকিত হয়ে দিক বিদিক দৌড়ে পালাচ্ছে।

আতংকিত মানুষদের দেখে রাজা রায়চন্দ্র তার সঙ্গীদের বললেন, দেখো, কাপুরুষদের কাণ্ড! নদীতে ক'টা মরদেহ দেখে ভয়ে নদী ছেড়ে পালাচ্ছে। এরা জানে না, এমন কাপুরুষের পরিচয় দিলে আমাদের সবার মরদেহ এভাবেই নদীতে ভেসে যাবে এবং আমাদের মেয়েরা মুসলমানদের বাঁদী দাসীতে পরিণত হবে।

দেখতে দেখতে মন্দিরে ঘণ্টা, শিংগার ফুৎকার ও ঢাকঢোলের আওয়াজ আরো অত্যুঙ্গে উঠলো। আতংকিত মানুষেরা ঘরে বাইরে সর্বত্র 'হরে রাম হরে কৃষ্ণ' ধ্বনি বলে চেচাতে লাগলো। ভীত সন্ত্রস্থ মহিলারা ঘর ছেড়ে রাস্তায় বেরিয়ে এলো। শহরের চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়লো দ্রুত সংক্রামক এক আতংক। অবস্থা দেখে রায়চন্দ্রের নিজের চেহারাও কালো হয়ে গেল। এক পর্যায়ে রাজা বলতে বাধ্য হলেন,

'বন্ধ কর এসব বাদ্য-বাজনা ও ঘণ্টা বাজানো! কি সব মাতম শুরু করেছো? রাজপুতেরা কার লাশ দেখে এমন মাতম শুরু করেছে? মন্দিরের পুরোহিতদের ডেকে আমার কাছে নিয়ে এসো। প্রহরীদের নির্দেশ দিলেন রায়চন্দ্র।

নির্দেশ শুনে রায়চন্দ্রের সৈন্যরা দৌড়ে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যে সব ধরনের ঘণ্টা ও ঢাকঢোলের বাজনা বন্ধ হয়ে গেল। শহরে নেমে এলো নীরবতা।

দুর্গ প্রাচীর থেকে রাজা রায়চন্দ্র নীচে নেমে জনসাধারণের সাক্ষাতের জন্যে সংরক্ষিত তার দরবারে গিয়ে বসলেন।

কিছুক্ষণ পর রাজদরবারের দু'জন পুরোহিত এবং তাদের সঙ্গে আরো একজনকে রাজার সম্মুখে হাজির করা হলো। তৃতীয় ব্যক্তির কাপড় চোপড়সহ

পুরো শরীর ছিল জবজবে ভেজা এবং তার অবস্থা ছিল একেবারে বিধ্বস্ত। রায়চন্দ্রকে জানানো হলো, এই লোকটিকে নদী থেকে জীবন্ত উদ্ধার করা হয়েছে। সে এক প্রস্ত কাঠ খণ্ডকে আঁকড়ে ধরে ভেসে আসছিল। রায়চন্দ্র জিজ্ঞেস করলেন, এই লোক কোথাকার? কোত্থেকে এসেছে সে?

লোকটি ক্ষীণ কণ্ঠে বললো, এসব মরদেহ মহাবনের সৈন্যদের। আমিও মহাবনের সেনাবাহিনীর সদস্য। আমাদেরকে গোয়েন্দারা খবর দিয়েছিল, 'মুসলিম সৈন্যরা একের পর এক দুর্গ জয় করে আমাদের দিকে আসছে এবং তাদের গন্তব্য মথুরার দিকে।'

মহারাজা আপনি জানেন, মহাবন কী ভীষণ জঙ্গলাকীর্ণ এবং কতো দূর পর্যন্ত জঙ্গল বিস্তৃত। আমাদের মহারাজা কুয়ালচন্দ্র সকল সৈন্যদেরকে সারা জঙ্গল জুড়ে ছড়িয়ে দিলেন এবং তীরন্দাজদেরকে গাছে চড়িয়ে দিলেন। হস্তি বাহিনীকে জঙ্গলের একপাশে দাড় করিয়ে দিলেন। যাতে নির্দেশ পাওয়ার সাথে সাথে মুসলিম সৈন্যদের পিষে মারার জন্য অগ্রসর হতে পারে। কারণ এই জঙ্গল হয়েই মুসলমানদের অগ্রসর হওয়ার কথা ছিল।

এমনই ছিল আমাদের রণপ্রস্তুতি; কিন্তু কি করে কি ঘটে গেল এর পরের ঘটনা আমি আপনাকে কিছুই বলতে পারবো না।

হঠাৎ এক সময় জঙ্গলের দিকে মুসলমানদের কিছু সংখ্যক সৈন্যের উপস্থিতি দেখা গেল। আমাদের সৈন্যরা সামান্য সংখ্যক মুসলিম সৈন্য দেখে উত্তেজনায় চিৎকার শুরু করে দিল, 'একজনকেও জীবিত ফেরত যেতে দেবো না; সবাই ঘিরে ফেলো। এদেরকে জীবন্ত ধরে নিয়ে মথুরার মন্দিরের সামনে দাহ করা হবে'; ইত্যাদি বলে আমাদের সেনারা তুমুল চিৎকার শুরু করল।

কিন্তু দেখতে দেখতে অল্প সময়ের মধ্যে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বদলে গেল। তিন দিক থেকেই ঝড়ের মতো ধেয়ে আসলো মুসলিম বাহিনী। তিন দিক থেকেই গোটা জঙ্গলকে ঘিরে ফেলল। যে হস্তিবাহিনীর হাতিগুলোকে মুসলমানদের পিষে মারার জন্যে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছিল, এগুলো আর্তচিৎকার করে দিগ্বিদিক ছুটতে শুরু করল। আমাদের যে সব সৈন্য গাছে চড়ে বসেছিল মুসলিম তীরন্দাজদের তীরবিদ্ধ হয়ে এরা নীচে গড়িয়ে পড়তে শুরু করল। এক পর্যায়ে আমাদের সৈন্যরা পালাতে শুরু করল। আর মুসলিম

সৈন্যরা আমাদের পিছু ধাওয়া শুরু করল। ওরা গোটা জঙ্গল শত্রুমুক্ত করে অগ্রসর হচ্ছিল। অবস্থা দেখে মনে হচ্ছিল যেন তারা জঙ্গলের সকল বৃক্ষরাজি সমূলে উপড়ে সামনে অগ্রসর হচ্ছে।

পলায়নপর সৈন্যরা ছিল তিন দিক দিয়ে বেষ্টিত। ডানে বামে এবং সামনের দিকে বেষ্টন করে আসছিল মুসলিম বাহিনী। আমাদের সৈন্যদের পক্ষে পিছনে সরে যাওয়া ছাড়া কোন উপায় ছিল না। কিন্তু জঙ্গলের পিছন দিকে প্রবাহিত হচ্ছে যমুনা নদী। উপায়ন্তর না দেখে জীবন বাঁচাতে আমাদের সৈন্যরা দলে দলে নদীতে ঝাপিয়ে পড়তে শুরু করল। অক্ষত আহত সকল সৈন্যই যমুনা নদীতে ঝাপিয়ে পড়ল। কিন্তু তাতেও শেষ রক্ষা হলো না। মুসলমান তীরন্দাজরা নদীর তীর থেকে সাতরানো সৈন্যদের উপর তীর নিক্ষেপ শুরু করল আর তীর বিদ্ধ হয়ে আমাদের সৈন্যরা নদীতে ডুবতে থাকলো

মুসলিম সৈন্যরা আমাদের একজন যোদ্ধাকেও সাতরে ওপাড়ে উঠতে দেয়নি। যারা জীবন বাঁচাতে লম্বা ডুব দিয়েছিল। তাদের কাউকেই আর ভাসতে দেখা যায়নি। আমি একটি ভাসমান কাঠ মাথার উপর দিয়ে নিজেকে কোন মতে আড়াল করে ভাসতে ভাসতে এ পর্যন্ত এসেছি। এখানে এসে আমি তীরে পৌছার চেষ্টা করি। এরপর মহাবনে কি ঘটেছে আমি বলতে পারবো না মহারাজ!

তুমি বলতে না পারলেও আমি বলতে পারি। আমার কাছে শোন। ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললেন রাজা রায়চন্দ্র। তোমাদের রাজা কুয়ালচন্দ্র তার স্ত্রী সন্তানসহ আত্মহত্যা করেছেন। তার সেনাবাহিনীর সকল খ্যাতি মুসলমানরা কব্জা করে নিয়েছে এবং গযনীর সুলতান মাহমূদ মহাবনের সকল মন্দির থেকে দেবদেবীদের প্রতিমা অপসারণ করে গুড়িয়ে দিয়েছে। ওখানকার লোকেরা এখন মন্দিরের ঘণ্টাধ্বনী নয়, আযান শুনতে পাচ্ছে।

হরে রাম, হরে রাম, সেখানে উপস্থিত দুই পুরোহিতের কণ্ঠ চিড়ে বেরিয়ে এলো। প্রধান পুরোহিত বললো, এ সব নাচ্চার লোকদের উপর ভগবান এমন গজব ফেলবেন যে, এদের মৃতদেহ শিয়াল শকুনে কাড়াকাড়ি করে খাবে। কৃষ্ণবাসুদেবের গযব থেকে এদের শিশু সন্তানেরাও রক্ষা পাবে না।

মহারাজ! এ মুহূর্তে হরিহরি মহাদেব খুব মূল্যবান ত্যাগ চাচ্ছেন। দেবতার গযব থেকে বাঁচতে হলে আপনাকে দেবীর চরণে একজন কুমারী বলিদান করতে হবে। আমি আপনাকে হিসাব করে বলে দেবো, আপনাকে আর কি কি করতে হবে। আকাশের তারকাদের গতিপথ বদলে গেছে। আমি এখনই আপনাকে বলে দিচ্ছি। এখন পূর্ণিমা চলছে। সামনে অমাবশ্যা। সামনের সময়টা খুবই খারাপ। এখন থেকেই বিশেষ পূজাপার্বন শুরু করতে হবে। আমি আপনার ভাগ্য গুণে দেখব। ক্ষতিকর কিছু থাকলে সেটিকে সরানোর ব্যবস্থা করবো।

মহারাজ! দেবতাদের সন্তুষ্ট করতে বিলম্ব হলে বলিদানে কালক্ষেপণ করলে দেবীরা রুষ্ট হয়ে মুসলিম সন্তান জন্মাদান করতে শুরু করবেন। আমাদের দেবদেবীদের কোলকে ম্লেচের সন্তান ধারণ থেকে পবিত্র রাখার জন্যে আমাদের মহাদেবের চরনে একাধিক কুমারী বলি দিতে হবে।

পুরোহিতের কথায় রাজা রায়চন্দ্রের চেহারা থমথমে হয়ে উঠলো। চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছিল পুরোহিতের কথায় তিনি শুধু বিরক্তিবোধই করছেন না, রীতিমত ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছেন। ক্ষোভে উত্তেজনায় তার দীর্ঘ গোঁফ কাঁপছিল। তিনি কঠোর দৃষ্টিতে পুরোহিতের দিকে তাকিয়ে পুরোহিতকে থামিয়ে দিয়ে বললেন,

"থামুন! আপনি কি এটা বুঝাতে চান সুলতান মাহমূদের সাথে যুদ্ধের ফায়সালা মন্দিরে হবে? কুমারী বলি দিলে কি হবে? আপনি এদেরকে ক'দিন আপনার কাছে রাখবেন এরপর বলি দিয়ে দেবেন? তাতে কি যুদ্ধ জয় হবে? আপনি কেন বলেন না, এখানকার প্রতিটি মানুষকে লড়াই করতে হবে।

ছি! ছি! মহারাজ! পুরোহিত দু'হাতে কান ধরে বললো, একথায় আপনি ধর্মের অবমাননা করছেন! এটিতো ব্রাক্ষণদের দুর্গ। ব্রাক্ষণরা তো ভগবানের সন্তান। আমরা যা জানি, আপনি তা জানেন না। আপনি আকাশের নক্ষত্রের গতিপথ বদলাতে পারবেন না। বলিদান আপনাকে করতেই হবে।

বলিদান! বলিদান! রাগ উপচানো কণ্ঠে স্বগতোক্তি করলেন রাজা! বলি শুধু দু'তিন জন কুমারীর হবে না, এখানকার ছোট বড় প্রতিটি মানুষই রক্ত দেবে। রাজপুতদের প্রতিটি কুমারীই জীবন বিলিয়ে দেবে।

মনে রাখবেন পণ্ডিতজী! এই দুর্গকে লোকেরা ব্রাহ্মণদের দুর্গ বলে। এটি কিন্তু রাজপুতদের কেল্লা। রাজপুতেরা শত্রুর মোকাবেলায় একটি ভাষাই বুঝে, হয় শত্রুর মৃত্যু নয়তো নিজের আত্মদান। দরকার হলে রাজপুতেরা বিজয়ের জন্যে ধর্মকেও বিসজর্ন দিতে কুণ্ঠাবোধ করে না।

মহারাজ! প্রজাদের উপর একটু রহম করুন। বললো পুরোহিত। আমি যে কথা বলছি তা মেনে নিন। ধর্মকে বিসর্জন দেয়ার কথা আর মুখে আনবেন না।

আমাদের পায়ে আর ধর্মের শিকল দিবেন না, পণ্ডিতজী! রাজধানী বেহাত হয়ে যাচ্ছে, লোকজন ক্ষুধা পিপাসায় মারা যাচ্ছে। আমাদের হাতে গড়া এই জীবন সংসার ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। অথচ আপনাদের মতো ধর্মীয় নেতৃবর্গ আপনাদের ঢোলই বাজাচ্ছেন। কারণ, আপনাদের কখনো রনাঙ্গনে গিয়ে শত্রুর মুখোমুখি লড়াই করতে হয় না। মন্দিরে বসে বসে আপনাদের রসনা তৃপ্তিতে কোন বেঘাত ঘটে না, আর আপনাদেরকে মিষ্টি মণ্ডা খাইয়ে দিতে এবং শরীর মর্দনের জন্যে কুমারী তরুণীরও অভাব হয় না।

মহারাজ! মথুরার ধবংসযজ্ঞের খবর শুনে আর নদীতে ভাসমান বিপুল মরদেহের সারি দেখে আপনার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললো পুরোহিত। আপনি বুঝতে পারছেন না, আপনি আমাকেই অসম্মান করছেন না, আপনার নিজের ধর্মের অবমাননা করছেন।

কোন ধর্মের কথা বলছেন আপনি? পণ্ডিত মহারাজ! আপনি কি সেই ধর্মের কথা বলছেন, যে ধর্মকে লাথি মেরে বুলন্দ শহরের রাজাসহ দশ হাজার হিন্দু মুসলমান হয়ে গেছে।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, জানি মহারাজ! তারা তাদের জীবন বাঁচানোর জন্য ধর্ম ত্যাগ করেছে। বললো পুরোহিত। ওরা সবাই ছিল কাপুরুষ। মুসলমানদের তরবারীর জোর দেখে ওদের হাতে গ্রেফতার নয়তো নিহত হওয়ার ভয়ে এরা ধর্ম ত্যাগ করেছে।

না, আপনার কথা ঠিক নয় পণ্ডিত মহাশয়! এরা শুধু আতংক ও কাপুরুষতার জন্যে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেনি। তারা দেখে নিয়েছে, হিন্দুদের মন্দিরের বিশাল বিশাল দেব-দেবীর মূর্তি এবং ভগবানদের তারা না নিজেদের রক্ষা করতে পেরেছে, না তাদের কোন পূজারী রাজা প্রজাকে রক্ষা করতে পেরেছে।

রাজা রায়চন্দ্র ও পুরোহিতের বাক-বিতণ্ডার সময় সেখানে রাজার কুমারী বোন শিলা এবং যুবতী কন্যা রাধা উপস্থিত ছিল। দাঁড়ানো ছিল রাজার স্ত্রী রাণী লক্ষ্মী দেবী।

একপর্যায়ে শিলাকুমারী পুরোহিতের উদ্দেশ্যে বললো, পণ্ডিতজী মহারাজ! হিন্দুস্তানের নারীরা কি মন্দিরের অন্ধ প্রকোষ্টে পুরোহিতদের হাতে জীবন বিসর্জন দেয়ার জন্যই দুনিয়াতে এসেছে?

এখন আর কোন কুমারীকে বলিদান করা হবে না। গুরু গম্বীর আওয়াজে বললেন রাণী লক্ষীদেবী। আপনি যদি মনে করে থাকেন, মুসলমানদের এই ধ্বংসাত্মক আক্রমন দেবদেবীদের অভিশাপ। তাহলে এই অভিশাপ আমরা মোকাবেলা করবো।

রাণীর মুখেও রাজার কথার প্রতিধ্বনি শুনে রাগে ক্ষোভে উভয় পুরোহিত বিড় বিড় করতে করতে রাজার সম্মুখ থেকে চলে গেল। রাজা রায়চন্দ্রের বোন শিলা রাজার উদ্দেশ্যে বললো, দাদা! আপনি কি কখনো একথা ভেবেছেন গযনীর সুলতানকে যদি কোনভাবে হত্যা করা যায় তাহলে তার আক্রমণের আশংকা পুরোপুরিই শেষ হয়ে যাবে?

শুধু এটা কেন, আমাদেরকে অনেক কিছুই ভাবতে হচ্ছে শিলা। এই আক্রমণ প্রতিরোধের সম্ভাব্য সব দিকই আমি ভেবেছি। আমরা একটা কঠিন সময় অতিক্রম করছি। মাহমূদকে হত্যা করা সহজ ব্যাপার নয়। তবুও এ বিষয়টি আমি ভেবে দেখবো। সবার আগে আমাদেরকে এখন মহারাজা কন্নৌজের কাছে যেতে হবে। গযনীর সুলতান মথুরায় বসে থাকবে না এবং ওখান থেকেই গযনী ফিরে যাবে না। নিশ্চয়ই সে এদিকেও অভিযান চালাবে।

রাজা রায়চন্দ্র কন্নৌজ রওয়ানা হওয়ার জন্যে তার নিরাপত্তারক্ষীদের প্রস্তুতি নিতে নির্দেশ দিলেন।

* * *

রাজা রায়চন্দ্র, রাণীলক্ষী রৈী, বোন শিলা এবং কুমারী মেয়ে রাধাকে সঙ্গে নিয়ে তখনই কন্নৌজের পথে রওয়ানা হলেন। রায়চন্দ্রের সাথে তার কতিপয় উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, উজীর এবং নিরাপত্তারক্ষী। মাত্র সাতাইশ মাইল দূরে কন্নৌজ। সন্ধ্যার আগেই তারা কন্নৌজ পৌছে গেলেন।

রাতেই রাজা রায়চন্দ্র সার্বিক অবস্থা নির্য়ে কন্নৌজ মহারাজা রাজ্যপালের সাথে আলোচনা করলেন। মহারাজ রাজ্যপাল তাকে বললেন–

আমরা সামান্য শক্তি নিয়ে উন্মুক্ত ময়দানে মাহমূদের বিশাল বাহিনীর মোকাবেলা করতে পারবো না। মহাবন ও মথুরা থেকে যে সব লোক পালিয়ে এসেছে, তারা জানিয়েছে, উন্মুক্ত ময়দানে গযনী বাহিনীর মোকাবেলা করা অসম্ভব। আমাদের কেল্লাবন্দি হয়ে লড়াই করতে হবে। আমার আশাংকা হচ্ছে, মাহমূদ আপনাকেও অবরোধ করবে। কিন্তু তার মূল দৃষ্টি কন্নৌজের দিকে। সে যদি আপনাকে অবরোধ করে তাহলে পেছন থেকে আমি আক্রমণ চালিয়ে ওদের দুর্বল করে দেয়ার চেষ্টা করবো। আর যদি সে সরাসরি কন্নৌজ অবরোধ করে, তাহলে আমি আপনার কাছে আশা করবো, আপনি ওদের পিছন দিকে আক্রমণ অব্যাহত রাখবেন।

মুনাজের রাজা রায়চন্দ্র নিজেদের ব্যর্থতার জন্যে ক্ষোভে আক্রোশে উত্তপ্ত অবস্থায় ছিলেন। সকল ঐতিহাসিকগণই একবাক্যে একথা লিখেছেন, মুনাজের রাজপুত বংশের বীরত্বগাথা ছিল সে যুগে কিংবদন্তিতুল্য। রাজপুতদের মেয়েরাও পুরুষদের মতো লড়াই করতে জানতো। তারা ছিল খুবই আত্মভিমানী বীরদর্পী। উন্মুক্ত ময়দানে রাজপুতদের কাবু করার ব্যাপারটি সহজসাধ্য ছিল না। ব্রাহ্মণের প্রতি রাজপুতদের কিছুটা উষ্মা ছিল। রাজা রায়চন্দ্র যে ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের ধর্মোপদেশ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, তা ছিল পুরোহিতদের কাপুরুষতার বিপরীতে বীরত্বের বহিঃপ্রকাশ।

* * *

রাজা রায়চন্দ্রের বোন শিলা ও কন্যা রাধা উভয়েই ছিল কুমারী এবং সুন্দরী। তাদের রূপ সৌন্দর্যের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল বহুদূর পর্যন্ত। মহারাজা রাজ্যপালের ছেলে লক্ষণ পাল। কিন্তু রায়চন্দ্র শিলার বিয়ে লাহোরের রাজা

ভীমপালের ছোট ভাই তারালোচনের সাথে ঠিক করে রেখেছিলেন। মাহমূদ গযনীর এবারের ভারত অভিযান না হলে এতো দিনে এই বিয়ের অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়ে যেতো।

রাতের বেলায় রাজা রায়চন্দ্র এবং মহারাজা রাজ্যপাল রাজপ্রাসাদে যখন মাহমূদ গযনীর আক্রমণ প্রতিহত করার ব্যাপারে পরিকল্পনা আঁটছিলেন এবং তাদের মন্ত্রীবর্গও সামরিক কর্মকর্তারা আক্রমণ প্রতিরোধের পরিকল্পনা নিয়ে ব্যস্ত ছিল তখন রাজ্যপালের ছেলে লক্ষণ পাল রাজপ্রাসাদের বাগানের এক অন্ধকার কোনে দাঁড়িয়ে একজনের আগমনের অপেক্ষা করছিল। কিছুক্ষণ পর দু'জন নারী অন্ধকার ভেদ করে মূর্তির মতো সে দিকেই অগ্রসর হলো। একটু পথ গিয়ে একজন থেমে অপরজনকে বললো, আপনার জন্যে রাজকুমার অপেক্ষা করছেন। আপনি যান।

অপরজন তার হাতে একটি মুদ্রার থলে দিয়ে বললো, কেউ যেন জানতে না পারে আমি এখানে রাজকুমারের সাথে একান্তে মিলিত হতে এসেছি।

এ ছিল রায়চন্দ্রের বোন শিলা। সে রাজমহলের এক সেবিকাকে বলে কয়ে রাজকুমারের সাথে মিলিত হওয়ার জন্যে নিভৃত্বে এখানে এসেছিলো।

শিলা তার ভাবী লক্ষী ও ভাতিজী রাধার অজান্তে রাজকুমার লক্ষণের সাথে একান্তে মিলিত হতে আসে। তারা সবাই রাজা রায় চন্দ্রের সাথে কন্নৌজে এসেছিল।

শিলাকে আসতে দেখে ধীর পায়ে এগিয়ে এলো লক্ষণ পাল। সে শিলার উদ্দেশে বললো, আমার সংশয় ছিলো তুমি আসবে কি-না? আমি কতবার মুনাজে তোমার কাছে পয়গাম পাঠিয়েছি, কিন্তু তুমি প্রতিবারই আমার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বলেছো আমাকে তোমার পছন্দ নয়। আচ্ছা, আমার মধ্যে কি এমন ঘাটতি আছে, আমি কি তোমার পতি হওয়ার যোগ্য নই? অবশ্য আমি জানি, মহারাজা ভীমপালের ছোট ভাইয়ের সাথে তোমার বিয়ের কথা চলছে, কিন্তু তুমি তো ইচ্ছা করলে এই কথাবার্তা বন্ধ করে দিতে পারো। তুমি কি তাকেই পছন্দ কর?

লক্ষণ! তুমি সুদর্শন যুবক তাতে সন্দেহ নেই। বিয়ের ব্যাপারে আমার নিজস্ব কোন পছন্দ নেই। তবে এটা বলতে পারি এ মুহূর্তে তোমাকে আমার

মোটেও পছন্দ নয় এবং আমার বিপরীতে তোমাকে যোগ্য পাত্রও আমি মনে করছি না। কারণ, গযনীর মুসলমানরা ঝড়ের মতো ধেয়ে আসছে। মথুরা ও মহাবন ধ্বংস হয়ে গেছে। আমি হাজার হাজার মৃতদেহ নদীতে ভেসে আসতে দেখেছি। মথুরার মন্দিরগুলোতে এখন মুসলমানরা আযান দিচ্ছে। গযনীর সৈন্যরা শ্রীকৃষ্ণ ও মহাদেবের স্মৃতি নিয়ে গেছে। বুলন্দ শহরের দশ হাজার হিন্দু ইসলাম ধর্মে দীক্ষা নিয়েছে। এই সময়ে তোমার মতো রাজকুমার আমার মতো একটি নগণ্য মেয়েকে বিয়ে করার জন্যে পেরেশান হয়ে গেছো। তোমার মধ্যে কি একটুও আত্মমর্যাদাবোধ নেই? তুমি কি জান না মুসলমানরা এখন মুনাজ ও কন্নৌজ দখল করার প্রস্তুতি নিচ্ছে?

আমি সবই জানি। আমি এসব ব্যাপারে বেখবর নই। কিন্তু তোমার প্রেম আমাকে পাগল করে তুলেছে। আমি যে দিন থেকে জানতে পেরেছি, ইচ্ছা করলেই তুমি বিয়ের সিদ্ধান্ত বদল করতে পারো, সে দিন থেকেই তোমাকে পাওয়ার জন্যে আমার হৃদয় ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। বললো রাজকুমার লক্ষণ পাল।

কারো প্রতি আমার কোন আগ্রহ নেই। মহারাজা ভীমপালের ভাইয়ের প্রতিও আমার কোন টান নেই, তোমার প্রতিও আমার কোন আকর্ষণ নেই। যার সাথেই আমার বিয়ে হবে আমি তাকেই আমার সবকিছু ঢেলে দেবো।

লক্ষণ পাল ....! আমি ব্যাপারটা ভালো ভাবেই বুঝি, আমার প্রতি আসলে তোমার কোন ভালবাসা নেই। তুমি আমার রূপ সৌন্দর্যকে ভোগ করতে চাও। কিছু দিন পর যখন আমার রূপ সৌন্দর্যে ভাটা পড়বে, তখন আমাকে দূরে ফেলে তুমি অপর কোন সুন্দরীকে ঘরে তুলবে। তোমার বাবাও বৃদ্ধ বয়সে আমার মতো এক তরুণীকে বিয়ে করেছিলেন। কিন্তু সেই ভালোবাসার চম্পারাণী এখন কোথায়? গযনীর এক গোয়েন্দাকে নিয়ে পালাতে গিয়ে মারা পড়েছে। তুমি তো তোমার বাবার পথেই চলবে। অযথা আমার সাথে প্রেমের অভিনয় করছো কেন?

"তাই যদি মনে করে থাকো, তাহলে আমার খবরে তুমি এখানে এসেছো কেন? জিজ্ঞেস করলো লক্ষণপাল।

আমি এসেছি একটি শর্ত নিয়ে। এই শর্ত যদি পূরণ করতে পারো তাহলে আমি তোমার ঘরের বধু হবো। তখন যদি আমার ভাই তোমার কাছে আমাকে বিয়ে দিতে অস্বীকৃতি জানায় তবুও আমি তোমার কাছে চলে আসবো।

তাই নাকি? বলো কি তোমার শর্ত? যাই বলবে তাই করে দেখিয়ে দেবো।'

"গযনীর সুলতানকে মথুরায় হত্যা করতে হবে। তুমি কি তা পারবে?"

"মথুরাতে কেন? তাকে আমি যুদ্ধের ময়দানে হত্যা করবো। তার মাথা কেটে এনে তোমার পায়ে লুটিয়ে দিবো।'

'লক্ষণ! ভুলে যেয়ো না, তুমি মুনাজের এক রাজপুত মেয়ের সাথে কথা বলছো। আমাকে দাদা বলেছেন, মথুরার মন্দিরে ভারতবর্ষের সকল রাজা মহারাজা বাসুদেবের মূর্তির সামনে শপথ করেছিলেন, মাহমূদের দ্বিখণ্ডিত মাথা দেবমূর্তির পায়ে এনে ফেলে দেবে। মাহমূদের রক্তে কৃষ্ণ মূর্তিকে স্নান করাবে। কিন্তু কোথায় গেলো সেই বীরবাহাদুর রাজা মহারাজাদের শপথ! মুসলমানদের আক্রমনের মুখে সবাই শিয়ালের মতো পালিয়ে গেছে। আর রাজা হরিদত্ত তার তরবারী মাহমূদের পায়ের নীচে রেখে দিয়ে দশ হাজার প্রজাকে নিয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে। আর আমাদের পুরোহিতরা যে মাটির উপর কৃষ্ণমূর্তিকে বসিয়ে ছিলো সেই কৃষ্ণমূর্তির পায়ের তলার মাটি পর্যন্ত ওরা সরিয়ে ফেলেছে।

এই মুসলমানরা সব লুটেরা। এরা মন্দিরগুলো থেকে সোনা লুটতে চায়, এ জন্য সব সময় মন্দির ধ্বংস করে' বললো লক্ষণ।

মাথা ঠিক করে কথা বলো লক্ষণ! বললো শিলা। ভারত মাতার সম্মান রক্ষা করতে পারে একমাত্র রাজপুতেরা। আমি সেই রাজপুতদেরই মেয়ে। যে ব্যক্তি আমার পারিবারিক শিক্ষক ছিলেন, তিনি ছিলেন একজন জ্ঞানী পণ্ডিত। আমি যখন প্রথম মুসলমানদের আক্রমণের কথা শুনলাম, তখন একদিন উস্তাদজীকে বললাম, লোকেরা বলে গযনীর মুসলমানরা লুটেরা। তারা মন্দিরগুলোর সোনাদানা লুট করার জন্যে বারবার ভারতে আক্রমণ চালায়। মুসলমানদের মথুরা দখলের খবর শোনার পর যখন তাকে বললাম, মুসলমানরা কি শুধু লুটতরাজ করতেই এসেছে? না কি তারা আমাদের এলাকাগুলো দখল করে নিতে চায়? তিনি আমাকে বললেন–

লোকেরা ভুল বলেছে। মাহমূদ গযনী লুটেরা নয়। সে আমাদের ধর্ম ধ্বংস করে তার ধর্ম ছড়িয়ে দিতে এসেছে। তোমার মনে রাখতে হবে লুটেরাদের কোন ধর্মজ্ঞান থাকে না। মাহমূদ যদি ভারতের ধন-সম্পদ হাতিয়ে নিতে চাইতো তাহলে রাজা হরিদত্তকে দলবলসহ ইসলামে দীক্ষা দেয়ার কোন প্রয়োজন হতো না।

আমি তাকে আরো জিজ্ঞেস করলাম, মুসলিম নারীরাও কি রাজপুত নারীদের মতো সাহসী? তিনি বললেন, নিজ ভূমি থেকে এতো দূরে এসে লড়াই করে বিজয় ছিনিয়ে নেয় যেসব যুবক, তাদের মায়েরা সাহসী না হয়ে পারে না। নিশ্চয়ই তারা সাহসী। এই দুঃসাহসী মুসলমান মায়েরা তাদের ছেলেদেরকে যুদ্ধে পাঠিয়ে গর্ববোধ করে।

লক্ষণ! তুমি যাকে লুটেরা বলে উড়িয়ে দিচ্ছো, সে কোন সাধারণ লোক নয়। আমি নিজে তার মোকাবেলা করতে চাই, আমি দেশবাসীকে জানিয়ে দিতে চাই, রাজপুত মেয়েরাও কোন কোন পুরুষের চেয়ে বেশী সাহসী। এ মুহূর্তে আমার দরকার তোমার সহযোগিতা। তুমি যদি আমাকে সহযোগিতা না করো, তাহলে সেনাবাহিনীর যে কোন সিপাহীকে আমি সাথে নিয়ে নেবো এবং মাহমূদ গযনীকে হত্যা করবো। এরপর যদি আমি জীবিত থাকি, তাহলে সেই সিপাহীই হবে আমার জীবন সঙ্গী ....। এখন বলো, তুমি কি মাহমূদকে হত্যার অভিযানে আমাকে সঙ্গ দেবে?

হ্যাঁ, তোমাকে পাওয়ার জন্যে আমি তোমার সব শর্ত মানতে প্রস্তুত। বললো লক্ষণপাল।

ভুল বলেছো। আমার জন্যে নয়, বলো, তোমার ধর্ম ও দেশের খাতিরে তুমি আমার সঙ্গ দেবে। বললো শিলা। একাজে যদি পিছ পা হও, তা হলে আমি আমার ভাতিজি রাধা তোমার বোন এমনকি কন্নৌজ ও মুনাজের প্রতিটি তরুণী মুসলমানদের ঘরে থাকবে এবং মুসলমানদের সন্তান জন্ম দেবে।

ঠিক আছে শিলা! আমি মাহমূদকে হত্যা করেই তোমার সামনে দাঁড়াবো।

মথুরায় হত্যা করতে হবে। বললো শিলা। কারণ ওখানেই যদি তাকে হত্যা করা যায়, তাহলে মুসলমানদের অগ্রাভিযান থেমে যাবে, তার সেনাবাহিনী নের্তৃত্বহীন হয়ে পড়বে এবং হতোদ্যম হয়ে গযনী ফিরে যাবে।

লক্ষণ! তুমি একজন অভিজাত ব্রাহ্মণ। আর ব্রাহ্মণদের ধর্মের প্রতি দায়িত্ব অনেক বেশী। আমার দেহে রাজপুতদের রক্ত প্রবাহিত। আমি কোন ভনিতার আশ্রয় না নিয়ে পরিষ্কার তোমাকে জানিয়ে দিচ্ছি, তুমি আমাকে যতোটা ভালোবাসো, আমি তোমাকে ততোটা ভালোবাসি না। কিন্তু আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি, তুমি যদি মাহমূদকে হত্যা করতে পারো, তাহলে সারাজীবন তোমার দাসী হয়ে থাকবো।

এ কাজ করতে গিয়ে যদি আমি মৃত্যুবরণ করি? তাহলে কি করবে? জিজ্ঞেস করলো লক্ষণ।

তাহলে, তোমার জ্বলন্ত চিায় নিজেকে জ্বালিয়ে দেবো, বললো শিলা।

মাহমূদকে হত্যার দৃঢ় সংকল্পে প্রতীজ্ঞাবদ্ধ হয়ে শিলা ও লক্ষণ রাজ দরবারের দিকে অগ্রসর হলো। রাজা রাজ্যপাল মুনাজের রাজা রায়চন্দ্র ও উভয় রাজ্যের সামরিক কর্মকর্তাদের নিয়ে মাহমূদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিকল্পনা করছিলেন বলে দারোয়ান তাদের প্রবেশে বাধা দিলো। কিন্তু বাধা অগ্রাহ্য করে শিলাকে নিয়ে দরবার কক্ষে প্রবেশ করলো লক্ষণপাল। রাজ্যপাল এই অবাঞ্ছিত প্রবেশে উষ্মা প্রকাশ করে তাদের বেরিয়ে যেতে বললেন।

আপনারা যে বিষয়টি নিয়ে আলাপ করছেন, আমরা সে কাজেই এসেছি। বললো লক্ষণ। অনধিকার প্রবেশের জন্যে আগেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আপনারা যে বিষয়টিই ভেবে থাকুন না কেন, এসব চিন্তা রেখে একটু আমাদের কথা শুনুন। আপনারা কি ভেবেছেন, মাহমূদকে মাথুরাতেই হত্যা করা যেতে পারে? তাকে হত্যা করতে পারলে তার সকল সৈন্যকেই বন্দী করা সম্ভম।

এক আনাড়ী লক্ষণের কণ্ঠে এমন আজব কথা শুনে দরবারে উপবিষ্ট লোকেরা একে অন্যের দিকে দৃষ্টি ফেরালো। লক্ষণের কথা শুনে রাজ্যপালের ঠোঁটের কোণে ঈষৎ হাসির রেখা ফুঠে উঠলো। তিনি বললেন, না, বেটা, এ ব্যাপারটি নিয়ে আমরা কোন চিন্তা-ভাবনা করিনি। বললেন, রাজা রায়চন্দ্র একাজ করার জন্যে যেমন দু সাহসী লোক দরকার তেমনি তাকে বুদ্ধিমান ও দূরদর্শীও হতে হবে।"

এর পাশাপাশি তাকে এমন ব্যক্তিত্বও হতে হবে যে নিজের জাত শত্রু মনে করবে মাহমূদকে। বললো লক্ষণ। বেতনভোগী হত্যাকারী দিয়ে এ কাজ

করানো সম্ভব নয়। বেতনভোগী কর্মচারীকে একাজে পাঠালে দেখা যাবে সে হত্যা করতে গিয়ে ওদের টোপ গিলে টাকা-পয়সা নিয়ে ইসলাম গ্রহণ করে ওদের চর হিসেবে থেকে যাবে। একাজ কোন রাজ কুমারের পক্ষেই করা সম্ভব।'

"কে আছে এমন রাজ কুমার? জিজ্ঞাসু কণ্ঠে জানতে চাইলেন রাজ্যপাল।

"সেই রাজ কুমার আপনার সামনেই দাঁড়ানো, বললো লক্ষণ। আমি সেই রাজকুমার ...... লক্ষণপাল।

রাজা রায়চন্দ্র লক্ষণের কাঁধে হাত রেখে বললেন, সাব্বাশ লক্ষণপাল! তুমি তোমার বাবার মাথাকে আরো উঁচু করে দিয়েছো। আজ যদি আমার কোন যুবক ছেলে থাকতো তাহলে আমিও তাকে তোমার সঙ্গে পাঠাতাম।

লক্ষণ! সত্যিই যদি তুমি একাজ করতে পারতে তাহলে গযনীর এই কালসাপও মরতো, আমার সেনাবাহিনীর লোকগুলোর প্রাণ দিতে হতো না।'

আপনি কি এ কাজটিকে মামুলী মনে করছেন? মহারাজ! বিস্মিত কণ্ঠে বললো এক বয়োজ্যেষ্ঠ সেনাপতি। আপনি কি ভাবছেন, রাজকুমার এখানে যেমন নির্বিঘ্নে দাঁড়িয়ে আছে এমন নির্বিঘ্নেই সে মথুরা যাবে আর মাহমূদের বুকে খঞ্জর বসিয়ে দিয়ে নিরাপদে চলে আসবে?

না মোটেও সহজ নয় এ কাজ, তা আমি জানি। কিন্তু ভারতমাতার জন্যে আমি জীবন বিলিয়ে দেয়ার শপথ নিয়েছি। বললো লক্ষণ।

তুমি যেমন শপথ করেছো, মাহমূদও শপথ করেছে ভারতের কোন মন্দির ও রাজধানী সে অক্ষত রাখবে না। আমাদের মনে রাখতে হবে মাহমূদের হাত খুবই লম্বা। আমাদের কোন কথা কোন সিদ্ধান্তই তার কাছে গোপন থাকে না। আপনারা সবাই জানেন, যে নিরাপত্তা কর্মকর্তাকে আমরা সবচেয়ে বেশী নির্ভরযোগ্য ও যোগ্য মনে করতাম, রাজমহলের যে সব বিষয় রাজকুমাররা পর্যন্ত জানতে পারতো না, সে তার সব কিছুই জানতো। অথচ সে ছিল গযনী সুলতানের একজন পাকা গোয়েন্দা। বললেন রাজ্যপাল।'

আমি তা জানি। তবে এর পরও আমি তাকে হত্যা করতে যাবো।' দৃঢ়তার সাথে বললো লক্ষণ। অবশ্য এ ধরনের অভিযানের কোন অভিজ্ঞতা ও

ধারণা আমার নেই। আপনাদের প্রতি আমার অনুরোধ, আপনারা আমাকে বলে দিবেন, এই অভিযান আমাকে কি ভাবে চালাতে হবে? বয়স্ক সেনাপতির উদ্দেশ্য বললো লক্ষণ।

লক্ষণের সংকল্প ও দৃঢ়তা দেখে রাজা রাজ্যপাল প্রধান সেনাপতি ও উজিরকে নির্দেশ দিলেন, তারা যেনো এই অভিযানের জন্যে লক্ষণকে প্রশিক্ষণ দেয় এবং কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে কন্নৌজের রাজা বললেন, ধরিত্রির সেবা ও ধর্মের কল্যার্ণের জন্য আমি ভগবানের নামে আমার পুত্রকে উৎসর্গ করছি।'

পরদিন রাজার নিযুক্ত দু'জন অভিজ্ঞ সেনা কর্মকর্তা লক্ষণকে তার অভিযানের জন্যে প্রস্তুত করার জন্যে উদ্যোগ নিলো। প্রশিক্ষকদের একজক লক্ষণের উদ্দেশ্যে বললো–

লক্ষণ! তুমি একজন ডাকাত ও লুটেরার সাথে মোকাবেলা করতে যাচ্ছো, তোমার মাথা থেকে এই চিন্তা বের করে দাও। তোমাদের বুঝতে হবে মাহমূদ সত্যিকার অর্থেই একজন লড়াকু যোদ্ধা। তার বিরুদ্ধে আমাদের যুদ্ধের একটি ভিন্ন অর্থ আছে। মাহমূদ শুধু যুদ্ধ করতে আসেনি, সাথে নিয়ে এসেছে একটি আদর্শ। তাকে সম্মুখ সমরে পরাজিত করা সহজ ব্যাপার নয়। আমাদের রাজা মহারাজারা তার দূরদর্শিতার ধারে কাছেও যেতে পারেননি। সেই সাথে তার মুখোমুখি হয়ে তাকে হত্যা করে ফেলবে, এমনটিও কেউ কল্পনা করেনি।

তোমার একটি কথা মনে রাখতে হবে, একজন পুরুষ যতোই ধর্মানুরাগী হোক না কেন, আসলে সে তো একজন মানুষ। মানুষ হওয়ার কারণে পুরুষের মধ্যে স্বভাবতই থাকে নারীর প্রতি দুর্বলতা। তদ্রূপ মানুষ হিসেবে একজন নারীর জন্যে সবচেয়ে বড় দুর্বলতা পুরুষ। তোমার লক্ষ্য অর্জনে তুমি সাধু সন্নাসী কিংবা উপজাতির বেশ ধারণ করে তুমি মথুরা যাবে।

তোমরা বহুরূপী বেশ ধারণের অর্থ হবে তুমি বনে জঙ্গলে বসবাসকারী কোন উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর সর্দার।

তুমি যে গোত্রের গোত্রপতির বেশ ধারণ করবে, সেই গেত্রের লোক সংখ্যা পনেরো হাজার। তুমি সেখানে গিয়ে বলবে, কন্নৌজের মহারাজা তোমার গোত্রের সকল মানুষকে গযনী সুলতানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে নিজের পক্ষে নিয়ে নিয়েছে। কিন্তু সর্দার হিসেবে তুমি গযনী বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই

করতে রাজি নও। গযনী বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই না করে তুমি বরং রাজা হরিদত্তের মতো গোত্রের সকল লোকজনকে নিয়ে মুসলমান হতে চাও।

লক্ষণ! তোমাকে মনে রাখতে হবে, সরাসরি সুলতান মাহমূদ পর্যন্ত যেতে তোমাকে তার লোকেরা দেবে না। তোমাকে বলতে হবে, সুলতানের সাথে তোমার দু'টি একান্ত কথা আছে যা তুমি তার সাথে একান্তে বলতে চাও। এর পরও যদি তারা তোমাকে সুলতানের কাছে নিয়ে না যায়, তখন তুমি তাদের বলবে, গুপ্ত ঘাতকের হাতে সুলতানের নিহত হওয়ার আশংকা আছে। একথা বললে আশা করি, তারা তোমাকে সুলতানের সাথে সাক্ষাতের সুযোগ করে দেবে।

আপনি বলে ছিলেন নারীর দুর্বলতার কথা' একথা বলে আপনি কি বুঝাতে চাচ্ছেন? প্রশিক্ষককে জিজ্ঞেস করলো লক্ষণ।

"তোমার সাথে অন্তত দু'জন সুন্দরী নারী থাকা দরকার। তাদেরকে তুমি নিজের স্ত্রী হিসেবে পরিচয় দেবে রহস্যজনক কণ্ঠে জবাব দিলো প্রশিক্ষক। "তোমার সঙ্গীনী নারীরা যদি বুদ্ধিমতী হয় তাহলে তারা সুলতানের সেনা অফিসারদেরকে একজনের বিরুদ্ধে অন্যজনকে শত্রুতে পরিণত করতে পারবে। আমি তো মনে করি, সুলতান নিজেও সুন্দরী নারীদের দেখলে বিমুগ্ধ হয়ে যেতে পারে। সুলতান নিজে যদি তোমার স্ত্রী পরিচয়দানকারী নারীদের নিজের কাছে রাখার আগ্রহ প্রকাশ করে তাহলে কৌশলে তাতে তুমি সম্মতি দেবে তোমার সঙ্গীনীদের কাছে বিষ রাখতে হবে যাতে সুযোগ মতো তারা এই বিষ পানি বা শরবতে মিশিয়ে দিতে পারে। আমরা তোমাকে এমন দু'জন সুন্দরী তরুণী দিয়ে দেবো। তুমি তাদেরকে উপজাতীয় পোষাক পরিয়ে নেবে।

সেনাবাহিনীর অভিজ্ঞ প্রশিক্ষক ও প্রবীণ উজির লক্ষণকে তার অভিযান সফল্যের জন্য নানা ধরনের কূটকৌশল শিখিয়ে দিতে শুরু করলো। তারা লক্ষণকে বুঝালো কি ভাবে সে সুলতান মাহমূদকে হত্যা করে সেখান থেকে পালিয়ে আসবে।

লক্ষণ তার প্রশিক্ষকদের কাছ থেকে অভিযানের দীক্ষা নিয়ে যখন শিলার কাছে অভিজ্ঞতা বর্ণনা করলো, তখন শিলা বললো, অন্য কোন নারীর দরকার নেই। আমি তোমার সাথে থাকবো, আর আমার ভাতিজী রাধা থাকবে। শিলা

রাতের বেলায় তার ভাতিজী রাধাকে তার ও লক্ষণের অভিযানের কথা জানিয়ে বললো, এই অভিযানে আমরা তোমাকে সাথে নিতে চাই।

শিলার প্রস্তাবে রাধা মহা উৎসাহে রাজি হয়ে গেলো। এরপর তিনজন মিলে রাজা রায়চন্দ্রের কাছে উপস্থিত হলো।

রাজা রায়চন্দ্র এই তিনজনকে একসাথে তার ঘরে প্রবেশ করতে দেখে কিছুটা বিস্মিত হলেন।

বাবা, আমাদের এখানে তরুণীদেরকে মন্দিরে নিয়ে বলিদান করা হয়। আপনিই বলুন, এসব বলিদানের দ্বারা আসলে কি কোন উপকার হয় না? আমিও ফিসি যে বলিদান করতে যাচ্ছি, তাতে আপনার অনেক কিছু অর্জন হবে। রাধা তার বাবা রাজা রায়চন্দ্রের উদ্দেশ্যে বললো, আমাদের ছাড়া লক্ষণপালের সাথে যদি অন্য কোন নারী যায়, তাহলে তারা গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে তাকে ধোঁকা দিতে পারে।

রাজা রায়চন্দ্রের বোন শিলা ও তার ভাতিজী রাধার রূপ সৌন্দর্য ছিল গোটা অঞ্চলে আলোচিত বিষয়। তাদের সাহসিকতার বিষয়টি ছিলো সবার মুখে মুখে। ছোট্ট বেলা থেকেই এই দুই তরুণী অসীম সাহসিকতার অনেক পরিচয় দিয়েছে। এরা যখন লক্ষণের সাথে সুলতান মাহমূদকে হত্যার অভিযানে যেতে চাইলো, তখন একথা শুনে কেউ অবাক হলো না। কারণ, এরা ছিলো অত্যন্ত জাত্যাভিমানী। মাহমূদকে হত্যা করার বিষয়টি তারা কর্তব্য মনে করতো। তারা উভয়ে রাজা রায়চন্দ্রকে লক্ষণপালের সাথে অভিযানে যেতে রাজি করিযে ফেললো।

অভিযাত্রী তিনজনের জন্যে এমন এমন উপজাতীয় পোষাক তৈরী করা হলো, বাস্তবে এ ধরনের পোষাকধারী কোন উপজাতীয় গোত্রের অস্তিত্ব এতদঞ্চলে ছিলো না। তাদের সাথে যাওয়ার জন্যে এবং তাদের নিরাপত্তা ও সহযোগিতার জন্যে দু'জন অভিজ্ঞ সেনা কর্মকর্তাকেও সহযাত্রী হিসেবে নেয়ার সিদ্ধান্ত হলো।

শিলা ও রাধার জন্য এমন পোষাক তৈরী করা হলো যে পোষাকে তাদের পেট পিঠ, কাঁধ ও হাতের পুরো অংশ বিবস্ত্র থাকে। হাঁটুর নীচ পর্যন্ত সবটুকু পা খোলা থাকে। তাদের পোষাকের সাথে সঙ্গতি রেখে দু'জন সৈনিকের জন্যও

উপজাতীয় পোষাক তৈরী করা হলো। তাদের মাথা সম্পূর্ণ খোলা রাখা হলো। বিশেষভাবে তৈরী এই উপজাতীয় পোশাক পরার পর তাদের রূপ সৌন্দর্য এমনভাবে ফুটে উঠলো যে, কোন পুরুষের পক্ষে তাদের দিক থেকে চোখ ফেরানো মুশকিল।

লক্ষণ পালকেও অর্ধ উলঙ্গ উপজাতীয় পোষাক পরানো হলো। তাকেও উপজাতীয় পোষাকে সুদর্শন যুবক মনে হচ্ছিল। উপজাতীয় সর্দার হিসেবে মাহমূদ গযনবীকে উপহার দেয়ার জন্যে লক্ষণকে দুটি জ্যান্ত হরিণ, দুটি বাঘের চামড়া, দুটি মৃত মানুষের মাথার খুলি এবং একটি স্বর্ণের মূর্তি দেয়া হলো। মূর্তিটির উপরের অংশ ছিল মানুষের মতো এবং নীচের অংশ ছিল ঘোড়ার দেহের মতো। তাকে বলা হলো, এই মূর্তি দেখিয়ে তুমি বলবে, আমাদের গোত্র এই মুর্তিকে পূজা করে। কিন্তু এখন আমি গোত্রের সকল লোকজনকে নিয়ে মুসলমান হতে চাই।

রাতের প্রথম প্রহরে যার যার ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে লক্ষণের কাফেলা মাহমূদ হত্যার অভিযানে কন্নৌজ থেকে রওয়ানা হলো। তারা সিদ্ধান্ত নিলো মহাবনের জঙ্গলে গিয়ে তারা যমুনা নদী পার হয়ে মথুরার সীমানায় প্রবেশ করবে। কন্নৌজ থেকে মহাবনের জঙ্গলের দূরত্ব ছিলো প্রায় শত মাইল। তাদের খাবার দাবার সামগ্রী দুটি গাঁধার উপর বহন করা হল। তারা সিদ্ধান্ত নিল, মহাবনের জঙ্গলের ভেতর দিয়ে তারা মথুরা পৌছবে।

সুলতান মাহমূদ তখনো মথুরায় অবস্থান করছেন। মথুরা তার কাছে খুবই আকর্ষণীয় মনে হচ্ছিল। মথুরা ছিল অসংখ্য মন্দিরের শহর। বিজয় লাভের পর সুলতানের নির্দেশে মুসলিম সৈন্যরা মথুরার মন্দিরগুলোকে অগ্নি সংযোগ করছিলো। মথুরার প্রধান মন্দিরের আঙ্গিনায় দাঁড়িয়ে মুসলমান সৈন্যরা আযান দিয়ে জামাতে নামায আদায় করতে শুরু করেছিল। মথুরার হিন্দুরা এতোটা আত্মবিস্মৃত ছিলো না যে, তাদের চোখের সামনে তাদের দেবদেবী ও ধর্মের অবমাননা তারা নীরবে সহ্য করে নেবে। দেবদেবী ও মন্দির ধ্বংসের যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে এর মধ্যেই কতিপয় হিন্দু কয়েকজন মুসলিম সৈন্যকে ধোঁকা দিতে আত্মহত্যা করে ফেললো। কিছু হিন্দু রাতের অন্ধকারে ধ্বংসাত্মক ঘটনাও ঘটালো। হিন্দুদের চক্রান্তের মূলোৎপাটন করতে সুলতান মাহমূদ নির্দেশ

দিলেন যে, এই শহর ধ্বংস করা ছাড়া হিন্দুদের কাবু করা যাবে না। সুলতানের নির্দেশে তাই শহর ধ্বংসের কাজ শুরু হয়ে গেলো। অপর দিকে সুলতান তার সৈন্যদেরকে কন্নৌজের দিকে অগ্রসর হওয়ার জন্যে প্রস্তুত করতে শুরু করলেন।

একদিন দুপুরের দিকে সুলতানের সামনে তার সকল সেনা কর্মকর্তা, সেনাদের সাথে গযনী থেকে আসা ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব ও ইমাম বসা ছিলেন। সুলতান ঘোষণা করলেন–

অচিরেই আমরা কন্নৌজের দিকে অগ্রসর হবো। অভিযানের প্রস্তুতি ও অভিযান সম্পর্কে আপনাদের অবহিত করার আগেই আপনাদেরকে আমি কয়েকটি কথা বলা জরুরী মনে করছি। সকল সৈন্যকে একত্রিত করে বক্তৃতা করার সুযোগ এখানে নেই। আপনারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ অধীনস্থ সেনাদেরকে আমার প্রতিটি কথা অক্ষরে অক্ষরে পৌছে দেবেন। যারা খতীব ও ইমাম আছেন, তারা নামাযের পর আপনাদের মুসল্লীদেরকে আমার কথাগুলো পৌছে দেবেন। আপনারা সৈন্যদেরকে বলবেন–

চলমান যুদ্ধ আমার বা কারো কোন ব্যক্তিগত যুদ্ধ নয়। সেনাদেরও এর মধ্যে ব্যক্তিগত কোন স্বার্থ জড়িত নেই। এটা রাজ্য দখলের লড়াইও নয়। নিতান্তই আমাদের এ অভিযান আল্লাহ ও রাসূলের জন্যে নিবেদিত অভিযান। আমরা এখানে কুফরীর সেই অভিশাপ দূর করতে এসেছি, যে সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা ঘোষণা দিয়েছেন 'ততক্ষণ পর্যন্ত লড়াই করো যতক্ষণ পর্যন্ত না এই কুফরীর সন্ত্রাস দূরীভূত হয়ে যায়।'

আমি যদি বারবার হিন্দুস্তানে এসে হিন্দুদের উপর চড়াও না হতাম, তাহলে সব হিন্দু মিলে এতো দিনে গযনী দখল করে কাবা দখলের জন্য অগ্রসর হতে-শুরু করতো। হিন্দুরা ছাড়া ইহুদীরাও বড় আপদ হয়ে দেখা দিয়েছে। সব কিছু একসঙ্গে তো আর আমরা সামলাতে পারবো না। কিন্তু আমরা চেষ্টা করলে হিন্দুস্তান থেকে কুফরী দূরীভূত করে এটাকে ইসলামের যমীনে রূপান্তরিত করতে পারি এবং আমরা এ লক্ষ্যেই এখানে এসেছি।

রাজত্বের পরিধি বাড়ানোর কোন লিপ্সা আমার নেই। আপনারা দেখেছেন, লাহোরের মহারাজাদের কয়েকবার আমরা পরাজিত করেছি। কিন্তু আমাদের রাজ্যের সীমানা আমরা লাহোর পর্যন্ত বিস্তৃত করিনি। ......

সকল সৈন্যকে এটা বুঝিয়ে দিন, আমরা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য প্রিয় মাতৃভূমি ছেড়ে এখানে এসেছি। আমরা এখানে আল্লাহর পয়গাম ও আমাদের ঈমান নিয়ে এসেছি এবং ঈমানকে লালন ও বিকাশ করছি এ জন্য তিনি আমাদের মদদ করছেন। আমার যদি সোনা দানা সহায় সম্পদের লোভ থাকতো, তাহলে বারবার এতো কষ্টকর অভিযানে আসার দরকার হতো না। একবারেই লুটতরাজ করে সোনাদানা কুক্ষিগত করে নিয়ে গিয়ে গযনীতে বসে আরাম আয়েশ করতে পারতাম। কিন্তু আপনারা দেখেছেন, প্রতিবারই আমি হিন্দুস্তানে আসি আমার জীবনের ঝুঁকিকে উপেক্ষা করে। প্রতিবারই আমার মনে হয় আমার পক্ষে আর গযনীতে জীবন্ত ফিরে যাওয়া সম্ভব হবে না। কিন্তু আল্লাহ তাআলা প্রতিটি অভিযানেই আমাকে নতুন জীবন দান করেন। এতে আমার মনে হয়, হিন্দুস্তানে আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার অভিযান আমরা শুরু করেছি, আল্লাহ হয়তো আমাদের হাতেই এর পূর্ণতা দেবেন।

এ মুহূর্তে আমি জানতে পেরেছি, কন্নৌজে আমাকে যে কোনভাবে হত্যা করার বহু নীল নকশা তৈরী করা হয়েছে। যে কোন মুহূর্তে যে কোন জায়গায় কিংবা আমার তাঁবুতে আমি নিহত হতে পারি। কিন্তু আল্লাহর প্রতি আমার শতভাগ ভরসা আছে। আমার মন সাক্ষী দিচ্ছে অন্তত হিন্দুস্তানে আমি নিহত হবো না। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত ইঙ্গিত। .....

আমি আবারো আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, প্রতিটি সৈন্যকে বলে দিন, নফল নামায রোযা থেকে জিহাদ শ্রেয়। আপনারা জানেন, নামায অবস্থায়ও যদি কারো সামনে সাপ এসে যায় তবে নামায ছেড়ে আগে সাপ মেরে ফেলার হুকুম রয়েছে। কেউ যদি মনে করে শুধু নামায রোযা ইবাদত বন্দেগী করে সে আল্লাহকে খুশী করে ফেলবে তবে সে বড় ভ্রান্তিতে রয়েছে। হিন্দুরূপী এ সব বিষধর সাপকে হত্যা করা ছাড়া আপনাদের কারো পক্ষেই আল্লাহকে খুশী করা সম্ভব নয়।

আপনাদেরকে মনে রাখতে হবে, হিন্দুস্তানের হিন্দুরা যদি নির্বিবাদে রাজত্ব করতে পারে তাহলে এখানকার মুসলমানরা কিছুতেই তাদের ঈমানী অস্তিত্ব নিয়ে টিকে থাকতে পারবে না। এই দেশ সব সময়ই মুসলমানদের জন্যে বধ্যভূমি হয়ে থাকবে। আপনারা সাধারণ যোদ্ধাদের বুঝিয়ে দেবেন, তোমাদের

আগে এখানে যুদ্ধ করতে এসে যে সব মুসলমান যোদ্ধা শাহাদাত বরণ করেছে যাদের মৃত লাশ পর্যন্ত দেশের মাটিতে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। তোমাদেরকে তাদের শাহাদাতের মর্যাদা রক্ষা করতে হবে।

আমি আপনাদের সতর্ক করতে চাই, হিন্দুস্তান খুবই বিভ্রান্তিকর জায়গা। এখানকার প্রতিটি মানুষ একেকটি জীবন্ত ধোকা। এখানকার মাটি মানুষ, ভূপ্রকৃতি, সব কিছুই যে কোন যোদ্ধাকে যে কোন সময় ধাঁধার মধ্যে ফেলতে পারে। আপনারা এখানকার নারীদের দেখেছেন। এদের রূপ যে কোন যোদ্ধাকে বিভ্রান্ত করতে পারে। আমাদের সৈন্যরা যাতে এখানকার নারীদের রূপসৌন্দর্যে বিভ্রান্ত না হতে পারে এ ব্যপারে প্রতিটি মুহূর্তে সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে। নারীর রূপজৌলুসে মত্ত কোন সেনাদল কখনো বিজয় লাভ করতে পারে না। আপনাারা প্রতিটি সৈনিকের কাছে এ বার্তা পৌছে দিন। সিপাহী হোক আর অফিসার হোক যেই আল্লাহর নাফরমানী করবে, আমি সাথে সাথে তাকে আল্লাহর কাছে পাঠিয়ে দিবো। এমনটি হলে পুরস্কারের পরিবর্তে পরকালে তাকে আগুনে জ্বলে পুড়ে ধ্বংস হতে হবে। কেউ কোন নারী কেলেংকারী করলে তার শাস্তি হবে নির্ঘাত মৃত্যুদণ্ড।

ইমাম ও খতীবগণকে বিদায় করে দিয়ে সুলতান মাহমূদ সেনা কমান্ডার ও সেনাপতিদের সামনে মথুরা থেকে কন্নৌজ পর্যন্ত মানচিত্র মেলে ধরে দেখালেন, কোন পথে তাদের যেতে হবে। চূড়ান্ত অভিযানের পরিকল্পনা করার আগেই তিনি তার বিশেষ গোয়েন্দাদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য জেনে নিয়ে ছিলেন। গোয়েন্দা তথ্য ছাড়াও তিনি সেনাবাহিনীর কয়েকজন কমান্ডারকে ছদ্মবেশে কন্নৌজ পাঠিয়েছিলেন পথ ও পারিপার্শিক অবস্থা সরে যমীনে দেখে আসার জন্য। সেনা অফিসারদের উদ্দেশ্যে মানচিত্র দেখিয়ে সুলতান বললেন–

আমাদের গমন পথে মুনাজ নামের একটি ছোট্ট রাজ্য রয়েছে। এটি রাজপুতদের আবাসস্থল। রাজপুতেরা খুবই সাহসী ও লড়াকু জাতি। যুদ্ধ বিগ্রহে হিন্দুস্তানের অন্য কোন জনগোষ্ঠী এদের মোকাবেলা করতে পারে না। এদেরকে আগেই বাগে আনতে হবে। নয়তো আমরা যখন কন্নৌজ অবরোধ করবো তখন ওরা আমাদের পেরেশান করে তুলবে। তিনি আরো জানালেন, গোয়েন্দাসূত্র জানিয়েছে, লাহোরের রাজা ভিমপাল ছদ্মবেশে এই এলাকায়

অবস্থান করছে। সে এই অঞ্চলের ছোট্ট বড় রাজা মহারাজাদেরকে আমাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ করার জন্যে তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। ভিমপালের ছোট্ট ভাইও তার সাথেই রয়েছে। ভিমপালকে জীবন্ত গ্রেফতার করতে হবে। খবর এসেছে, ভিমপালের সেনাবাহিনীও এদিকে রওয়ানা হতে যাচ্ছে। আমাদের খুবই সতর্ক থাকতে হবে।

মথুরা বিজয়ের সপ্তম দিনে সুলতান মাহমূদ কন্নৌজে রওয়ানা হওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। যুদ্ধকালীন সরবরাহ ব্যবস্থা সফল রাখার জন্য তিনি মথুরায় কিছু সৈন্য রাখলেন এবং যারা যুদ্ধে নিজেদের বীরত্ব প্রদর্শনে আগ্রহী সেই সব উৎসাহী সৈন্যদেরকে অভিযানের প্রস্তুতি নেয়ার নির্দেশ দিলেন।

* * *

এ দিকে রাত পেরিয়ে সকালের সূর্য তখন পূর্বাকাশে উঁকি দিচ্ছে। ঠিক সেই সময় কন্নৌজের রাজপুত্র লক্ষণ, শিলা, রাধা ও তার সহযোগী দুই সৈনিককে নিয়ে মহাবনের জঙ্গলের পাশে পৌছাল। তাদের প্রত্যেকের গায়ে বিশেষ ভাবে তৈরী উপজাতীয় পোষক। লক্ষণের গায়ে গোত্রপতির বিশেষ ধরনের পোশাক। মহাবনে পৌছাতে পথিমধ্যে তাদের দু'রাত কাটাতে হয়েছে। এই বনের মধ্যেই তৃতীয় রাতটি কাটানোর সিদ্ধান্ত নিলো তারা।

সময়টা ছিল অগ্রহায়নের শেষ ও পৌষের শুরু। প্রচণ্ড শীত। তারা এসে যে জায়গাটায় থামলো সেই জায়গাটি রাত হয়ে যাওয়ার কারণে ঠিক মতো দেখে নিতে পারেনি। যমুনা নদী এখান থেকে দূর দিয়ে প্রবাহিত হলেও এসে এখানকার বন-জঙ্গলের ভেতর দিয়ে বাঁক দিয়ে ঘুরে গেছে। জঙ্গলের ভেতরকার নদীটা অনেকটাই ঝিলের মতো। এখানে তেমন স্রোত নেই। নিথর শান্ত পানি। চারদকিে ঘনঝোপ ঝাড়। জঙ্গলী পশুদের মধ্যে এখানে জলহস্তিদের বেশী বসবাস। অত্যধিক শীত ও ঠান্ডার প্রকোপ না থাকলে এতোক্ষণে এদেরকে জলহস্তী গ্রাস করে ফেলতো।

এখানে এসে লক্ষণপালের ছোট্ট দলটি রাত যাপনের জন্য একটি যুতসই জায়গা বেছে নিল। এবং সবাই টানা ভ্রমণের ক্লান্তি দূর করার জন্য বিশ্রাম

নিতে বিছানো করে শুয়ে পড়লো। রাধা শিলা ও লক্ষণপাল কাছাকাছিই বিছানা করল আর তাদের সাথে আসা দুই নিরাপত্তারক্ষী একটু দূরে বিছানা করে শুলে পড়ল।

সকাল বেলায় ওদের ঘুম ভাঙ্গার পর লক্ষণ বললো–

এখানে নদী পাড়াপাড়ের জন্য ভাড়াটে নৌকা পাওয়া যায়। আমাদেরেকে এখনই নদী পাড় হতে হবে। আমি নদীর তীরে গিয়ে দেখি কোন নৌকার মাঝি পাওয়া যায় কি না।

শিলা বললো, আমিও তোমার সাথে যাবে।

তোমাকে সাথে নেয়া ঠিক হবে না।

ঠিক আছে তোমার সাথে যাবো না কিছু দূর গিয়ে জায়গাটা দেখে ফিরে আসবো।

লক্ষণ ও শিলা পাশাপাশি নদীর তীরের উদ্দেশ্যে হাঁটছিলো।

রাতের বেলায় রাতের অন্ধকারে এলাকাটার অবস্থা বোঝা সম্ভব হয়নি।

সময় ৯টা।

গোটা এলাকা জঙ্গলাকীর্ণ। ঝোপঝাড়, আর গাছ-গাছালীতে ঠাসা গোটা এলাকা। ভোরের আলো চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ায় তারা জায়গাটি ভালোভাবে দেখতে পেল। এলাকাটি বলতে গেলে সমতল জঙ্গল। টিলা পাহাড়ের কোন চিহ্ন তাদের নজরে পড়লো না।

অনেকক্ষণ ধরে শিলা ও লক্ষণ পাশাপাশি হাঁটছে কিন্তু কেউই কোন কথা বলছে না। এক সময় লক্ষণকে থামিয়ে শিলা জিজ্ঞেস করলো–

তুমি নীরব কেন লক্ষণ? অত্যধিক নীরবতা আতংকের লক্ষণ! তুমি কি ভয় পাচ্ছো?

ভয় নয় শিলা! থেমে শিলার আপাদমস্তকের দিকে একবার দৃষ্টি ফিরিয়ে বললো লক্ষণ। আমি একটা ব্যাপার নিয়ে চিন্তা করছি।

কি নিয়ে চিন্তায় পড়েছো?

ভাবছি তুমি এমনিতেই সুন্দর! এর উপর এই উপজাতীয় পোশাকে তোমাকে কেমন দেখাচ্ছে তা বলে বুঝাতে পারবো না। আমার প্রশিক্ষক

আমাকে বলেছিলেন, মানুষ যদি তার স্বভাবজাত অবস্থায় থাকে তবে বৃদ্ধ হলেও তার স্বাস্থ্য চেহারায় এতটুকু প্রভাব পড়ে না। শরীর সম্পূর্ণ অটুট থাকে। আকর্ষণীয় দেহাবয়ব অক্ষুন্ন থাকে। আমার মন বলছে, আমরা যদি এই বেশে, এই ঘৃণা, হিংসা, যুদ্ধ বিগ্রহের দুনিয়া ছেড়ে এমন জঙ্গলে নিরিবিলি জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারতাম!....

আমি কখনো কল্পনাও করিনি শিলা! তোমার চুল এতোটা রেশমী ও সুন্দর। তুমি রূপসী ঠিক, তাই বলে এমন অনিন্দ সুন্দুরী তা ধারণা করতে পারিনি। তোমার রূপের বর্ণনা দেয়ার মতো ভাষা আমি খুঁজে পাচ্ছি না।

লক্ষণের এই কথায় শিলার মধ্যে কোন ভাবান্তর হলো না। সে যেমন ছিলো তেমনই রইলো। লক্ষণ রূপের এই যাদুকরী প্রতিমাকে তার বাহুবন্ধনে জড়িয়ে নেয়ার জন্য তার দিকে দু'হাত প্রসারিত করল। কিন্তু শিলা দু'হাত পিছনে সরে গেল।

আবেগতাড়িত না হয়ে স্বাভাবিক হও লক্ষণ! অত্যন্ত দৃঢ় ও গম্ভীর কণ্ঠে বললো শিলা। লক্ষণ! স্মরণ করো, আমরা কোন উদ্দেশ্যে কি কাজে এখানে এসেছি। নিজের পৌরুষ ও বীরত্বের উপর নারীর রূপ সৌন্দর্যকে সাওয়ার করো না লক্ষণ।। ভুলে যেয়ো না, আমরা মৃত্যুর সাথে খেলা করতে এসেছি।

আমি আমার কর্তব্য বিস্মৃত হইনি রাজকুমারী! আমি জানি, আমরা মৃত্যুর খেলায় নেমেছি। কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে, তোমার মতো অপ্সরীকে নিয়ে মুসলমানরা খেলায় মেতে উঠবে।

হঠাৎ আবেগাপ্লুত হয়ে লক্ষণ বললো–

তোমরা এখানেই থাকো শিলা! আমি একাকী মথুরা যাবো। একাকী গিয়ে সোজা আরব বাহিনীর সেনাপতি মাহমূদকে হত্যা করবো। তোমরা এখান থেকেই ফিরে যাও। আমি একাই মরতে যাবো। কিন্তু যাবার আগে শিলা! একবার, শুধু একটি বার একটু সময়ের জন্য আমাকে জড়িয়ে ধরো। আমি ভয় পাচ্ছি শিলা! আমি আমার মৃত্যুকে ভয় পাচ্ছি না, ভয় পাচ্ছি ওরা আমাকে হত্যা করে যখন রাধাকে ও তোমাকে নিয়ে যাবে সে সময়টার কথা ভেবে!

লক্ষণ! দূর হও এখান থেকে। বুঝতে চেষ্টা করো, আমি তোমার কাছে নিজেকে বিক্রি করে দেইনি। আমি তোমার সঙ্গ দিয়েছি একটি মহান

উদ্দেশ্যে। এই উদ্দেশ্য সাধিত হলে আমি নিজেই নিজেকে তোমার পায়ে সোপর্দ করবো। কিন্তু এখন নয় লক্ষণ! তুমি জানো না, একবার যদি তোমার শরীর আমার চুল ও দেহের স্পর্শ পায়, তবে তুমি সব কর্তব্য ভুলে যাবে।

লক্ষণ! আমার চোখে তুমি গযনীর সুলতানকে দেখো, আমার চেহারায় আমার আত্মমর্যাদাবোধ দেখো। যাও লক্ষণ! নদীর তীরে গিয়ে কোন নৌকা আছে কি না তা দেখো, ভুলে গেলে চলবে না, আমাদেরকে যতো শিগগির সম্ভব নদী পার হয়ে যেতে হবে।

শক্ত সুঠাম দেহের অধিকারী যথার্থ সুপুরুষ লক্ষণ। তার শরীরে গঠনই বলে দেয় তরবারী ও অশ্ব চালনায় পারদর্শী যুবক সে। শিলার কথায় তার দেহের ঘুমন্ত পৌরুষ সচেতন হয়ে উঠলো, শিলাকে এক দৃষ্টিতে আপাদ মস্তক দেখে বললো–

ঠিক আছে শিলা! আমি তোমাকে হতাশ করবো না। যে কোন ভাবে নৌকার ব্যবস্থা করে এখনই আসছি আমি।

এই বলে শিলাকে পিছনে রেখে সামনের দিকে দৌড়াতে লাগলো লক্ষণ। ঠাঁয় দাঁড়িয়ে শিলা লক্ষণের গমন পথের দিকে তাকিয়ে রইল। কিছুক্ষণের মধ্যেই গাছ-গাছালির আড়ালে হারিয়ে গেল লক্ষণ।

হঠাৎ পেছনে কোন মানুষের পায়ের শব্দ পেল শিলা। নির্ভয়ে নিরুদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে পেছন ফিরে তাকাল শিলা। শিলা ভাবছিল এই বিজন জঙ্গলে এ সময়ে কে থাকতে পারে! মথুরা এখান থেকে বিশ পঁচিশ মাইল দূরে অবস্থিত। মুসলমান সৈন্যরা সেখানে অবস্থান করছে। কিন্তু এখানে কোন জন মানুষের অস্তিত্ব থাকার সম্ভাবনা না থাকলেও বাস্তবে একজন লোক বিস্ফারিত দৃষ্টিতে শিলার দিকে তাকিয়ে এগিয়ে আসছে। লোকটির চেহারায় কালো দাড়ি। এই এলাকার পোষাকেই লোকটি সজ্জিত। ভরাট চেহারার সবল সুঠাম দেহী একজন যুবক। লোকটি পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে একেবারে শিলার মুখোমুখি এসে দাঁড়াল।

শিলা! আমি ভুল করছিনা তো? তুমি কি মুনাজের রাজা রায়চন্দ্রের বোন শিলা না? তুমি তো কোন উপজাতি না। এইমাত্র যে লোকটি তোমার কাছ থেকে চলে গেল সে কি লক্ষণ নয়? গতকাল থেকেই আমি চুপি চুপি তোমাদের লক্ষ্য করছি।

আচ্ছা! তাই নাকি? তুমি কে? খুবই স্বাভাবিক কণ্ঠে জানতে চাইলো শিলা।

লোকটি তার দাড়িতে হাত বুলিয়ে দাড়ি খুলে ফেললে একজন টগবগে যুবকের চেহারা বেরিয়ে এলো। দেখতে হুবহু লক্ষণের মতো।

ওহ! তারালোচন! তুমি এখানে কেমন করে? অবশ্য তোমার এ সময়ে এখানেই থাকা উচিত।

কিন্তু তোমার এখানে থাকা মোটেও উচিত হয়নি। বললো তারালোচন।

কিছু দিন আগে আমি তোমার ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ করতে গিয়ে ছিলাম, তখন তোমার সাথে দেখা হয়েছিল। আর একবার তুমি যখন তোমার ভাইয়ের সাথে লাহোর গিয়ে ছিলে তখন তোমাকে দেখেছিলাম। ক'দিন আগে মুনাজে তোমাকে না দেখলে হয়তো এই পোশাকে আমার পক্ষ্যে তোমাকে চেনা সম্ভব হতো না। এই বিজন জঙ্গরে তোমাকে কেউ দেখলে মনে করবে, কোন রাজকুমারীর প্রেতাত্মা তুমি। কিংবা কেউ মনে করবে তুমি এই জঙ্গলের রাণী।

গতকাল থেকেই তোমাদের আমি লক্ষ করছি। তোমার হয়তো জানা আছে এখানে কি করছি আমি। আমি গযনী বাহিনীর গতিবিধি যাচাই করতে এখানে এসেছি। মহারাজা ভীমপাল এখান থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরে অবস্থান করছেন। তোমাদের সাথে রাজকুমারী রাধাকেও দেখলাম। এই বন্যপোশাক পরেছো কেন তোমরা? তোমরা কি কোথাও পালিয়ে যাচ্ছো?

এই যুবক লাহোরের মহারাজা ভীমপালের ছোট ভাই তারালোচন পাল। শিলার সাথে তার বিয়ের কথা প্রায় পাকাপাকি হওয়ার পথেই ছিল। কিন্তু এরই মধ্যে যুদ্ধের দামামা বেজে উঠায় বিয়ের কাজ বিলম্বিত হয়ে গেল।

এদিকে সুলতান মাহমূদের কাছে ঠিকই সংবাদ পৌঁছে গেল লাহোরের মহারাজা ভীমপাল ও তার ছোট ভাই তারালোচন পাল লাহোর থেকে এসে এই এলাকার রাজা মহারাজাদেরকে সুলতানের মোকাবেলায় ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করছে।

তারালোচন পাল ঐ কাজেই একবার মুনাজ ও কন্নৌজ ঘুরে এসেছে। ঘুরতে ঘুরতে একদিন তার চোখে পড়ে লক্ষণের এই ছোট কাফেলা।

কাফেলাটি তার কাছে সন্দেহজনক মনে হওয়ায় এবং লোকগুলোও তার পরিচিত হওয়ায় সে এদের অভিপ্রায় বুঝার জন্য তাদের পিছু নিল। এক পর্যায়ে লক্ষণ শিলার কাছ থেকে চলে যাওয়ার সুবাদে সে শিলার মুখোমুখি হলো। তারালোচন পালের মুখোমুখি হওয়ায় শিলা মোটেও বিব্রতবোধ করলো না। বরং সে অকপটে বলে দিল কোন অভিপ্রায়ে ওরা লক্ষণের এই কাফেলায় শরীক হয়েছে এবং কেন লক্ষণকে তারা সঙ্গ দিচ্ছে।

তোমার ভাই রায়চন্দ্র কি এখন বোন আর কন্যাকেও যুদ্ধে জড়িয়ে ফেললেন? রাজপুতদের কি হয়ে গেলো? তাদের আত্মমর্যাদাবোধ কি গঙ্গার পানি ধুইয়ে নিয়ে গেছে? রাজপুতেরাও কি মুসলমানদের ভয়ে এতোটা ভড়কে গেছে? উষ্মামাখা কণ্ঠে বললো তারালোচন।.....

আমরা তো রায়চন্দ্রকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, মাহমূদ যদি তাকে পরাজিত করে ফেলে তবে আমরা নিশ্চয়ই এর প্রতিশোধ নেবো। এজন্য আমরা সৈন্যদের প্রস্তুত করে রেখেছি। আমরা এ মুহূর্তে সুলতানের মুখোমুখি হচ্ছি না এজন্য যে, যখন একের পর এক যুদ্ধ করে সে ক্লান্ত হয়ে যাবে, তার সৈন্যনা অবসন্ন হয়ে যাবে, আর লোকবল কমে যাবে তখন আমরা এক আঘাতেই তাদেরকে জব্দ করবো। অবশ্য আমরা সুলতানের সাথে চুক্তিবদ্ধ। কিন্তু এই চুক্তি ভাঙ্গার জন্যে আমরা সুযোগের অপেক্ষা করছি। তাকে হত্যা করার কোন দরকার নেই। যদি হত্যা করতেই হয়, তবে লক্ষণপাল ও তার সঙ্গী দুই সৈনিক যাবে, তোমরা এখান থেকেই বাড়ীতে ফিরে যাও।

শিলা তারালোচনকে জানালো, তাদেকে কেউ জোর করে আনেনি। তারাই বরং লক্ষণকে উজ্জীবিত করেছে। রাধা এবং সে কি ভাবে সুলতানকে হত্যার পরিকল্পনা করেছে কি ভাবে তারা মুসলিম সৈন্যদের ধোকা দেবে সব বিস্তারিত তারালোচনকে জানাল শিলা।

তোমাদের পরিকল্পনা বাস্তব সম্মত নয়। তোমরা যাদের ধোকা দেয়ার চিন্তা করছো তাদেরকে ধোঁকা দেয়া সহজ নয়। তোমরাই বরং ধোকায় পড়ে গযনী চলে যাবে এবং তোমাদেরকে নর্তকীতে পরিণত করা হবে কিংবা কোন সেনা কর্মকর্তার রক্ষিতা হয়ে থাকতে হবে।

শিলা তারালোচনকে রাজপুত নারীদের আত্মমর্যাদাবোধের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বললো, তারা কতোটা কঠোর মনোভাব নিয়ে এই অভিযানে বেরিয়েছে। কিন্তু শিলার কথায় আশ্বস্ত হতে পারলোনা তারালোচন। সে তার হবু স্ত্রীর এই ঝুঁকিপূর্ণ অভিযানকে কিছুতেই সমর্থন করতে পারলো না।

এমন কাঙ্ক্ষিত এক অভিযানের মধ্য পথে অনাকাঙ্ক্ষিত বাধা হয়ে দাঁড়ানোতে তারালোচনের উপর ক্ষেপে গেল শিলা। সে ক্ষুব্ধ কণ্ঠে তারালোচনকে বললো, আমার যাওয়া যদি সমর্থন করতে নাই পারো, তাহলে তুমি যাও আমার স্থানে। সেই সাহস তো তোমার নেই। চোরের মতো বেশ বদল করে গহীন জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছো। তোমরা গযনীর সাথে মৈত্রী চুক্তি করেছো। এটাও তো তোমাদের এক ধরনের কাপুরুষতা। তোমরা যদি কাপুরুষ না হও তাহলে সেনাবাহিনীকে সামনে এনে প্রকাশ্যে মাহমূদকে হুমকি দাও না কেন? বলো না কেন, আমরা আর তোমার অধীনতামূলক চুক্তি পালনে রাজী নই।...

এদিকে মথুরার হাজার বছরের পুরনো মন্দির ধ্বংস হয়ে গেছে, ওদিকে তোমরা তোমাদের শহরে মুসলমানদের আচ্ছা করে আযান দেয়ার সুযোগ করে দিয়েছো। তোমরা আযানের আওয়াজে বেশ সাচ্ছন্দেই আছো। কিন্তু পরিস্থিতি আমাকে স্বস্তিতে থাকতে দেয়নি। তোমাদের নিষ্ক্রিয়তা আমার আত্মমর্যাদাবোধ একটা কিছু করার জন্যে আমাকে ঘর ছাড়া করেছে।

শিলার কথায় ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলো তারালোচন। সে বললো, আমি তোমার কথায় সায় দিতে পারছিনা শিলা! যাই বলো, তুমি আমার হবু স্ত্রী। তোমার সাথে আমার বিয়ের বিষয়টি পাকাপাকি হয়ে আছে। আমি কিছুতেই তোমাকে এখান থেকে আর সামনে যেতে দেবো না।

আমি কারো হবু বধূ নই। ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললো শিলা। যে সুলতান মাহমূদকে হত্যা করতে পারবে আমি হবো তার স্ত্রী। আর সে কাজ একমাত্র লক্ষণ পালের পক্ষেই করা সম্ভব। লক্ষণ যদি সেই কাজ করতে গিয়ে নিহত হয় তবে আমি নিজেই মাহমূদকে হত্যা করবো। নয়তো রাধা সেই কাজ সমাধা করবে। তুমি জেনে রাখো, এই লুটেরার জীবন মৃত্যু এখন আমার হাতের মুঠোয়।

হাত মুষ্ঠিবদ্ধ করে দাঁতে দাঁত পিষে দৃঢ় কণ্ঠে শিলা বললো–

আমার হাত মেহেদীর রঙ্গে নয় মাহমূদের তাজা রক্তে রঙ্গিন হবে। মুনাজের কোন রাজপুত তরুনীকে কোন মুসলমান সেবাদাসীতে পরিণত করতে পারবে না। এটা তোমাদের পক্ষে সম্ভব। কারণ তোমার বাপ দাদারা মাহমূদের হাতে একের পর এক পরাজয় শিকার করে নিয়ে মাহমূদের সাথে মৈত্রী চুক্তি করেছে। আর দাসত্ব চুক্তি করে দেশের সম্পদ তোমরা মুসলমানদের হাতে তুলে দিচ্ছো।

তোমার সাথে আমার বিয়ে ঠিক করেছিলো আমার ভাই। কিন্তু আমার সিদ্ধান্তের কথা আজ শুনে রাখো তারালোচন! তোমার মতো কাপুরুষদের আমি ঘৃণা করি। নারী সে রাজপুত হোক আর মজদুরের বংশধর হোক, নারী বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠলে সাগরেও আগুন ধরিয়ে দিতে পারে। আমার পথ ছেড়ে দাও তারালোচন! তোমার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই, আমার সব স্বপ্নসাধ এখন লক্ষণকে ঘিরে। পৃথিবীতে সম্ভব না হলেও স্বর্গে আমাদের বিয়ে হবে। তুমি এই জঙ্গলেই ঘুরে ঘুরে সময় কাটাও।

তুমি কি ভাবছো আমার পক্ষে এখান থেকে তোমাকে তুলে নেয়া সম্ভব নয়? ক্ষুব্ধ ভঙিতে শিলার দিকে এগিয়ে গেল তারালোচনপাল।

তারালোচনকে এগুতে দেখে শিলা পিছনে ঘুরে দৌড়াতে লাগল। শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে দৌড়ে শিলা একটি টিলার আড়ালে চলে গেল।

তারালোচন দৌড়ে ওর পিছু পিছু গিয়ে ওকে দেখে ফেললো। তখন শিলা একটি গাছের আড়ালে দাঁড়ানো। জায়গাটি ঘন গাছ গাছালীতে ভরা। নদী এখানে জঙ্গলের ভেতরে চলে এসেছে। জায়গাটি অনেকটা ঝিলের মতো। এখানকার পানি শান্ত। কোন স্রোত বা ঢেউ নেই।

তারালোচন পাল শিলাকে বললো, শিলা তোমাকে শেষ বারের মতো বলছি, তুমি আমার কাছে এসে পড়ো। শিলা তারালোচনকে হুমকির স্বরে বললো, সাহস থাকে তো আমাকে ধরতে এসো। মাহমূদকে খুন করার আগে আমি তোমাকেই খুন করবো। আমি স্বেচ্ছায় কখনো তোমার কাছে ধরা দেবো না। হুমকি দিয়ে শিলা উল্টো পায়ে পেছনের দিকে সরতে শুরু করল। তারালোচনপাল ঠায় দাঁড়িয়েই শিলাকে আত্মসমর্পণের জন্যে আহবান করছিল এবং বলছিলো,

তোমার পক্ষে কাউকে হত্যা করা সম্ভব নয় শিলা! আমি কিছুতেই তোমাকে এখান থেকে পালাতে দেবো না।

শিলা উল্টো পায়ে পিছনেই সরে যাচ্ছিল। হঠাৎ আতংকিত কণ্ঠে তরলোচন বললো, শিলা! শিলা! আর পিছনে যেয়ো না! পড়ে যাবে। যেখানে আছো সেখানেই দাঁড়াও।

না, আমি কিছুতেই তোমার কাছে ধরা দেবো না। শিলা বুঝতে পারেনি; তারালোচন কী ভয়ংকর বিপদ থেকে তাকে সাবধান করছিল। তারালোচন চিৎকার করে বললো, শিলা! শিলা! তোমার পেছনে রাক্ষুসে কুমির।

তখন একটি কুমির মুখ হা করে একেবারে শিলার পেছনেই দাঁড়ানো। এটি হয়তো কোন ঝুপের আড়ালে লুকিয়ে ছিল। ধীরে ধীরে কুমিরটি এগুতে লাগল। কিন্তু শিলা নির্বোধের মতো তখনো পায়ে পায়ে পিছু সরে যাচ্ছিল। আর দু' পা পিছু হঠতেই মুখ হা করা কুমিরটি শিলাকে এক ঝাটকায় মুখের ভেতরে আটকে ফেললো।

আক্রান্ত শিলাকে কুমির ধরার সাথে সাথে শিলা এমন বিকট আর্তচিৎকার করে উঠলো যে, দূরে ঘুমিয়ে থাকা রাধা ঘুম থেকে জেগে উঠল। রাধা ঘুম থেকে জেগে দেখলো তার পাশে শিলা ও লক্ষণ কেউ নেই। অদূরে দু'জন প্রহরী তখনো বেঘুরে ঘুমাচ্ছে। রাধাা তাদের জাগাল এবং তাদের নিয়ে যে দিকে চিৎকার শোনা গেলো সে দিকে দৌড়াতে লাগল।

হঠাৎ কয়েকজনের দৌড়ানোর শব্দ শুনে তারালোচন পাল একটি ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল এবং মুখে আঙুল দিয়ে বিশেষ ধরনের সাংকেতিক আওয়াজ করল।

রাধা তার দুই সৈনিক সঙ্গীকে নিয়ে দুর্ঘটনাস্থলে পৌছে দেখতে পেল, শিলা একটি কুমিরের মুখের ভেতরে তখনো গোংগাচ্ছে। তার দেহের শুধু মাথা আর একটি হাত বাইরে আছে আর বাকীটা কুমিরের মুখের ভেতরে। শিলার রেশমী চুলগুলো কুমিরের মুখের বাইরে ছড়িয়ে পড়েছে। হঠাৎ অজ্ঞাত স্থান থেকে দু'টি তীর এসে রাধার সঙ্গী দুই সৈনিকের চোখে বিদ্ধ হলো। উভয়েই আর্তচিৎকার করে দু'হাতে চোখ ধরে মাটিতে বসে পড়ল এবং তাদের

চোখে অন্ধকার নেমে এলো। তারালোচন পালের দুই সঙ্গী তার বিশেষ ইঙ্গিতে লক্ষণের সফর সঙ্গী দু'জনের চোখে তীর ছুড়ে তাদেরকে অন্ধ করে দিল।

রাধা ছিলো দুই সৈনিকের আগে আগে। তাই কোন দিক থেকে তীর এসেছে তা সে দেখতে পেলো না। সে শিলার আর্তচিৎকার শুনে উৎকণ্ঠিত হয়ে সামনের দিকে দৌড়াচ্ছিল। কুমিরের মুখে নারীদেহের অবশিষ্টাংশ দেখে দূরেই থমকে গেল রাধা। অবস্থা দেখে তার মাথা চক্কর দিয়ে উঠলো, তার চিৎকার করার ভাষাও যেন লোপ পেয়ে গেলো। ঠিক এমন সময় তার পেছনে পেছনে আসা দুই সৈনিকের আর্তচিৎকার শুনে পিছনে তাকিয়ে দেখতে পেলো তারা উভয়েই তীর বিদ্ধ হয়ে মাটিতে বসে পড়েছে। তখন আর নিজেকে সামলাতে পারলো না রাধা। দাঁড়ানো থেকে জ্ঞান হারিয়ে ঠায় লুটিয়ে পড়ল।

রাধাকে লুটিয়ে পড়তে দেখে তারালোচন পাল রাধাকে ধরার জন্যে এগুতে চাচ্ছিল তখন তার দুই সঙ্গী এই বলে তাকে সতর্ক করলো; সাবধান রাজকুমার! মুসলমান যোদ্ধারা আসছে! আপনি ঝোপের আড়াল থেকে বের হবেন না। সাথে সাথে তারালোচন পাল জায়গা ছেড়ে আরো ঘন ঝোপ ঝাড়ের আড়ালে হারিয়ে গেল। কিছুক্ষণ পর গযনী বাহিনীর চার যোদ্ধা ঠিক সেই জায়গাটিতে এসে থমকে দাড়াল যে জায়গাটি থেকে তারালোচন পাল পালিয়ে ছিল।

তরলোচন পালকে যদি তার দুই সঙ্গী সতর্ক না করতো তাহলে তারালোচনকে মুসলিম যোদ্ধারা পাকড়াও করতে পারতো। তা করতে পারলে বিরাট কাজ হতো তাদের। তারালোচনকে জিজ্ঞাসাবাদ করে তারা ভীমপালের অবস্থান জেনে নিতে পারতো। অল্পের জন্য বিরাট একটি শিকার হাত ছাড়া হয়ে গেল গযনী যোদ্ধাদের।

এরই মধ্যে গযনী যোদ্ধাদের কানে ভেসে এলো ঘোড়া হাঁকানোর শব্দ। নিরাপদ দূরত্বে গিয়ে মুসলিম যোদ্ধাদের কবল থেকে প্রাণ বাঁচাতে উর্ধশ্বাসে ঘোড়া ছুটিয়ে পালাচ্ছিল তারালোচন পাল ও তার দুই সঙ্গী।

গযনীর চার যোদ্ধার মধ্যে একজন ছিলো ডেপুটি সেনাপতি। আর বাকী তিনজন তার অধীনস্থ তিন কমান্ডার।

এরা ছিলো গোয়েন্দা কাজে লিপ্ত। মথুরা থেকে ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়েই তারা নদী পার হয়েছে। কন্নৌজ অভিযানের আগে নদী ও আশপাশের অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য তারা এদিকে এসেছিল। তা ছাড়া মথুরার নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্যে সম্ভাব্য কয়েকটি চৌকি স্থাপনের সুবিধাজনক জায়গা নির্বাচন করার বিষয়টিও তাদের উদ্দেশ্য ছিল।

তারা যখন নদী পেরিয়ে জঙ্গলের ভেতরের ঝিল সদৃশ নদীর অংশে পৌঁছলো, তখন তাদের নজরে পড়ল একটি অচেতন নারীদেহ। সেখান থেকে খানিকটা দূরে তাদের নজরে পড়ল একটি কুমির। কুমিরটি কিছুটা পানিতে নেমে আছে। কুমিরের মুখে একটি মানুষের হাত ঝুলছে এবং নারীর চুল সদৃশ একটি অবয়ব দেখা যাচ্ছে।

ডেপুটি সেনাপতি কুমিরের দিকে ঘোড়া হাকাল, কিন্তু অশ্বরোহীদের দেখে জলহস্তি পানিতে ডুবে গেল। একটু দূরে পড়ে থাকা অচেতন রাধাকে দেখে সঙ্গীদেরকে ডেপুটি সেনাপতি বললো, মনে হয় অচেতন এই মহিলা কোন জঙ্গলী পরি হবে। একে ঘোড়ায় তুলে নিয়ে চলো।

রাধাকে ঘোড়ায় তুলে নিয়ে তারা এদিক ওদিক দেখতে লাগলো, নিশ্চয় এই নারীর সাথে আরো কেউ থাকতে পারে। আশপাশে চোখ বুলালে তাদের নজরে পড়লো, দু'টি মৃত দেহ। উভয়ের চোখে একটি করে তীর বিদ্ধ। একটু এগিয়ে তারা দেখতে পেলো একটি জায়গায় পাঁচটি ঘোড়া দু'টি খচ্চর এবং দু'টি হরিণ বাঁধা রয়েছে। সেখানে গিয়ে তারা দেখতে পেলো, তিন জায়গায় তিনটি বিছানা বিছানো। সেখানে পড়ে থাকা আসবাবপত্র তল্লাশী করার পর তারা ঝোলাটির ভেতরে তরবারী, খঞ্জর এবং অসংখ্য স্বর্ণমুদ্রা পেল। ঝোলার ভেতরে তারা এমন কিছু জিনিসপত্রও পেলো যেগুলো তাদের মনে ব্যাপক জিজ্ঞাসা ও সন্দেহের জন্ম দিলো। ডেপুটি সেনাপতি ছিলেন বয়স্ক ও অভিজ্ঞ সৈনিক। তিনি অচেতন রাধাকে গভীরভাবে দেখে বললেন, এই তরুণী কোনভাবেই জঙ্গলবাসী কোন উপজাতি নয়। তিনি রাধাকে ঘোড়া থেকে নামিয়ে চোখে মুখে পানির ঝাপটা দিলেন এবং মাথায় কিছুটা পানি ঢেলে দিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে রাধা চোখ মেলল। চোখ মেলেই সে উঠে বসে তার পাশে কে বা কারা অবস্থান করছে এ সবের দিকে না তাকিয়েই চিৎকার জুড়ে দিল শিলা! লক্ষণপাল! রাজকুমার! ডাকতে ডাকতে হঠাৎ দৌড় দিল রাধা।

দেরি না করে ডেপুটি সেনাপতি দৌড়ে থাবা দিয়ে তাকে ধরে বললেন, তুমি কোন রাজকুমারকে ডাকছো?:

রাধা কোন কিছু চিন্তা না করেই বলে ফেললো, 'কন্নৌজের রাজকুমার লক্ষণপাল, তোমরা কি তাকে দেখেছো? এটুকু বলেই সে নীরব হয়ে গেল। অল্পক্ষণের মধ্যেই তার কথাবার্তা ও সার্বিক অবস্থা সম্পূর্ণ বদলে গেল। রাধা বলতে লাগল, আমি কন্নৌজের কাছের একটি উপজাতীয় গোত্রের মেয়ে। আমরা মুসলমান হওয়ার জন্য গযনী সুলতানের কাছে যাবো।

তোমাদের গোত্রের নাম কি? জিজ্ঞেস করলেন ডেপুটি সেনাপতি। তোমাদের গ্রামটি কন্নৌজ থেকে কত দূর?

এ প্রশ্নে রাধা হতবাক হয়ে গেল। এমন প্রশ্নের তাৎক্ষণিক উত্তর দেয়া তার পক্ষে সম্ভব হলো না। কারণ, তাদের প্রশিক্ষকদের কেউ একথাটি বলেনি, প্রতিটি উপজাতীয় গোত্রেরই একেকটি নাম পরিচয় থাকে। রাধা যখন নিজেকে উপজাতীয় বলে পরিচয় দিলো, তখন ডেপুটি সেনাপতি রাধার উদ্দেশ্যে বললেন,

শোন তরুনী! আমি গযনীর বাসিন্দা। কিন্তু আমি তোমার ভাষায় কথা বলছি। তা থেকে তুমি বুঝে নিতে পারো আমি তোমাদের এলাকার নাড়ি নক্ষত্র জানি। আমি এখনই কন্নৌজ ও আশপাশের সমস্ত এলাকা দেখে এসেছি। আমি কন্নৌজের ধারে কাছে এমন কোন উপজাতি এলাকা দেখিনি যেখানে তোমার মতো সুন্দরী তরুণী থাকতে পারে।

হঠাৎ করে রাধার মধ্যকার রাজপুতের রক্ত জেগে উঠলো। সে ডেপুটি ও সহযোদ্ধাদের হুমকি দিয়ে বললো, সাবধান! তোমরা কেউ আমাকে স্পর্শ না, আমি তোমাদের হাতে ধরা দেবো না। জীবন্ত থাকা অবস্থায় তোমাদের কেউ আমার গায়ে হাত দিতে পারবে না।

আচমকা ডেপুটি সেনাপতি রাধার বাজু ধরে বললেন, তোমার সৌভাগ্য যে তুমি আমার হাতে ধরা পড়েছো। তুমি এতো সুন্দরী! তার উপর এমন অর্ধনগ্ন উপজাতীয় পোশাক পরেছো যাতে রূপ সৌন্দর্য আরো বেশী ফুটে উঠেছে। এ অবস্থায় এই বিজন জঙ্গলে কোন নারী লোভী পুরুষ তোমাকে পেলে তোমাকে মা-বোনের দৃষ্টিতে দেখবে না। আমি তোমাকে এই নিশ্চয়তা দিতে পারি,

আমার দ্বারা তোমার কোন ক্ষতি হবে না। তুমি যদি আমাকে যাচাই করতে চাও, তাহলে আমি তোমাকে এই তিনজনের হাতে ছেড়ে দিয়ে চলে যাবো, এদেরকে তুমি ভালোভাবে চিনে নাও। আর যদি তুমি নিজের মঙ্গল চাও, তাহলে বলো: কে তুমি? কোত্থেকে এসেছো? রাজকুমার লক্ষণপাল এখন কোথায় আছে? কে এবং কোন উদ্দেশ্য তোমরা এখানে এসেছো?

হঠাৎ রাধা তার আসবাবপত্রের দিকে ছুটে গেল।

গযনী যোদ্ধারা তার কাণ্ড বেশ মজা করেই দেখতে লাগল। আসবাবপত্রের মধ্য থেকে সে একটি ছোট্ট কৌটা খুলল এবং সেটি থেকে হাতে কিছু একটা নিয়ে আরো দূরে চলে যাওয়ার জন্যে ছুটতে লাগলো।

এক কমান্ডার দৌড়ে তাকে ধরে ফেলল এবং তার হাতের কোটাটি ছিনিয়ে নিয়ে ডেপুটি সেনাপতির কাছে দিল। ডেপুটি সেনাপতি সেটিকে হাতে নিয়ে রাধাকে জিজ্ঞেস করলেন, এটি বিষ নয় কি? শোন তরুনী তোমার এই দৌড় ঝাপ পালানোর চেষ্টা অর্থহীন। তুমি এখন আমাদের হাতে বন্দী। তোমাকে আমাদের জিজ্ঞাসার জবাব দিতেই হবে। কি ভাবে তোমার কাছ থেকে জবাব বের করতে হয় তা আমরা জানি। তবে আশা করি নিজের স্বার্থেই তুমি আমাদের প্রশ্নের উত্তর দেবে। কারণ, আমরা কখনো অসহায় কোন নারীর ক্ষতি করি না।

ডেপুটি সেনাপতির নির্দেশে এক কমান্ডার রাধাকে তার ঘোড়ার পিঠে বসিয়ে লাগাম নিজের হাতে নিয়ে নিল। রাধাকে রাখল তার সামনে। যাতে ছুটন্ত ঘোড়া থেকে পালাতে গিয়ে সে আবার কোন দুর্ঘটনা ঘটনানোর অবকাশ না পায়।

এ দিকে নৌকার খোঁজ করতে গিয়ে অনেকক্ষণ নদীর তীর ধরে হেঁটেও লক্ষণপাল কোন নৌকার খোঁজ পেলো না। তার চোখে পড়লো না কোন মাঝি মাল্লা। অবশেষে হতাশ হয়ে ভগ্ন মনে সে তার সঙ্গীদের কাছে ফিরে আসতে লাগল।

লক্ষণ যখন ঝিলসদৃশ নদীর তীরের কাছে আসল তখন তার চোখে পড়ল একটি কুমির একটি আস্ত মানুষকে মুখের ভেতর থেকে উপড়ে ফেলছে। কুমিরের খাবারের রীতি হলো বড় কোন শিকার পেলে ওরা আগে সেটিকে

বিশাল মুখ গহবরে আটকে মেরে ফেলে এবং মেরে সেটিকে আবার শুকনো জায়গায় উগড়ে ফেলে রাখে। কয়েকদিনে শিকারটি পচে গলে নরম হওয়ার পর ধীরে ধীরে সেটিকে সাবার করে।

শিলাকে মুখের ভেতরে আটকে মেরে ফেলার পর কুমির পানি থেকে ডাঙ্গায় উঠে তাকে উগড়ে দিচ্ছিল। লক্ষণ পাল দূরে থেকেই দেখতে পেল, যে জিনিসটি কুমির উগড়ে ফেলছে সেটি একটি নারী দেহ। যার পরনে নারীর পোষাক এবং মাথায় দীর্ঘ চুল.... নারীদেহ দেখে তার শরীর কেঁপে উঠলো। সে ভাবতেই পারছিল না, এটি শিলার দেহ হতে পারে। বিষয়টি সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্য লক্ষণ একটি উচু মাটির টিবিসম ছোট্ট টিলার উপরে উঠে এদিকে তাকাল। কুমির তখন শিলাকে সম্পূর্ণ উপরে ফেলেছে। বিশাল জন্তুটার দু'পাটি দাঁতের আঘাত ছাড়া শরীরে তেমন কোন জখম নেই। অনেকটাই অক্ষত শরীর। প্রায় অক্ষত চেহারা। সে স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছে মরদেহের অবয়ব। হায় এ যে তার ই প্রেমাস্পদ শিলার মরদেহ।

ঠিক এ সময় আরেকটি কুমির দৌড়ে এসে মরদেহটিতে হামলে পড়ল। প্রথম কুমিরটি তার শিকারে ভাগ বসানোকে সহ্য না করে প্রতিপক্ষের উপর হামলে পড়ল। আক্রান্ত কুমির শিলার একটি পা দাঁতে চেপে টানতে লাগল। তখন শিকারী কুমির তার শিকার কব্জায় রাখতে অপর পা ধরে ফেলল। দুই প্রতিপক্ষের টানাটানিতে মরদেহটি শূন্য সোজা হয়ে গেল এবং এক পর্যায়ে উভয় জন্তুর শক্তি প্রয়োগে তা ছিড়ে দুভাগ হয়ে গেল।

অবস্থা দেখে লক্ষণের মাথা চক্কর দিয়ে উঠলো। সে হাতে মাথা চেপে ধরে টিলার অপর দিকে নীচে নামাতেই তার দুই সৈনিক সাথীকে পড়ে থাকা অবস্থায় দেখতে পেলো। নিশ্চল নিথর তাদের দেহ। উভয়ের চোখে বিদ্ধ তীর।

হতবিহবল অবস্থায় লক্ষণ দুই সঙ্গীর লাশের দিকে তাকিয়ে রইল। সে দৃশ্যমান ঘটনার পেছনে কি ঘটেছে কিছুই ঠিক বুঝতে পারছিল না। এ সময় তার কানে ভেসে এলো রাধার আর্তচিৎকার। লক্ষণ পাল!

চিৎকার শুনে ভেসে আসা আওয়াজের দিকে তাকিয়ে লক্ষণ আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলো না। রাধা কয়েকজন গযনী সেনার কব্জায় বন্দী। কোন কিছু চিন্তা না করে নিজের জীবন বাঁচানোর জন্যে যেই লক্ষণ দৌড় দেয়ার

সিদ্ধান্ত নিল তার কানে ভেসে এলো গযনী বাহিনীর ডেপুটি সেনাপতির হুমকি–

পালানোর চেষ্টা করো না ছেলে! তুমি ঘোড়ার চেয়ে বেশী দৌড়াতে পারবে না। বাঁচতে চাও যদি পালানোর চেষ্টা না করে এ দিকে এসো।

পরিস্থিতির ভয়াবহতা আন্দাজ করে লক্ষণ পালানোর চেষ্টা থেকে বিরত রইলো। গযনীর তিন কমান্ডার তাকেও বন্দী করে ফেললো এবং ডেপুটি সেনাপতি লক্ষণকে একটি ঘোড়ায় সওয়ার করিয়ে সবাইকে রওয়ানা হওয়ার নির্দেশ দিলো। তারা লক্ষণের জিনিসপত্রসহ তাদের ঘোড়া খচ্চর ও হরিণ দুটিও সাথে নিল।

লক্ষণপালকে সবার পেছনে রাখা হলো। লক্ষণের পেছনে তার পাশাপাশি চলতে লাগল দলপতি ডেপুটি সেনাপতি।

ডেপুটি সেনাপতি যেতে যেতে লক্ষণকে বললো, এই তরুণী আমাকে সবই বলে দিয়েছে। তাই তাকে আমরা সসম্মানে মথুরা নিয়ে যাচ্ছি। তুমি তার প্রতি লক্ষ রাখবে কেউ তার গায়ে হাত দেয় কিনা? কিন্তু এই তরুণীর মান সম্মান এখন তোমার হাতে। আমরা চাই তুমি যা বলবে সত্য বলবে। তুমি যদি মিথ্যা বলো, তাহলে তুমি কল্পনাও করতে পারবে না ওর সাথে কি আচরণ করা হবে। দেখো, যদি আমি এ মুহূর্তে এখানে না থাকতাম, তাহলে এই তিন যোদ্ধা ওকে এতো সম্মানে রাখতো না। নিশ্চয়ই রহস্য উদঘাটনে মারধর করতো। বলো রাজকুমার! কন্নৌজের রাজকুমার উপজাতীয় পোষাকে এখানে কি উদ্দেশ্যে এসেছো?

আপনি আমাদের ছেড়ে দিলে আপনি যা চাইবেন আমরা আপনাকে সেই পরিমাণই উপঢৌকন দেবো, বললো লক্ষণপাল। আপনারা সবাই আমাদের সাথে কন্নৌজ চলুন। আপনাদের সবার ঘোড়াকেই আমি স্বর্ণ দিয়ে বোঝাই করে দেবো।

আরে বোকা ছেলে! আমরা যদি পুরস্কারের লোভী হতাম তাহলে এই সুন্দরী তরুণীই ছিল আমাদের জন্যে পুরস্কারের জন্যে যথেষ্ট। তাছাড়া তোমাদের আসবাবপত্র থেকে আমরা বিপুল পরিমাণ স্বর্ণমুদ্রা পেয়েছি। ইচ্ছা করলে এগুলোও আমরা চারজন ভাগ বাটোয়ারা করে নিতে পারতাম। তুমি

আমাকে কন্নৌজ নিয়ে যেতে চাচ্ছো। আমরা তো কন্নৌজ থেকেই ফিরছি। আমাদেরকে তোমার কন্নৌজ নিয়ে যাওয়ার দরকার নেই, আমরাই আমাদের ঘোড়াগুলোকে কন্নৌজের সোনা দানা দিয়ে বোঝাই করে নেবো। তোমার কোন পুরুস্কারের দরকার আমাদের নেই। আমরাই বরং তোমাকে পুরস্কৃত করতে চাচ্ছি। সত্যি সত্যি তোমার পরিচয় এবং এখানে আসার উদ্দেশ্য বলে দাও এবং পুরস্কারস্বরূপ তোমার জীবন ও এই তরুণীকে নিয়ে বাড়িতে ফিরে যাও। বললো, ডেপুটি সেনাপতি।

ডেপুটি সেনাপতির তিন সঙ্গীসহ লক্ষণ ও রাধাকে নিয়ে ছোট্ট কাফেলাটি ঘোড়ায় সওয়ার হয়েই নদী পার হলো। পথিমধ্যে তারা অনেক জঙ্গল ময়দান পেরিয়ে এলো। দিন শেষে রাতের অন্ধকার নেমে আসার পরও তাদের পথচলা বন্ধ হলো না। পথিমধ্যে দীর্ঘ ভ্রমনের ক্লান্তি দূর করার জন্যে তারা এক জায়গায় একটু বিশ্রামের জন্যে যাত্রা বিরতি করল। কিন্তু এই দীর্ঘ পথে রাধার সাথে কেউই কোন কথা বললো না। মথুরার সীমানা পর্যন্ত পৌছতে এই কাফেলার প্রায় অর্ধেক রাত হয়ে গেল।

ডেপুটি সেনাপতি পথিমধ্যে লক্ষণপালের সাথে তেমন কোন কথা বলেননি। তিনি শুধু কয়েকবার বলেছিলেন, সে যেনো সত্যি ঘটনা আড়াল করার অপচেষ্টা না করে। প্রকৃত সত্য বলে দেয়। তাহলে তার ও তার সঙ্গীনীর জীবন ভিক্ষা দেয়া হবে এবং তাদের উপর কোন ধরনের অত্যাচার করা হবে না।

জবাবে লক্ষণপাল ছেড়ে দেয়ার জন্যে তাদেরকে পুরস্কারের লোভ দেখানো ছাড়া আর কিছু বলেনি। কিন্তু মধ্য রাতের দিকে কাফেলা যখন মথুরার সীমানায় পৌছাল তখন লক্ষণপাল এগিয়ে গিয়ে ডেপুটি সেনাপতির হাত ধরে বিনয়ের সাথে বললো,

আমি সত্যি কথা বলে দিচ্ছি ..... আপনি আগে আমার কথা শুনুন। আমি এই কাফেলা নিয়ে আপনাদের সুলতানকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে বের হয়েছিলাম। একথা বলার পর তার আদিঅন্ত প্রস্তুতি ও পরিকল্পনাসহ পুরো ঘটনা সে ডেপুটি সেনাপতিকে জানাল। অবশ্য শিলা কিভাবে কুমিরের শিকারে পরিণত হলো এবং তার দুই সঙ্গী কাদের তীরের আঘাতে নিহত হলো এ

ব্যাপারে সে কিছুই জানাতে পারলো না। লক্ষণ আরো বললো, আপনারা মনে করবেন না, আপনাদের শাস্তির ভয়ে আমি সব কথা বলে দিচ্ছি। কিংবা আমার জীবন বাঁচানোর জন্য আমি আপনাদের সব জানিয়ে দিচ্ছি। আপনার উন্নত নৈতিকতা এবং আদর্শিকতায় বিমুগ্ধ হয়ে বিবেকের তাড়নায় আমি আপনাদের কাছে সত্যি কথা বলতে বাধ্য হচ্ছি। আমি আপনাদেরকে আমাদের ছেড়ে দেয়ার বদলে বিপুল পরিমাণ উপঢৌকনের প্রস্তাব দিয়েছি। যে কোন পেশাদার সৈনিকের জন্যে এমন মোটা পুরস্কারেরর লোভ সংবরণ করা কঠিন। তাছাড়া সারা দিন কতো জঙ্গল কতো জনমানবহীন মরুময় এলাকা আমরা পেরিয়ে এসেছি। আমার আশংকা ছিলো এই তরুণীকে আপনার সৈন্যরা অক্ষত রাখবে না। কিন্তু দীর্ঘ সফরে আমি অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করলাম, আপনি ও আপনার সঙ্গীদের কব্জায় এমন অনিন্দ সুন্দরী তরুণী রয়েছে ইচ্ছা করলেই যাকে আপনারা ভোগ করতে পারতেন। অথচ আপনাদের পথ চলায় মনে হয়েছে আপনাদের সাথে যে এই তরুণী আছে এই বিষয়টি যেনো আপনারা ভুলেই গিয়েছিলেন। অথচ এমন সুন্দরী তরুণী হয়তো আপনারা গযনীতে জীবনেও দেখেননি। অপর দিকে গোটা পথ অতিক্রমের সময় আপনারা আমাদের প্রতি কোন বিরূপ আচরণ তো দূরে থাক একটি কথাও বলেননি। আমি এ থেকে বুঝে গেছি আপনাদের অব্যাহত বিজয়ের রহস্য। যাক, আমি আপনার প্রস্তাব মতো সত্য ঘটনা বলেদিলাম... এবার আপনি আপনার পুরস্কার দিন। আমি শুধু এতটুকু পুরস্কার আপনার কাছে প্রত্যাশা করছি, প্রয়োজনে আমাকে জল্লাদের হাতে তুলে দিন কিন্তু এই মেয়েটিকে নিরাপদে তার মা বাবার কাছে পাঠিয়ে দিন। ...

আপনি এই তরুনীর সাহসিকতার দিকটি দেখুন। আপনারা যদি সত্যিকার অর্থেই বীরের জাতি হয়ে থাকেন, তাহলে এক জাত্যাভিমানী পিতার আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন কন্যার সাহসিকতাকে সম্মান করুন। কারণ, এই মেয়েটি এখনো কুমারী। আবেগ ও আত্মমর্যাদাবোধের আতিশয্যে আমাকে উৎসাহিত ও উজ্জীবিত রাখার জন্যে সে এই অভিযানের সঙ্গী হয়েছিল। মূলত এ জন্য এর কোন কসূর বা অন্যায় নেই। সব কসূর আমার।

আমি তোমাকে এই আশ্বাস দিতে পারি এই তরুণী যেমন আছে তেমনি থাকবে এবং তোমাকেও জল্লাদের তরবারীর নীচে দাঁড়াতে হবে না। বললেন

ডেপুটি সেনাপতি। স্বেচ্ছায় সত্যি ঘটনা বলে দেয়ার জন্যে তোমাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। সেই সাথে অপরিণাম দর্শী আবেগ তাড়িত এই অভিযানের মতো বোকামীতে সম্মতি দেয়ার জন্যে তোমাদের অভিভাবকদের ধিক্কার দিচ্ছি।

রাত পোহালে সকালেই লক্ষণপাল ও রাধাকে সুলতান মাহমূদের সামনে পেশ করা হলো। সুলতান লক্ষণপালের মুখ থেকে তার অভিযানের কথা শুনে বললেন,

তুমি কোন অন্যায় করোনি রাজকুমার। আমরা তোমাকে জল্লাদের হাতে তুলে দেবো না। তোমার মতো সাহসী তরুণের আবেগ, স্বজাতির প্রতি মর্যাদাবোধকে আমরা সম্মান করি। মৃত্যুদণ্ড তো দূরের কথা এজন্য আমরা তোমাদের এতটুকু ভর্ৎসনাও করবো না। তোমাদের মতো আত্মর্যাদাবোধ সম্পন্ন শত্রুকে আমরা অসম্মান করি না। ....

আমাকে হত্যার চেষ্টা করাই তোমাদের সব তৎপরতায় সর্বাধিক গুরুত্ব পাওয়া উচিত ছিল। তোমরা সেই চেষ্টা করেছো। অবশ্য একাজে তোমাদের সাফল্য ও ব্যর্থতা তোমাদের কৃষ্ণদেবী ও বসুদেবের ইচ্ছা অনিচ্ছার উপর নির্ভর করে না। আমার জীবন মৃত্যু সম্পূর্ণ আমাদের আল্লাহর ইচ্ছাধীন। আমরা সেই আল্লাহর ইবাদত করি যার পয়গাম পৌছাতেই আমরা এ দেশে এসেছি। আমরা এ দেশের মানুষের কাছে সেই মহান একক সত্তার পবিত্র পয়গাম পৌছে দিতে চাই। যিনি নিরাকার। যার সত্তা মাটি পাথর কাঠ বা ধাতবের তৈরী নিষ্প্রাণ সত্তা নয়। যিনি পানাহার করেন না। যিনি মানুষের দেয়া খাবার গ্রহণ করেন না। যার কোন স্ত্রী সন্তান নেই। যার কোন উত্তরাধিকার নেই। তিনি সর্বত্র বিরাজমান। সব কিছুর স্রষ্টা তিনি। মানুষের জীবন মৃত্যু যার ইচ্ছাদীন।

সুলতান মাহমূদ তার দুভাষীকে বললেন, এই তরুণীকে বলে দাও, সে যেন এই তরুণীর বাবাকে গিয়ে বলে, আমি মুনাজের রাজপুতদের বীরত্ব ও বাহাদুরীর অনেক গল্প শুনেছি। কিন্তু আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন কোন জাতির কোন তরুণীকে শত্রু ঘায়েল করার জন্যে অর্ধ উলঙ্গের পোষাক পরে শত্রুকে নারীর মায়াবী ফাঁদে ফেলার জন্যে চক্রান্তের ঘুঁটি বানাতে পারে না। এটা যেকোন মর্যাদাবোধ জাতির বীর পুরুষদের জন্যে চরম লজ্জাস্কর ....।

আর এই তরুণীকে বলো, সে যেনো তার বাবাকে গিয়ে বলে, আমরা অচিরেই কন্নৌজ আসছি। আমাকে হত্যা করার জন্যে সাহস থাকলে সে যেনো আমার মুখোমুখি হয়। এই তরুণীকে আরো বলে দাও, ইচ্ছা করলে তার বাবার কাছ থেকে আনুগত্য আদায় করতে আমরা তাকে বন্দী করে রাখতে পারতাম। কিন্তু আমরা অপহরণকারী নই। আমরা লড়াকু। প্রতিপক্ষের আনুগত্য আমরা সম্মুখ সমরে শত্রুকে পরাজিত করেই আদায় করে থাকি। কোন নিরীহ লোককে অপহরণ করে কাউকে বেকায়দা ফেলে কাপুরুষের মতো আমরা শত্রুর কাছ থেকে কিছু আদায় করি না।

দুভাষী সুলতানের কথাগুলো লক্ষণের ভাষায় লক্ষণকে বুঝিয়ে দিল। এরপর সুলতান বললেন, এই রাজকুমারকে আরো জানিয়ে দাও, এই বন্দীত্বকে পুঁজি করে আমরা তার কাছ থেকে কন্নৌজের কোন গোপন বা অজানা তথ্যও জানতে চাইবো না। কারণ, আমরা কন্নৌজের সব খবরই জানি। কন্নৌজের ভেতরে বাইরের সব খবরই আমাদের জানা।

লক্ষণপাল অপলক নেত্রে সুলতানের দিকে তাকিয়ে ছিল। আর মনে মনে আতংকগ্রস্ত ছিল, না জানি সুলতান তাদের ব্যাপারে কি ফয়লাসা দেন। রাধাও অবাক বিস্ময়ে সুলতানের চেহারার দিকেই তাকিয়ে ছিল।

সুলতান মাহমূদ দুভাষীর উদ্দেশ্যে বললেন, এদের বলে দাও, এরা যেনো তাদের বাবাকে গিয়ে বলে, যুদ্ধ ছাড়াই যাতে আমাদের হাতে দুর্গ তুলে দেয়। যুদ্ধ করে যদি আমাদের দুর্গ জয় করতে হয় তবে তাদের পরিণতি হবে শোচনীয়।

এরপর সুলতান নির্দেশ দিলেন, এদেরকে তাদের শহরের কাছাকাছি নিরাপদ জায়গায় রেখে এসো এবং তাদের ঘোড়া ও খচ্চর তাদের সাথেই ফিরিয়ে দাও।

আতংক ও ভীত বিহবল অবস্থায় লক্ষণপাল ও রাধা সুলতানের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল। দুভাষী যখন তাদের মুক্তির কথা শোনালো তখন ঘটনার আকস্মিকতায় মুক্তির উচ্ছ্বাসে লক্ষণ উঠে গিয়ে সুলতানের হাত ধরে চুমু খেল আর বিস্ফারিত নেত্রে রাধা সুলতানের সৌম্য কান্তিময় গাম্ভীর্যপূর্ণ চেহারার দিকে তাকিয়ে রইলো। যেনো রাজ্যের বিস্ময় তার চোখের সামনে অভাবনীয় সব দৃশ দেখাচ্ছে।

কিছুক্ষণ পরে লক্ষণ পাল ও রাধাকে দশ বারোজন সিপাহীর প্রহরাধীনে তাদের বাড়ীতে পৌছে দেয়ার জন্য পাঠানো হলো। এই দলের নেতৃত্বের দায়িত্ব দেয়া হলো একজন সেনা কমান্ডারকে। দীর্ঘ সফরের পর এই সেনাদল মুনাজ দুর্গের অদূরে রাধাকে ছেড়ে দিল এবং লক্ষণকে কন্নৌজের কাছের একটি জায়গায় পৌছে দিয়ে মথুরার দিকে ফিরে আসতে লাগল।

ব্যর্থতার গ্লানি ও এক বুক হতাশার বোঝা কাঁধে নিয়ে মুসলিম যোদ্ধাদের কবল থেকে মুক্ত হয়ে লক্ষণ গিয়ে তার বাবা কন্নৌজের রাজা রাজ্যপালের সম্মুখে দাড়াল। ধীরে ধীরে সে জানাল তার সফরের ইতিবৃত্ত। সে আরো বললো–

বাবা আমি আপনাকে নিশ্চিত করে বলতে পারি, সুলতান মাহমূদের মোকাবেলায় বিজয়ী হওয়া আপনার পক্ষে সম্ভব নয়। আপনি কোন অবস্থাতেই তাকে পরাজিত করতে পারবেন না।

মহারাজ! আমি গযনী সুলতানে চোখের দিকে তাকিয়ে দেখেছি তার চোখে এক যাদুকরী আকর্ষণ ক্ষমতা রয়েছে। তার সেনাবাহিনীর প্রতিটি সদস্য এবং কর্মকর্তা কোন মাটির মানুষ নয়। মনে হয় এরা অন্য কোন ধাতুর তৈরী। তাদের অব্যাহত বিজয় ও সাফল্যের রহস্য শুধু যুদ্ধ পারদর্শিতা নয়। গোটা হিন্দস্তানের কোথাও এমনটি শুনিনি যে, রাধার মতো সুন্দরী শক্রপক্ষের কোন তরুনীকে নিজের কব্জায় পেয়েও শক্রপক্ষ এভাবে অক্ষত অবস্থায় সসম্মানে বাবা মার কোলে পৌছে দিতে পারে। সেই সাথে চরমতম শক্র প্রতিপক্ষের রাজার ছেলেকে বাগে পেয়েও তাকে আটক করে স্বার্থোদ্ধার না করে সসম্মানে বাড়ী পৌছে দেয়ার চিন্তা করতে পারে।

লক্ষণপাল যখন তার বাবা রাজ্যপালকে গযনীবাহিনীর হাতে তার ধরা পরা এবং সুলতানের কাছে নীত হয়ে আবার ফিরে আসার গোটা কাহিনী শোনালো, তা শুনে রাজ্যপালের বিস্ময়ের অবধি রইলো না। এরপর থেকে রাজ্যপালের চিন্তা ভাবনা সম্পূর্ণ বদলে গেলো। তিনি কন্নৌজের গোটা সোনাদানা দুর্গের বাইরে স্থানান্তরিত করার চিন্তা করলেন।

যেই চিন্তা সেই কাজ। সেই দিবাগত রাতেই তিনি কন্নৌজের গোটা সোনাদানা এমনভাবে দুর্গের বাইরে স্থানান্তরের নির্দেশ দিলেন, যাতে এ ব্যাপারটি ঘুণাক্ষরেও কেউ আন্দাজ করতে না পারে।

রাধা যখন তার ও লক্ষণপালের ধরাপড়া এবং সুলতানের কাছে নীত হয়ে মুক্তি পাওয়ার ঘটনা তার বাবার কাছে বর্ণনা করলো, তখন তার বাবা সেটিকে মোটেও বিশ্বাস করলেন না। রাধার বাবা বরং তার কথাকে পাত্তা না দিয়ে বললেন, রাজপুতেরা অবশ্যই ভগ্নি হত্যার প্রতিশোধ নেবে।

এদিকে সুলতান মাহমূদ সেনাবাহিনীর একটি অংশকে মথুরায় রেখে বাকী সৈন্যদের কন্নৌজের দিকে অভিযানের নির্দেশ দিলেন। তিনি মথুরার পাশেই একটি জায়গায় যমুনা নদী পার হলেন এবং নদীর পাড় ধরে মুনাজের দিকে অগ্রসর হলেন।

এদিকে রাজপুতেরা জীবনমরণ লড়াইয়ের জন্য পূর্ব থেকেই প্রস্তুতি নিচ্ছিল। সুলতানকে তার গোয়েন্দারা আগেই জানিয়ে দিয়েছিলো, মুনাজের রাজপুতদের সাথেই তাদেরকে সবচেয়ে কঠিন লড়াইয়ের মুখোমুখি হতে হবে। কারণ, মুনাজের প্রতিটি শিশু ও নারী গযনী যোদ্ধাদের মোকাবেলা করার জন্য প্রস্তুত।

হৃদয়ের আয়নায় তাওহীদের আলো

কন্নৌজের চারপাশে ছিল ঘন-বনজঙ্গল। এ জঙ্গল কোন কোন স্থানে বহু দূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। জায়জায় জায়গায় ছিল পাহাড়, টিলা ও সমতল ভূমি। যমুনা নদীর তীরেই ছিল কন্নৌজ শহরের অবস্থান। কন্নৌজ দুর্গকে এমনভাবে তৈরী করা হয়েছিলো যে দুর্গের এক প্রান্তের দেয়াল ঐতিহাসিকদের ভাষায় যমুনার পানি বিধৌত হতো। সেই যুগে কন্নৌজ দুর্গ ছিল একটি বিখ্যাত দুর্গ। দূর-দূরান্তের মানুষ কন্নৌজের দুর্গ শহরের নাম শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করতো।

১০১৮ সালে সুলতান মাহমূদ মথুরা থেকে রওয়ানা হয়ে মুনাজের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন। মুনাজ থেকে কন্নৌজের দূরত্ব ছিল প্রায় সোয়াশো মাইল। কন্নৌজ থেকে চার পাঁচ মাইল দূরে ঘন জঙ্গলের পাশে জনমানবহীন এলাকার একটি পাহাড়ের ঢালে উপজাতীয় পোশাকে দু'জন লোক বসেছিল। এদের এক জনের নাম তালাল আর অপরজনের নাম সালেহ। তখন পশ্চিমাকাশে সূর্য শেষ

আলো বিকিরণ করে অস্ত যেতে শুরু করেছে। এমন সময় দু'জনের একজন তার সঙ্গীকে বললো রাতটা আমরা এখানেই কাটিয়ে দেবো।

আমরা কন্নৌজ থেকে এলাম আজ তিন দিন হলো। কিন্তু কোথাও আমরা কন্নৌজ কিংবা কোন হিন্দু রাজা মহারাজার সৈন্যদের দেখা পেলাম না। তার মানে কি এটা যে, আমাদের সৈন্যদের আগমনের খবর পাওয়ার পর কন্নৌজের সৈন্যরা দুর্গের বাইরে আসবে? বললো তালাল।

আমাদের সৈন্যরা আসা পর্যন্ত আমাদেরকে এই অঞ্চলেই থাকা উচিত তালাল ভাই। বললো তালালের সঙ্গী সালেহ।

সে তালালের উদ্দেশ্যে আরো বললো, হায় আমাদের এ অঞ্চলেই থাকতে হবে এবং কন্নৌজের সেনাবাহিনীর বাইরে আসা দেখে এখান থেকে যেতে হবে। সুলতানকে বলা হয়েছে, তিনি যদি মুনাজ আক্রমণ করেন, তাহলে কন্নৌজের সৈন্যরা পেছন দিক থেকে আক্রমণ করতে পারে। সুলতানকে একথাও বলা হয়েছে, আমাদের মূল লড়াইটা হবে মুনাজ ও কন্নৌজের মাঝামাঝি স্থানে। তাই আমাদেরকে দেখতে হবে কন্নৌজের কোন সৈন্যরা আমাদের সৈন্যদের উপর পেছন দিক থেকে আঘাত হানে!..... আরে তালাল ভাই! মনে হচ্ছে তুমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছো!

নারে সালেহ! এতো জলদী ক্লান্ত হয়ে যাওয়ার লোক আমি না। আমার মনে হচ্ছে দুর্গের বাইরে এসে লড়াই করার মতো সাহস কন্নৌজ রাজার নেই।

এটাইতো আমাদের নিশ্চিত হতে হবে, আসলেই কি কন্নৌজ রাজার এই সাহস আছে কি না, বললো সালেহ। আমরা হলাম গযনী সুলতানের দুটি চোখ। আমাদেরকে দেখতে হবে এই জঙ্গল ঝুকিমুক্ত না এখানে কোন ঝুকি আছে?

তাহলে এসো এখানেই শুয়ে পড়ি। ঠান্ডাটা একটু বেশী। তবুও রাতটা কোনমতে কাটিয়ে দেয়া যাবে, বললো তালাল।

তালাল ও সালেহ ছিল হিন্দুস্তানী মুসলমান। সালেহ ছিলো সেইসব আরবদের বংশধর যারা মুহাম্মাদ বিন কাসিমের সাথে হিন্দুস্তানে এসে আর আরব দেশে ফিরে যায়নি। আর তালালের পূর্ব পুরুষরা ছিল অমুসলিম। মুহাম্মাদ বিন কাসিমের সময় তার পূর্ব পুরুষরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে।

সুলতান মাহমূদ যখন ভারত অভিযান শুরু করলেন, তখন ভারতের অভ্যন্তরীন অবস্থা জানার জন্যে তার স্থানীয় বিশ্বস্ত লোকের দরকার হলো। একাজে তিনি স্থানীয় মুসলমানদেরকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে তার বৈদেশিক গোয়েন্দা শাখায় অন্তর্ভুক্ত করার নির্দেশ দিলেন।

দেশের ভেতরে থেকে বিদেশী শক্তির জন্যে গোয়েন্দাদের দায়িত্ব পালন করা সাধারণ সৈনিকের মতো সহজ ছিলো না। তরবারী ও অশ্বচালনায় পারদর্শিতা দেখাতে পারলেই সেনাবাহিনীতে ভর্তির সুযোগ পাওয়া যেতো। কিন্তু গোয়েন্দার কাজের জন্যে সৈনিকের মতো অশ্বচালনা ও তরবারীতে পারদর্শিতার পাশাপাশি অত্যন্ত মেধাবী ও দূরদর্শিতা থাকতে হতো। কারণ, গোয়েন্দাকে হতে হয় চলন-বলনে বিশেষ পারদর্শী, থাকতে হয় যে কোন অবস্থা ও পরিস্থিতিতে নিজেকে মানিয়ে নেয়ার ক্ষমতা। সেই সাথে যে কোন প্রাকৃতিক ও সামাজিক বৈরী পরিবেশে ও পাহাড়, জঙ্গল, মরু, পানি, চরম শীত, প্রচণ্ড গরম তথা সকল প্রতিকূলতা উপেক্ষা করে কয়েক দিন পর্যন্ত টিকে থাকার মতো দৈহিক সামর্থও তার থাকতে হয়।

গোয়েন্দা কাজের জন্য সব চেয়ে বড় যোগ্যতার ব্যাপার ছিল, গোয়েন্দাকে হতে হতো লোভ লালসাহীন, আবেগ বিরাগ নিয়ন্ত্রণের অধিকারী। গোয়েন্দাদেরকে ঈগলের মতো তীক্ষ্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন এবং চিতা বাঘের মতো ক্ষিপ্রতার অধিকারী হতে হয়। সবচেয়ে বেশী থাকতে হতো নির্ভেজাল ঈমান।

হিন্দুস্তানের অধিবাসীদের মধ্যে আবেগের প্রাবল্য বিদ্যমান ছিল। তখনকার হিন্দুস্তান ছিলো বহু রাজামহারাজাদের শাসনে বিভক্ত হিন্দুস্তানের প্রায় সকল শাসক শ্রেণীই ছিল হিন্দু। হিন্দু শাসকরা কখনো ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মুসলিম অধিবাসীদের বিশ্বাস করতো না।

গযনীর সুলতান মাহমূদ যখন ভারত অভিযান শুরু করেন, তখন থেকে ভারতে বসবাসকারী প্রত্যেক মুসলনমানকেই হিন্দু শাসকরা গযনী সুলতানের গোয়েন্দা হিসেবে সন্দেহ করতে শুরু করে।

এমন সংশয় সন্দেহের মধ্য থেকেও ভারতে বসবাসকারী তৎকালীন মুসলমানদের কেউ কেউ সুলতান মাহমূদের পক্ষে গোয়েন্দা কাজে অংশ গ্রহণ করে এবং সুযোগ মতো মুসলমানদের সাহায্য সহযোগিতা করতে থাকে।

অবশ্য তাদের মধ্য অনেকেই হিন্দুদের ষড়যন্ত্রের জালে আটকে যায় কিংবা আবেগ তাড়িত হয়ে অথবা লোভকে সংবরণ করতে না পেরে তথ্য ফাঁস করে দেয়।

তালাল মাহমূদ ও সালেহ নামের দুই হিন্দুস্তানী ছিলো সুলতান মাহমূদের নিয়মিত গোয়েন্দা দলের সক্রিয় সদস্য। সুলতান মাহমূদকে তার স্থানীয় গোয়েন্দারা জানিয়ে দিয়েছিলো, মথুরা যতো সহজে জয় করা সম্ভব হয়েছে এতোটা সহজে কন্নৌজ জয় করা সম্ভব হবে না। কারণ, যমুনা নদীর তীরবর্তী মুনাজ নামের রাজপুত অধ্যুষিত দুর্গে যখন আক্রমণ করা হবে, তখন পিছন দিক থেকে কন্নৌজের সৈন্যরা আঘাত হানতে পারে। তাই মুসলিম বাহিনীকে গঙ্গা ও যমুনা নদীর মধ্যবর্তী জায়গায় অবস্থান করে শত্রুদের মোকাবেলা করতে হবে। ফলে মুসলিম সৈন্যদের পরাজিত হওয়ার সমূহ আশংকা রয়েছে। অপর দিকে লাহোরের মহারাজা ভীমপাল এই অঞ্চলের ছোট বড় সকল রাজা মহারাজাকেই জোটবদ্ধ করার চেষ্টা করছেন। এমনও হতে পারে ভীমপাল নিজেও তার সৈন্যদেরকে এখানে নিয়ে এসে লড়াইয়ে লিপ্ত হবেন।

সুলতান মাহমূদের স্যৈন্যরা অব্যহত লড়াইয়ে ক্লান্তশ্রান্ত হয়ে পড়েছিল। বহু সৈন্য ছিল আহত এবং নিহিত হয়েছিল প্রচুর। তা ছাড়া এরা নিজ ভূমি গযনী থেকে প্রায় তিন মাস সফরের দূরত্বে অবস্থান করছিল। এ পর্যায়ে এসে গযনী বাহিনী মারাত্মক ঝুকির সম্মুখীন হয়। তাদের গোয়েন্দাদের প্রেরিত তথ্য মতে তারা গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্তী হিন্দু ঘনবসতিপূর্ণ চতুর্দিকে শত্রু বেষ্টিত একটি জায়গায় এসে পৌছে। যেখানে তাদেরকে উজ্জীবিত-অক্লান্ত বিপুল সংখ্যক শত্রুসেনার বিরুদ্ধে বৈরী পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে লড়াই করতে হবে।

সুলতান যখন মথুরা থেকে কন্নৌজের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন, তখন সালেহ ও তালালকে আগে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছিল তারা যেন কন্নৌজের সৈন্যদের তৎপরতা সম্পর্কে সময় মতো সুলতানকে অবহিত করে।

সালেহ ও তালাল তিন দিন ধরে ছন্নছাড়া উপজাতীয় ছদ্মবেশে কন্নৌজের আশেপাশে ঘুরাঘুরি করেছে। তারা লোক চক্ষুর অন্তরালে উচু গাছ ও পাহাড়ের টিলার উপরে উঠেও কন্নৌজের সৈন্যদের তৎপরতা প্রত্যক্ষ করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু কোথাও কন্নৌজের কোন সৈন্যের তৎপরতা তাদের নজরে

পড়েনি। গঙ্গা নদীর তীরে গিয়ে নদীতে চলাচলকারী নৌকাগুলোকেও তারা পর্যবেক্ষণ করেছে কিন্তু কিছুই তাদের চোখে ধরা পড়েনি।

দু'জনের মধ্যে তালাল কিছুটা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু সালেহ অন্যদিনের মতোই ছিল উজ্জীবিত চনমনে। সালেহ তার কর্তব্য পালনের ক্ষেত্রে সামান্যতম ত্রুটিও করতে প্রস্তুত নয়।

সময়টা ছিল ডিসেম্বরের মাঝামাঝি। প্রচণ্ড ঠান্ডা। ঠাণ্ডার প্রকোপ থেকে বাচার জন্যে তারা একটি টিলার আড়ালে যেখানে বাতাস নেই এমন জায়গায় রাত কাটানোর জন্যে শুয়ে পড়ল।

রাতের এক প্রহরের পর সালেহর ঘুম ভেঙ্গে গেল। কোন কিছুর আওয়াজেই মূলত ঘুম ভেঙ্গে গেল তার। ঘুম ভেঙ্গে যেতেই উৎকর্ণ হয়ে কানে ভেসে আসা শব্দের উৎস বোঝার চেষ্টা করল সালেহ। তারা যে পাহাড়ের ঢালুতে শুয়েছিল সেই পাহাড়ের নীচ দিয়ে কিছু সংখ্যক মানুষের চলাফেরার আওয়াজ শুনতে পেল সে। সে স্পষ্ট বুঝতে পেল ঘোড়ার খুড়ের শব্দ। মাথা উচু করে সে দেখতে পেলো। কিছু সংখ্যক লোক ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছে। অবস্থা বুঝার জন্য সে হামাগুড়ি দিয়ে কয়েকগজ এগিয়ে এমন জায়গায় ঘাপটি মেরে থাকল যেখান থেকে অশ্বরোহীদের পরিস্কার দেখা যাচ্ছে। কাফেলার আগে আগে এক লোক মশাল হাতে যাচ্ছে। অনেকগুলো লোক অশ্বরোহী। তাদের সাথে কয়েকটি উটের উপর কি যেন বোঝাই করা হয়েছে।

সালেহ দেখতে পেল কাফেলার মাঝামাঝি একজন দীর্ঘ দেহী স্বাস্থ্যবান লোক। লোকটির পোশাক পরিচ্ছদ দেখতে পুরোহিতের মতো। পুরোহিতের পিছনে পাঁচটি ঘোড়া বোঝাই করা। একটি অপরটির সাথে রশি দিয়ে বাধা। প্রথম ঘোড়াটির লাগাম পুরোহিতে হাতে। সবার পেছনের ঘোড়াটির সাথে দীর্ঘ রশি বাধা এবং সেই রশির সাথেই বাধা আরো আটদশজন লোক। তাদের প্রত্যেকের দু'হাত সামনের লোকের কাধে এবং সবার চোখেই পট্টি বাধা। সবচেয়ে বিস্ময়ের ব্যাপার ছিল পুরোহিত ছাড়া কারো চোখ খোলা ছিলো না। সবাই খুব ধীরে ধীরে সামনে অগ্রসর হচ্ছিল।

পুরোহিত ক্ষীণ আওয়াজে বলেছিল, চলো চলো, আমি দেখতে পাচ্ছি। চলতে থাকো, পথ পরিস্কার আছে কোন অসুবিধা নেই।

চোখ বাধা এই কাফেলা ধীরে ধীরে সামনে অগ্রসন হচ্ছিল। সালেহ্ এ ঘটনা দেখে ধীরে ধীরে হামাগুড়ি দিয়ে সঙ্গী তালালের কাছে এসে তাকে ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে দিল এবং কানে কানে বললো, কোন শব্দ না করে হামাগুড়ি দিয়ে আমার সাথে এসো।

এবার তারা দু'জনেই চোখ বাধা এই কাফেলার গমন পথ দেখল। কিন্তু তারা এর কিছুই বুঝে উঠতে পারলো না কারা কোন উদ্দেশ্যে কোথায় কেন এভাবে যাচ্ছে?

সালেহ্ ও তালাল একটি সুবিধাজনক জায়গায় অবস্থান নিয়ে কাফেলাকে পর্যবেক্ষণ করছিল। কয়েকশ গজ অগ্রসর হয়ে পুরোহিতের নেতৃত্বাধীন এই কাফেলা থেমে গেল। ওখানে একটি খাড়া দেয়ালের মতো পাহাড় সোজা উপরেরর দিকে উঠে গেছে। সালেহ্ ও তালাল পা টিপে টিপে পাহাড়ের উপর দিয়ে সোজা খাড়া টিলার উপরে গিয়ে দাঁড়াল। তারা যেখানে দাঁড়াল, কাফেলাটি তাদের ঠিক নীচে থেমেছে। তখন নীচের মশালের আলো আরো বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে। মশালের আলোয় তারা দেখতে পেলো, দেয়ালের মতো খাড়া টিলার বিপরীতে অপর একটি টিলার ভেতর অনেকটা গর্তের মতো ফাঁকা দেখা যাচ্ছে। ফাঁকা জায়গাটা এমন যে একটি ঘোড়া অনায়াসে তার মধ্যে প্রবেশ করতে পারে।

পুরোহিত মশাল বাহকের কাছ থেকে মশাল নিয়ে বললো, তোমরা সবাই ঠাঁয় দাড়িয়ে থাকবে আমি এসে তোমাদের নিয়ে যাবো

পুরোহিত মশাল নিয়ে বিপরীত টিলার ভেতরের ফাকা জায়গায় প্রবেশ করে অদৃশ্য হয়ে গেল। কিছুক্ষণ পর পুরোহিত আবার মশাল হাতে নিয়ে পাহাড়ের গর্তসম ফাঁকা জায়গার ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো।

কেউ পট্টির ফাঁক দিয়ে কিছু দেখার চেষ্টা করবে না। কেউ যদি চোখের পট্টি সরিয়ে কিছু দেখতে চেষ্টা করো তবে তার শাস্তি হবে মৃত্যুদণ্ড। পুরোহিত চোখবাঁধা লোকগুলোকে হাত ধরে ঘোড়ার পিঠ থেকে কাঠের তৈরী কিছু বাক্স নামানোর কাজে লাগিয়ে দিল। পুরোহিত একটি মশাল জ্বালিয়ে নিজের হাতে নিলো এবং আরো দুটি মশাল জ্বালিয়ে সে সুবিধা মতো জায়গায় দু'জনকে দাড় করিয়ে দিল। ঘোড়ার পিঠ থেকে চোখবাধা লোকজন বাক্স উঠিয়ে পুরোহিতের

নির্দেশ মতো পাহাড়ের মধ্যকার ফাকা জায়গায় ঢুকাতে লাগলো, তারা বাক্স রেখে আবার অন্য বাক্স নিতে ফিরে আসতো। তাদের কেউ কেউ চোখ বাধা থাকার কারণে বাক্স নিয়ে পড়ে যেতো আবার উঠে পুরোহিতের নির্দেশ মতো চলতো। এভাবে একে একে সবগুলো বোঝাই করা ঘোড়ার পিঠ থেকে বাক্সগুলো নামানো হলো এবং চোখ বাধা লোকগুলোর প্রায় সবাই গর্তের মধ্যেই হারিয়ে গেল। অবস্থা দৃষ্টে তালাল ও সালেহর বুঝতে কষ্ট হলো না, এগুলো অবশ্যই কারো ধন-সম্পদ যা গোপনে লুকানো হচ্ছে। কিন্তু লোকগুলোর চোখ বেধে রাখার ব্যাপারটি তারা কিছুতেই বুঝতে পারছিল না।

তালাল বললো, পুরোহিত বেশধারী লোকটি কোন ডাকাতদলের সর্দার হবে। আর চোখবাঁধা এই লোকগুলো হয়তো এই ডাকাত ধরে আনার মজদুর। হতে পারে ডাকাত সর্দারের অন্য লোকেরা আরো কোথাও লুটতরাজ করার জন্য চলে গেছে।

তালাল সালেহকে বললো, সালেহ ভাই! এই ডাকাত সর্দার যদি এখানে পাহারা না বসায়, তাহল আমরা দু'জনে যে পরিমাণ উঠাতে পারি সেই পরিমাণ সম্পদ নিয়ে নিতে পারি, কি বলো তুমি?

তালাল ভাই মন ঠিক করে নাও, তালালকে বললো সালেহ। এ সব চোরাই ধনসম্পদ দিয়ে আমাদের কোন প্রয়োজন নেই। যে কর্তব্য পালনে আমাদেরকে পাঠানো হয়েছে সেই কাজের প্রতি আমাদের মনোযোগ রাখা বেশী দরকার।

আরে তাতো আছেই। আমি কি কর্তব্যে অবহেলা করছি নাকি? বললো তালাল। রাতে তো আর আমরা কোন কাজ করছি না। কোন না কোন ভাবে রাতটা তো আমাদের এখানে কাটাতেই হবে। কাজ যা করার তা তো আগামীকাল দিনের বেলায় করতে হবে। রাতের এই কর্মহীন সময়টা এ কাজে লাগাতে পারি। রাতেই যদি এই লোকগুলো এখান থেকে চলে যায় তবেই না আমরা কাজে হাত দেবো। আমার মনে হয় গুহার ভেতরে কেউ নেই। থাকলে নিশ্চয়ই তারা বাক্স নেয়ার জন্যে গুহার বাইরে আসতো।

না, লুটের সম্পদ নেয়ার জন্যে আমরা কিছুতেই রাতের অন্ধকারে অজানা গুহাতে প্রবেশ করবো না। বললো সালেহ। তালাল ভাই! সম্পদ আর নারীর

লোভ বহু রাজার রাজত্ব ধ্বংস করে দিয়েছে। ধন-সম্পদের প্রতি লোভ করো না। ধুত্তরী! তুমি মানুষ না একটা পাথর। পাগলের মতো কথাবার্তা বলো। তিরস্কারের সুরে সালেহকে বললো তালাল।

সালেহ কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল ঠিক সেই সময় পুরোহিত বেশধারী লোকটি মশাল হাতে নিয়ে গুহার ভেতর থেকে বাইরে বেরিয়ে এলো।

পুরোহিত চোখ বাধা লোকগুলোকে হাত ধরে ধরে ঘোড়ার পাশে আনল এবং এক এক করে সবাইকে ঘোড়ার পিঠে আরোহণ করিয়ে দিল। ঘোড়া ছিল কম লোক ছিল বেশী। দু'জন দু'জন করে এক একটি ঘোড়ার উপর বসিয়ে সবার আগের উটে সওয়ার হয়ে পুরোহিত বেশধারী ফিরতি পথ ধরলো।

লোকগুলো যখন অনেক দূরে চলে গেল তখ তালাল সালেহর উদ্দেশ্যে বললো, চলো, ব্যাপারটি কি দেখে আসি।

সালেহ তালালকে একাজে অগ্রসর হতে নিষেধ করলো। শুধু নিষেধই করলো না সে বলতে বাধ্য হলো, তুমি যদি ওখানে যেতে চাও তাহলে আমি তোমাকে হত্যা করতে বাধ্য হবো।

সালেহর দৃঢ়তা ও কঠোর কথা শুনে তালাল হাসল এবং কথা না বাড়িয়ে উভয়েই শুয়ে পড়ল তখন রাত আর বেশী বাকী নেই।

ভোরের অন্ধকার থাকতেই পুরোহিত কন্নৌজের রাজা রাজ্যপালের দরজায় গিয়ে কড়া নাড়ল। এ সময়ে রাজার জেগে থাকার কথা নয়। রাজার শয়ন কক্ষের দরজায় একজন বাদী দাড়ানো ছিল। সে পুরোহিতকে দেখেই রাজার শয়নকক্ষের ভেতরে প্রবেশ করল এবং ফিরে এসে পুরোহিতকে বললো, আপনি ভেতরে আসুন।

পুরোহিত রাজার কক্ষে প্রবেশ করলে রাজা পুরোহিতকে বললেন, কক্ষের দরজা বন্ধ করে দিয়ে আপনি আমার পাশে বসুন।

রাতেই ধন-সম্পদের শেষ বাক্সটিও সেই জায়গায় রেখে এসেছি মহারাজ!

যারা বাক্স বহন করেছিল এদের সবাইকে কি কারাগারে বন্দী করা হয়েছে?

এদেরকে কারাগারে বন্দী করার দরকার ছিল না মহারাজ! কারণ, তাদের সবার চোখ আমি কাপড় দিয়ে বেধে দিয়েছিলাম। তারপরও আপনার নির্দেশ

পালনার্থে সবাইকেই বন্দী শালায় বন্দী করে রাখা হয়েছে। অবশ্য 'আমি কারারক্ষীদের বলে দিয়েছি তাদেকে যাতে আরামে রাখা হয় এবং খাতির যত্ন করা হয়।

পণ্ডিত মশাই! এখন আপনি ছাড়া আর কেউ আমার এই বিশাল সম্পদের খবর জানে না। আপনাকে আমি কোথা থেকে কোন পর্যায়ে তুলে এনেছি এবং কতোটা সম্মান ও মর্যাদা দিয়েছি এ ব্যাপারটি নিশ্চয়ই বুঝে! আমি আমার সেনাবাহিনীর প্রধান সেনাপতিকে পর্যন্ত এ ব্যাপারে কিছুই জানাইনি। আমার ছোট বিবি শকুন্তলাকে আমি কতোটা ভালবাসি আপনি জানেন, কিন্তু তাকেও আমি বুঝতে দেইনি, রাজপ্রাসাদের সকল সোনাদানা আমি দুর্গের বাইরে সরিয়ে দিচ্ছি।

আমার ব্যাপারে মহারাজের পূর্ণ আস্থা রাখা উচিত।

আমি সেই দিন থেকেই আপনার সহায় সম্পদ দুর্গের বাইরে নিতে শুরু করেছি যখন শুনেছি, সুলতান মাহমূদ মথুরা দখল করে নিয়েছে এবং তার পরবর্তী লক্ষ হচ্ছে কন্নৌজ দুর্গ।

আমি যে জায়াগায় আপনার সম্পদ লুকিয়েছি রাজ মহলের সবার চোখের আড়ালে এক রাতে আপনি আমার সাথে গিয়ে সেই জায়গা দেখে এসেছেন। গত রাতে আমি আপনার ধন-ভাণ্ডারের শেষ বাক্সও সেখানে রেখে এসেছি।

তার মানে কি আমার সোনাদানা সংরক্ষণের বিষয়টি নিরাপদে রয়েছে? পুরোহিতকে জিজ্ঞেস করলেন কন্নৌজের মহারাজা।

হ্যাঁ, এমনই সুরক্ষিত হয়েছে যে, আপনি একাকী সেখানে গেলে জীবন নিয়ে ফিরে আসতে পারবেন না। কারণ, আমি সেখানে কোন মানুষকে নিরাপত্তার দায়িত্বে রাখিনি, আমি ওখানকার নিরাপত্তায় রেখেছি সাপ।

আরেকটি কথা আপনাকে আমার বলতেই হচ্ছে, বললেন রাজা। যদি কোন কারণে এ বিষয়টা ফাঁস হয়ে যায় তবে সেই দিনটিই হবে আপনার জীবনের শেষ দিন। আর যদি আপনার আগে আমার মৃত্যু এসে যায়, তবে আমার সাথে আপনাকেও মরতে হবে।

রাজার এ কথায় পুরোহিতের ঠোটের কোণে বিদ্রূপের হাসি ফুটে উঠলো। তিনি স্মিত হেসে রাজার উদ্দেশে বললেন,

ধন-সম্পদের লোভ মানুষকে পাষাণ বানিয়ে ফেলে। সম্পদের লোভে অনেকেই স্ত্রী সন্তান এবং ধর্মীয় গুরুকেও শত্রু ভাবতে শুরু করে। মহারাজ! আমার কাছে যে সম্পদ আছে এর কাছে আপনার এ সব ধনসম্পদ খুবই তুচ্ছ। আমার ভজন, আমার পার্থনা, অহোরাত্রী শ্রীকৃষ্ণের চরণে আমার আত্ম নিবেদন এমন মুল্যবান সম্পদ যে, আপনাদের মতো রাজা মহারাজা, রাজ্যপাট, সেনাবাহিনীর দাপট আমার কাছে পিপিলিকার গড়ে তোলা আহার্যের স্তূপ মনে হয়।

হ্যাঁ, তাই ঠিক! এজন্যই তো আমি আপনাকে আমার এই গোপন রহস্যের ভেদ পুরুষ বানিয়েছি। বললেন রাজা রাজ্যপাল।

* * *

ঐতিহাসিক আল বিরুনী ও ফারিশ্‌তা লিখেছেন, সুলতান মাহমূদকে তার গোয়েন্দারা জানিয়েছেন, কন্নৌজে গযনী বাহিনীর সাথে হিন্দুরা ভয়ংকর মোকাবেলার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। কন্নৌজ রাজার নানা কাহিনী শুনে সুলতান মাহমূদ খুবই চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। কারণ, ক্রমশ সদস্য সংখ্যা হ্রাস পেতে থাকা সেনাবাহিনীকে আরো শক্তিশালী করার জন্যে গযনী থেকে তার জন্যে কোন রসদ ও জনবল সরবরাহের উপায় ছিলো না। তিনি গভীর ভাবে চিন্তা করছিলেন, কন্নৌজ রাজাকে পরাজিত করতে হলে তাকে খুবই সতর্ক ও সার্থক চাল চালতে হবে। অবশ্য মথুরা জয়ের পর তিনি তার সৈন্যদের কিছুদিন বিশ্রাম দিয়েছিলেন। কিন্তু বিভিন্ন বিজিত এলাকার নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে পথে পথে তার অনেক সৈন্যকে রেখে আসতে হয়েছে এবং অব্যাহত যুদ্ধে তার বহু সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে। ফলে প্রয়োজনের তুলনায় তার জনবল যথেষ্ঠ কম। এ অবস্থায় সৈন্যদের কিছুটা বিশ্রামের সুযোগ দিলেও সেনাপতি ডেপুটি সেনাপতি ও কমান্ডারদের তিনি ক্ষণিকের জন্য বিশ্রামের সুযোগ দেননি। তাদের প্রতিনিয়ত নিচ্ছিদ্র পরিকল্পনা গ্রহণ এবং শত্রুপক্ষের অবস্থা জানার কাজে ব্যস্ত রেখেছেন। সেই সাথে সাধারণ সৈনিকদেরকে মানসিকভাবে চাঙ্গা করার জন্য ইমাম ও খতীবদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলেন।

দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে একের পর এক দুর্গ জয় করার পর সৈন্যসংখ্যা অর্ধেকের চেয়ে নীচে নেমে এলেও তিনি আরো কঠিন যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার ইচ্ছা করলেন। আরো কঠিন যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার ইচ্ছা করলেন এটা ছিল সুলতান মাহমূদের এক প্রকার উন্মাদনা বিজয় এবং কৌশলী চালের সাফল্যের উপর অত্যধিক আস্থার কারণ।

মজার ব্যাপার হলো, যে কন্নৌজ নিয়ে সুলতান মাহমূদ এতটা চিন্তিত বাস্তবে সেই কন্নৌজের অবস্থা ছিল তার ধারণার সম্পূর্ণ উল্টো। যুদ্ধ না করার বাসনায় মহারাজা রাজ্যপাল তার রাজকোষের গোটা সম্পদ রাজধানীর বাইরে পাহাড়ী এক গোপন জায়গায় সরাতে শুরু করেন। সুলতান মাহমূদের অব্যহত বিজয় এবং তার একের পর এক দুর্গ জয়ের ঘটনায় রাজ্যপাল তাকে হারানোর আশা ছেড়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু কন্নৌজের প্রধান পুরোহিত রাজা রাজ্যপালকে লড়াইয়ের জন্য উৎসাহিত করছিলেন। কিন্তু ১০১৮ সালের সেই ভোর বেলায় কন্নৌজের মহারাজা রাজ্যপাল প্রধান পুরোহিতকে এর কারণও বলেদিলেন। প্রধান পুরোহিত যখন প্রত্যুষে রাজার শয়নকক্ষে গিয়ে জানালেন–

মহারাজ! আপনার সকল ধণভাণ্ডার এখন সুরক্ষিত। এখন আপনি ধনরাজী হারানোর আশংকামুক্ত হয়ে দৃঢ়ভাবে মাহমূদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারবেন। আর যদি তা না করেন তাহলে কন্নৌজের প্রধান মন্দিরও মসজিদে পরিণত হবে। আপনার ভুলে গেলে চলবে না, মুসলমানরা যাকে মূর্তি বলে সেগুলোই আমাদের দেবদেবী। এরই মধ্যে আমাদের দেবদেবীদের সাংঘাতিক অবমাননা করা হয়েছে। আপনাকে আমি সতর্ক করে দিচ্ছি, দেবদেবীদের অভিশাপ থেকে বাচার চেষ্টা আপনাকে করতেই হবে।

ভ্রুকুঞ্চিত করে মহারাজা রাজ্যপাল প্রধান পুরোহিতের দিকে তাকিয়ে বললেন,

আপনি যাদেরকে দেবদেবী বলছেন, এগুলো আসলে মূর্তি। তারা যদি অভিশাপ দিয়ে কাউকে ধ্বংস করতে পারে, তবে অসংখ্য দেবদেবীর অপমান ও অমর্যাদার প্রতিশোধ নিতে মুসলিম সৈন্যদের ধ্বংস করে না কেন? মথুরার মন্দিরের মূর্তি ধ্বংস করে যারা আযান দিতে শুরু করেছে, তাদের উপর তারা বজ্রপাত হয়ে ভেঙ্গে পড়ে না কেন? এই মুসলমানরাই আসলে দেবদেবীদের

অভিশাপ। এরাই অভিশাপ হয়ে হিন্দুস্তানের রাজা মহারাজাদের উপর হামলে পড়ছে।

যে রাজা মহারাজা ধর্মের অমর্যাদা হওয়ার পর কোন কার্যকর ব্যবস্থা নেয় না, তাদের উপর অভিশাপতো পড়বেই। দেখুননা, আপনার মতো শক্তিশালী মহারাজাও তো নিজের ধন ভাণ্ডার নিয়ে ব্যস্ত। বললো প্রধান পুরোহিত।

ধনভাণ্ডার আমি লুকিয়েছি সত্য। কারণ, সুলতান মাহমূদ ধনরত্ন লুট করে গযনী নিয়ে যাবে। আমি তাকে কন্নৌজের ধনভাণ্ডার গযনী নিয়ে যেতে দেবো না। সে এখানে এসে ধনরত্নও পাবে না, আমাকেও খুঁজে পাবে না। সে আমাকে বন্দী করবে তো দূরে থাক আমার টিকিটিও পাবে না। সে পাগলের মতো আমাকে এবং আমার ধনভাণ্ডার তালাশ করবে। কিন্তু সে কিছুই খুঁজে পাবে না। আমাকেও পাবে না, আমার ধনভাণ্ডার পাবে না। সে যখন কন্নৌজ পৌছাবে আমি তখন এমন জায়াগায় থাকবো, যেখানে তার সকল সৈন্য মিলেও আমাকে খুঁজে পাবে না।

আপনাকে না পাক, কিন্তু মন্দিরতো তারা ঠিকই পাবে। তারা মন্দিরগুলো ধ্বংস করবে আর আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এসব ধ্বংসযজ্ঞ দেখবো।

মহারাজ! ধনসম্পদের ভালোবাসা আপনাকে কাপুরুষ বানিয়ে ফেলেছে। এজন্য আপনি গযনী সুলতানকে ধোকা দেয়ার চিন্তা করছেন। অথচ আপনি এটা ভাবছেন না, মাহমূদের ভয়ে যদি আপনি এখান থেকে লুকিয়ে পালিয়ে যান, কন্নৌজের সেনাবাহিনী ও লোকেরা আপনাকে ঘৃণা করবে। আপনার বিরুদ্ধে ক্ষেপে যাবে। মহারাজ! আমি আপনাকে ভগবানের দোহাই দিয়ে বলছি, আপনি সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করুন। কন্নৌজের আবাল-বৃদ্ধ প্রত্যেকেই লড়াই করে মরতে প্রস্তুত। গোটা দেশের মানুষকে আমি অগ্নিস্ফুলিঙে পরিণত করার দায়িত্ব নিচ্ছি। আমি কন্নৌজের লোকদেরকে জলন্ত আগ্নেয়গিরিতে পরিণত করবো।

আমাকে ভাবতে দিন পুরোহিত মশাই! আমাকে ভাবতে দিন। অস্থির হয়ে গেলেন মহারাজা রাজ্যপাল। পুরোহিতের কথায় তার চিন্তায় ছেদ পড়লো। তার পরিকল্পনা পুরোহিতের প্ররোচনায় এলোমেলো হয়ে যাওয়ার উপক্রম হলো। অবশেষে সব চিন্তা ঝেড়ে ফেলে মহারাজা রাজ্যপাল বললেন–

শুনুন পণ্ডিত মহাশয়! আমি অনেক ভেবে চিন্তে এ সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এখন আপনি চলে যান। আপনাকে সব কিছু বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তাছাড়া সব ব্যাপার আপনার পক্ষে বুঝে উঠাও মুশকিল।

পুরোহিত হতাশ ও হতোদ্যম হয়ে চলে গেল। পুরোহিত চলে যাওয়ার পর মহারাজা রাজ্যপাল তার সেনাবাহিনীর সব উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে ডেকে বললেন,

"দৃশ্যত মনে হতে পারে আমি কাপুরুষের পরিচয় দিচ্ছি আমি সুলতান মাহমূদের মোকাবেলা না করে আত্মগোপনে চলে যাবো। এটা হবে মাহমূদের জন্যে সব চেয়ে বেশী আঘাত। সে আমার খুঁজে গোটা কন্নৌজ জুড়ে পাগলের মতো আমাকে খোঁজাখুজি করবে। না পেয়ে সে তাড়াতাড়ি কন্নৌজ ছাড়ার চিন্তা করবে না। কারণ এখন পর্যন্ত শক্তভাবে হিন্দুস্তানে তার কারো মোকাবেলার সম্মুখীন হতে হয়নি। সহজেই সব জায়গায় সে বিজয়ী হয়ে গেছে। আমি ভাবছি একের পর এক লড়াই করে এবং বিজয়ের পর বিজয় অর্জন করে সে যখন মনে করবে হিন্দুস্তানে তার মোকাবেলা করার কেউ নেই এবং তার জনবল বিভিন্ন জায়গায় ভাগ-বাটোয়ারা হয়ে কমে যাবে তখণ অন্যান্য রাজাদের নিয়ে আমি একটি শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী গড়ে তুলবো এবং এই কন্নৌজকেই মাহমূদ ও তার সৈন্যদের জন্যে কবরস্থানে পরিণত করবো।

কন্নৌজ রাজা রাজ্যপাল সুলতান মাহমূদের বিরুদ্ধে লড়াই না করার নানা যুক্তি উপস্থাপন করছিলেন; কিন্তু তার সেনাবাহিনীর কর্মকর্তারা নীরবে তার বক্তৃতা শোনা ছাড়া কেউ কোন মন্তব্য করছিলো না। তাদের চেহারার অভিব্যক্তি বলে দিচ্ছিল, তারা মহারাজা রাজ্যপালের সিদ্ধান্তে মোটেও সুন্তুষ্ট হতে পারেনি। তবে তারা কেউ রাজার সিদ্ধান্তের বিপরীতে কিছুই বললো না।

এক পর্যায়ে রাজা রাজ্যপাল সকল সেনাকর্মকর্তার উদ্দেশ্যে বললেন, কি ব্যাপার? তোমরা কেউই কোন কথা বলছো না। আমর সিদ্ধান্ত তোমাদের মনপুত হয়েছে তো?

আমাদের সন্তুষ্টি অসন্তুষ্টির ব্যাপার নয়। আমাদের কাজ আপনার নির্দেশ পালন করা। আমরা আপনার নির্দেশ পালন করবো, বললো তার প্রধান সেনাপতি। কিন্তু আমাদের মধ্য থেকে কেউ লড়াই করতে অস্বীকৃতি জানাবে না।

মহারাজ! আসলে কন্নৌজে আপনার সশরীরে উপস্থিত থাকা না থাকার বিষয়টি এ ক্ষেত্রে প্রধান নয়। এখানে মূল বিষয় হচ্ছে, দুটি ধর্মের লড়াই। হিন্দু রাজারা যদি একের পর এক ময়দান ছেড়ে পালাতে থাকেন, তাহলে একদিন গোটা হিন্দুস্তানই মুসলমানদের দখলে চলে যাবে এবং এখানকার সকল মানুষই মুসলমান হয়ে যাবে।

সেনাপতির কথা শোনার পর মহারাজা রাজ্যপাল সেনাপতির দিকে একটি কাগজ বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, এটি সবাইকে পড়ে শোনাও।

কাগজটি ছিল লাহোরের মহারাজা ভীমপালের লেখা একটি চিঠি। যে চিঠিটি তিনি মুনাজের রাজা রায়চন্দ্রের উদ্দেশ্যে লিখেছিলেন। সেই চিঠি মুনাজের রাজা কন্নৌজ রাজার কাছে পাঠিয়ে দেন।

রাজা ভীমপাল রাজা রায়চন্দ্রের উদ্দেশ্যে লিখেছিলেন, সুলতান মাহমূদ হিন্দুস্তানের রাজা মহারাজাদের মতো নয়। সে কোন শ্যামলা বাদামী মানুষের নেতা নয়। কিংবা কিছু সংখ্যক মেরুদণ্ডহীন অনুগত মানুষের শাসক নয়। তার কথা শুনলেই বহু তেজস্বী যোদ্ধাও তরবারী ফেলে পালিয়ে যায়। মনে রাখতে হবে তার ঘোড়ার জীন আপনার ঘোড়ার জীনের চেয়ে অবশ্যই মজবুত। সে কখনো এক আঘাতে তৃপ্ত হয়ে যায় না এবং একটি টিলা দখল করেই সে বিজয়ের উল্লাসে ফেটে পড়ে না। আপনি যদি তার আক্রমণ থেকে নিজেকে নিরাপদ রাখতে চান, তবে আমি আপনাকে সতর্ক অনুরোধ করবো, আপনি লুকিয়ে পড়ুন।

রাজা রায়চন্দ্র এই চিঠি কন্নৌজ রাজার কাছে এই পয়গাম দিয়ে পাঠালেন যে, আমি লড়াই করে মৃত্যুবরণ করাকেই প্রাধান্য দেবো। এ ব্যাপারে আপনার করণীয় কি হবে সেটি আপনি ভেবে চিন্তে ঠিক করুন।

আমি জানি, সুলতান মাহমূদ কন্নৌজকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করবে। কিন্তু এই ধ্বংসস্তূপ তার জন্যেই কবরস্থানে পরিণত হবে এবং এই ধ্বংসস্তূপের উপর আবার নতুন কন্নৌজের জন্ম হবে। সেই কন্নৌজই হবে গোটা হিন্দুস্তানের নিরাপত্তার প্রহরী।

আমি তোমাদের বলা জরুরী মনে করছি, আমি যে সিদ্ধান্ত নিয়েছি এ বিষয়টি যাতে সাধারণ সৈনিক ও লোকেরা জানতে না পারে।

রাজার সিদ্ধান্তের কথা শুনে সকল সেনা কর্মকর্তা মাথা নীচু করে রাজার দরবার থেকে বেরিয়ে এলো।

এ ঘটনার পরের রাতের ঘটনা। কন্নৌজের প্রধান পুরোহিত মন্দিরের মূর্তির সামনে পুজা অর্চনায় মগ্ন। তখন রাত প্রায় অর্ধেক পেরিয়ে গেছে। সাধারণত মধ্য রাতে পুরোহিত পূজা অর্চনায় লিপ্ত থাকে না। কিন্তু কন্নৌজ রাজার সিদ্ধান্ত পুরোহিতকে পেরেশান করে তুলে। তার চোখের সামনে ভেসে উঠে, সুলতান মাহমূদ আসছে। এসেই প্রথমে মন্দিরের মূর্তিগুলোকে ধ্বংস করছে। এই আশংকায় শংকিত পুরোহিত তার পূজনীয় দেবদেবীদের পায়ে পড়ে আবেদন নিবেদন করছিল, দেবী ঐশ্বরিক শক্তি প্রয়োগ করে যেনো সুলতান মাহমূদকে কন্নৌজে পৌছার আগেই খতম করে দেয়। বিপর্যস্ত মনে দীর্ঘ সময় ধরে পুরোহিত মূর্তির সামনে কান্নাকাটি করে আবেদন নিবেদন করল এবং চিৎকার করে ভজন আওড়িয়ে নানা তন্ত্রমন্ত্র উচ্চারণ করল।

ঠিক এমন সময় মন্দিরের একেবারে গোপন প্রকোষ্ঠে পৌছার দরজা সশব্দে খুলে গেল। কিন্তু একান্ত মনে মূর্তির সামনে আত্মনিবেদনকারী পুরোহিতের কানে দরজা খোলার শব্দ পৌছাল না।

দরজা খোলে একজন নারী পুরোহিতের পেছনে এসে বসল। কিন্তু তখনও পুরোহিত কিছুই টের পেলো না। নারীটি যখন পুরোহিতের কাধে হাত রাখল তখন গা ঝাড়া দিয়ে পেছন ফিরে তাকিয়ে পুরোহিত দেখতে পেল তার পেছনে রাজার ছোট রাণী শকুন্তলা দাঁড়িয়ে তাঁর কাঁধে হাত রেখেছে।

অবাক বিস্ময়াভিভূত পুরোহিত মধ্যরাতে শুকুন্তলাকে মন্দিরে দেখে অবাক কণ্ঠে বললো; আরে! ছোট রাণী! আপনি.....? এই গভীর রাতে! অবশ্য পরক্ষণেই বিস্ময় কাটিয়ে পুরোহিত নিজেকে সামলে নিয়ে বললো,... ঠিক আছে আগে দেবীর চরণে মাথা রেখে পদধুলি নিন।

পুরোহিত কি বললো না বললো সে দিকে শকুন্তলা মোটেও ভ্রক্ষেপ করলো না। মনে হলো তার কানে পুরোহিতের কথা ধ্বনিতই হয়নি। সে গভীর দৃষ্টিতে পুরোহিতের চোখে চোখ রেখে তাকিয়ে রইল। শকুন্তলার তীব্র দৃষ্টিতে পুরোহিতের শরীরে একটা মৃদু কম্পন বয়ে গেল। কারণ পুরোহিত জানতো, শকুন্তলা খুবই দাপটে রাণী এবং রাজার সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ও প্রিয় রাণী।

তাছাড়া অনিন্দ সুন্দরী শকুন্তলা। শকুন্তলার সৌন্দর্যে যাদুমাখা। পুরোহিতের বুঝতে বাকী রইলো না, এই গভীর রাতে রাণী মন্দিরে পূজা অর্চনা করতে আসেনি। এতোটা ধার্মিক মেয়ে শকুন্তলা নয়। তার আসার ধরন এবং চাহনীর ভাব দেখেই পুরোহিত বুঝে ফেলেছিলেন। শকুন্তলা নিশ্চয়ই কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে এই গভীররাতে মন্দিরে এসেছে।

কী ব্যাপার? আপনি আমাকে দেখে এমন ঘাবড়ে গেলেন কেন পণ্ডিত মশাই? এমন সুন্দরী নারী কি আপনি আর দেখেন নি? আপনি যে সব কুমারী মেয়েদের মন্দিরে এনে নিজে ভোগ করেন এবং মানুষদের বলেন, এই কুমারী এখন পবিত্র হয়ে গেছে, ওদের রূপ সৌন্দর্য ও আকর্ষণের চেয়ে আমি মোটেও বেশী আকর্ষণীয় নই।

এসব কথা রেখে আপনি কি উদ্দেশ্যে এসেছেন সে কথা বললেই বেশী ভালো হয় মহারাণী। আপনি দেখছেন না আমি পূজায় ভজনে লিপ্ত?

পণ্ডিত মহারাজ? যদি আমরা পরস্পর পরস্পরকে ধোঁকা দিতে চেষ্টা না করি, তাহলে উভয়ের জন্যই তা মঙ্গল হবে। দৃঢ় কণ্ঠে বললো শকুন্তলা। আপনি এসব কিসের পূজা করছেন? এসব দেবদেবীর। যারা দুদিনের মেহমান মাত্র। আপনার হরেকৃষ্ণ আর বাসুদেব মুসলমানদের তো কিছুই করতে পারলো না। কোথায় গেলো আপনার সেই কুমারী বলিদানের ফলাফল? কি লাভ হলো নিরপরাধ এই কুমারীগুলোর জীবন সংহার করে?

আপনিও কি মহারাজের মতো আমাকে ধর্মের ব্যাপারে বিভ্রান্ত করতে এসেছেন?

না, আমি আপনাকে ধর্মের ব্যাপারে জ্ঞান দিতে আসিনি। আমি এসেছি আপনাকে মহারাজা বানাতে। আপনি শুধু আমাকে বলে দিন, রাজ্যের ধনভাণ্ডার আপনি কোথায় রেখেছেন? আপনি আমাকে সেখানে নিয়ে চলুন। আপনি আর আমি সমস্ত ধনভাণ্ডার নিয়ে কোথাও চলে যাবো। এমনও হতে পারে, আমি আপনাকে কন্নৌজের রাজ সিংহাসনেও বসিয়ে দিতে পারি।

কিসের ধনভাণ্ডার? আমি কোন ধনভাণ্ডারের খবর জানি না।

হ্যাঁ, আমি জানি, আপনি আপনার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে চেষ্টা করবেন কিন্তু আমি জানি আপনি কি করেছেন, ধনভাণ্ডারের খবর আমাকে দিতেই

হবে। আমাকে ধর্ম ও দেবদেবীদের অভিশাপের ভয় দেখিয়ে লাভ নেই। ধর্মকে আমি ধোকাবাজি ছাড়া আর কিছু মনে করি না। আমি শুধু ধনভাণ্ডার নিতে আসিনি। আপনাকেও সাথে করে নিয়ে যেতে এসেছি।

ধর্ম যাই হোক, ধর্মকে যারা ধোঁকা মনে করে তারা দুনিয়াতে সুখে থাকতে পারে না বললো পুরোহিত। জানেন, গযনীর সুলতান কেন একটির পর একটি বিজয় অর্জন করছে? এর কারণ শুধুই ধর্মের প্রতি ভালোবাসা। সে তো গোটা হিন্দুস্তানের সকল মানুষকেই ইসলামে দীক্ষা দিতে চায়। কিন্তু সে আমাদের ধর্মকে প্রচণ্ডভাবে ঘৃণা করে।

আমাদের ধর্ম ঘৃণা করার মতোই, বললো শুকুন্তলা। পণ্ডিত মহারাজ! আপনি আমার কথা বোঝার চেষ্টা করুন। আমি জানি বিগত বিশ পচিশ দিন যাবত আপনি রাজ্যের ধনভাণ্ডার কোন অজানা জায়গায় স্থানান্তরিত করেছেন। আপনি ভেবেছেন, আপনি আর মহারাজা ছাড়া এ ব্যাপারটি আর কেউ জানে না। আপনি হয়তো জানেন না, এই রাজ্যের কোন কিছুই আমার কাছে গোপন থাকে না। আপনি যদি এ ব্যাপারে আমাকে সহযোগিতা না করেন, তবে আপনাকে অনেক বেশী মূল্য দিতে হবে।

আপনি কি আপনার স্বামীকে ধোকা দিতে চাচ্ছেন?

কিসের স্বামী? মহারাজা শুধু আমার মতো এক জনের স্বামী নয়। গিয়ে দেখুন, আজ রাত তিনি আর কারো স্বামী। এজন্যই তো আমি আপনার কাছে আসার সুযোগ পেয়েছি। যতক্ষণ আমার রূপ সৌন্দর্য ঠিক আছে ততোক্ষণ পর্যন্ত মহারাজা আমার স্বামী। পণ্ডিত মহারাজ! আপনি জানেন, মানুষ যখন রাজসিংহাসনে বসে মাথায় রাজমুকুট ধারণ করে তখন আর তার মধ্যে মানবীয় আবেগ ভালোবাসা অবশিষ্ট থাকে না। এসব রাজা মহারাজা ধনসম্পদ ও ক্ষমতা ছাড়া আর কিছুকেই ভালোবাসে না। আমার মতো সুন্দরী কন্নৌজ কন্যা ও বধুদেরকে গযনীর সুলতান বাদী বানিয়ে নিয়ে যাবে এনিয়ে মহারাজের কোন মাথা ব্যাথা নেই। তিনি তার ক্ষমতা ও ধনভাণ্ডার রক্ষা নিয়ে ব্যস্ত। আপনার আমার জীবন ও ধর্মের ব্যাপারে তার কোন উদ্বেগ উৎকণ্ঠা নেই।

ওসব কথা থাক। মহারাজা যা করার তিনি তা করেছেন। আপনি আমি আমাদের চিন্তা করি। আপনি নিজের প্রতি ও আমার প্রতি মনোযোগ দিন।

আপনি যাই বলুন মহারাণী! আপনাকে আমি ধন ভাণ্ডারের খোঁজ দিতে পারবো না।

তাহলে তো আপনাকে অপহরণ করা হবে, বললো শকুন্তলা। কিন্তু আমি আপনাকে হত্যা করতে চাই না। প্রয়োজনে আমি আপনার দু'চোখ উপড়ে শরীরের চামড়া খসিয়ে গহীন জঙ্গলে ফেলে দেবো। আপনি সেই করুন মৃত্যুর কথা একটু ভেবে দেখুন, কি ভয়ংকরভাবে ধুকে ধুকে আপনাকে এই সুখের দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে হবে।

আপনাকে আমি সহজে মরতে দেবো না। আপনার শরীরে বিষধর পিপড়া, পোকা ছেড়ে দেবো, আপনার জীবন্ত শরীরটাকে শিয়াল, কুকুর, কাক, শকুন ছিড়ে ছিড়ে খাবে। আপনাকে ধুকে ধুকে মরতে হবে।

নীরব নির্বাক অবস্থায় পুরোহিত শকুন্তলার নির্মমতার পরিকল্পনা শুনছিল। এ সব কথা শুনে তার বাকরুদ্ধ হয়ে গেল, তার শরীরটা অবশ হয়ে এলো। যে শকুন্তলা ছিল কন্নৌজের কিংবদন্তিতুল্য সুন্দরী, সেই সুন্দরী শকুন্তলা সাক্ষাত পেত্নীর রূপ ধরে পুরোহিতের সম্মুখে হাজির হলো। ধীরে ধীরে সূক্ষ্ম কিন্তু কঠোর ভাষায় ধনভাণ্ডার কব্জা করার জন্য সে পুরোহিতকে গোপন রহস্য বলে দেয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করতে লাগল।

শকুন্তলা বললো–

হ্যাঁ, অবশ্য আমি যদি আপনার জীবন সংহার না করতেই চাই তবে অন্য পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করবো। আমি এখান থেকে সোজা মহারাজার কাছে গিয়ে বলবো, আপনি আমাকে মন্দিরে ডেকে এনে আমার অসম্মান করেছেন, আমার সম্ভ্রমহানির অপচেষ্টা করেছেন। এ জন্য আমি প্রমাণও জোগার করে নেবো। নিজের নখ দিয়েই সারা শরীরে আঁচড় কেটে বলবো, আমি ধস্তাধস্তি করে আমার শরীরে নখের আঘাতে ক্ষত সৃষ্টি করেছেন আপনি।

এমনটি হলে মহারাজা আপনার কোন কথাই শুনবে না। কারণ মহারাজা জানেন, আপনার মন্দিরে কি হয়। মহারাজা জানেন, মন্দিরের প্রত্যেক পণ্ডিত পুরোহিত একেকজন নারীখেকো ....। ধর্মের দোহাই দিয়ে এখানে কুমারী বালিকাদের ধরে এনে তাদেরকে ভোগ করা হয়। প্রতিটি পুরোহিতই একেকটি নারী খাদক। তাই আপনি আমার বিরুদ্ধে কোন যুক্তিই খাড়া করতে পারবেন

না। মহারাজা তার প্রিয় নারীর গায়ে হাত দেয়ার অপরাধে সোজা আপনাকে জল্লাদের হাতে তুলে দেবেন। অবশ্য এই মৃত্যুটা হবে আপনার জন্যে খুব সহজ মৃত্যু।

না না রাণী! আমার প্রতি আপনি এতো নিষ্ঠুর হবেন না। আমি আপনাকে অবশ্যই ধনভাণ্ডারের কাছে নিয়ে যাবো। কখন কোন দিন যাবেন আপনি?

এখনই যাবো। তবে আপনাকে মনে রাখতে হবে মহারাজার কাছে যদি আমার এখবর পৌছে তবুও কিন্তু আপনার পরিণতি তাই হবে যা আমি এতোক্ষণ আপনাকে বলেছি। আমি দশজন পুরুষ ও দশজন নারীকে মহারাজার সামনে দাড় করিয়ে বলবো: আপনি আমাকে ধনভাণ্ডারের লোভ দেখিয়ে আপনার সাথে আমাকে পালানোর প্রস্তাব করেন, আমি আপনাকে হাতে নাতে পাকড়াও করার জন্যে আমার লোকজন নিয়ে ধনভাণ্ডার পর্যন্ত গিয়েছিলাম।

ধনভাণ্ডার নিয়ে যাওয়ার জন্যে তো বহু লোকের দরকার। এই বিশাল কাজ কি এতোটা কম সময়ে এমন গোপনে করা সম্ভব?

আজ আমি শুধু ধনভাণ্ডার দেখে আসবো, এর পর বাকী কাজ গোপনেই করবো আমি। তা কিভাবে করবো, সে চিন্তা আমার। সেই কাজে আপনাকে আমি সঙ্গেই রাখবো। আপনার সাথে আমি প্রতারণা করবো না।

পুরোহিত উঠে দাঁড়াল।

* * *

তালাল ইবরাহীম সেই রাতটি পাহাড়ের ঢলেই কাটাল। সকাল বেলা তালাল সালেহকে বললো, সে পাহাড়ের সেই গুহাটা দেখতে চায়। কিন্তু সালেহ বললো, সবার আগে সে সেই কাজ করতে চায়, যে জন্যে তাদেরকে এখানে পাঠানো হয়েছে। কিন্তু তালাল গুহায় যাওয়ার জন্যে জিদ ধরল। শেষ পর্যন্ত তালালের জেদই বিজয়ী হলো। পুরোহিত যে পাহাড়ী গুহায় চোখ বাধা লোকদের নিয়ে গিয়েছিল। দিনের আলোয় সেই জায়গাটি ভূতুড়ে দেখাচ্ছিল। গুহার কাছের পাহাড়ী ঢালটি ছিল অবাক করার মতো। ঢালের উপরের অংশটি

ছিল খাড়া দেয়ালের মতো। চতুর্দিকে যেন পরিকল্পিত খাড়া দেয়াল। দেয়ালের উপরে নানা গাছ গাছালী ও ঝোপ ঝাড়। ঝোপ ঝাড়ের লতাপাতাগুলো খাড়া হয়ে উপড়ের দিকে না উঠে গর্তের দিকে ঝুকে রয়েছে। ফলে গুহার দিকে ছায়া পড়ে জায়গাটি একটি পরিত্যাক্ত কুয়ার মতো দেখাচ্ছে।

তালাল ও সালেহ্ গুহার ভেতরে চলে গেল। বাস্তবেও যেন এটি একটি কুয়া। যা প্রাকৃতিক ভাবে পাহাড়ের ভেতরে তৈরী হয়ে রয়েছে। কুয়ার মতো জায়গাটিতে কিছু পানি ছিল কিন্তু সেখানে পানির চেয়ে কাদাই বেশী। কূয়ার পাড় দিয়ে চলাচলের জন্যে কিছুটা শুকনো মাটির তৈরী পথের মতো ছিল। তালাল ও সালেহ্ সেই পথ দিয়ে আরো অগ্রসর হলো। কিছুটা অগ্রসর হয়ে তারা দেখতে পেল এটি মাটির তৈরী টিলার মতো। পুরোহিতের লোকেরা এই টিলার আড়ালেই হারিয়ে গিয়েছিল।

উভয়েই মাটির টিলার উপর উঠে দেখল, টিলার ঢালুতে একটি দরজার মতো। দরজাটি ঝুলন্ত লতাপাতা ও গাছ গাছালীতে প্রায় ঢাকা রয়েছে। তারা সেই দরজার মতো জায়গা দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করলে দেখতে পেল কক্ষের মতো একটি জায়গা। তাতে যে কোন মানুষ খাড়া হয়ে প্রবেশ করতে পারবে। ঘর সদৃশ জায়গাটি ছিল অন্ধকার। অন্ধকার ঘরের মতো জায়গাটিতে উভয়েই হাতড়ে হাতড়ে গুপ্তধন তালশ করল কিন্তু মাটি পাথরের অস্তিত্ব ছাড়া তাদের হাতে আর কোন জিনিসের অস্তিত্ব ধরা পড়ল না।

এই ঘরের মধ্যেই একটি গুহার মতো সুড়ং দেখতে পেল তারা। সুড়ং পথটি এতোটাই অন্ধকার যে সেখানে কি রয়েছে তা আন্দাজ করা অসম্ভব। অনেক্ষণ এখানে কাটানোর পর সালেহ্ বিরক্ত হয়ে তালালকে বললো, তুমি যদি এখানে থাকতে চাও তো থাকো, আমি চললাম।

ক্ষুব্ধ সালেহ্কে আর বিরক্ত না করে তালালও একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও সালেহর অনুগামী হলো। কিন্তু বার বার সে পিছনে ফিরে ফিরে গুহাটি দেখছিল। তালালের অবস্থা দেখে পরিস্কার বোঝা যাচ্ছিল, কর্তব্য পালনের কথা বেমালুম ভুলে গেছে। বনের এই কোনটি ছিল অনেকটা ভূতুড়ে এবং অন্ধকারাচ্ছন্ন। সালেহ্ তালালকে নিয়ে প্রায় চারপাচ মাইল দূরে চলে এলো এবং সেখানে একটি পাহাড়ের উপড়ে উঠে দাঁড়ালো। এখান থেকে তারা

কন্নৌজ দুর্গের ভেতরকার অবস্থা পরিস্কার দেখতে পাওয়া যায়। দীর্ঘক্ষণ তারা পাহাড়ের চূড়ায় দাড়িয়ে কন্নৌজ দুর্গ ও শহরে সৈন্যদের তৎপরতা দেখার চেষ্টা করল। কিন্তু তারা সৈন্যদের কোন তৎপরতা দেখতে পেল না।

সুলতান হয়তো তখন মুনাজের কাছাকাছি পৌছে গেছেন। কিন্তু এখনো আমরা জন্নৌজের কিছুই দেখতে পেলাম না। সালেহ্ তার সঙ্গী তালালের উদ্দেশ্যে বলল।

দু'জন মানুষ আমরা। আমাদের পক্ষে পায়ে হেটে আর কতটুকু এলাকা দেখা সম্ভব, বললো তালাল। এমনও হতে পারে, কন্নৌজের সৈন্যরা রাতের অন্ধকারে অন্য কোন পথে মুনাজ চলে গেছে।

সব জায়গায়ই আমাদের লোক আছে'– বললো সালেহ। আমি দৃঢ়ভাবে বলতে পারি, কন্নৌজ থেকে কোন সেনাবাহিনী দুর্গের বাইরে বের হয়নি।

সারা দিন এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করে রাতের বেলায় তালাল ও সালেহ্ পুনরায় আগের জায়াগায় রাত কাটানোর জন্যে চলে এলো। সালেহ্ তালালকে বললো, সে রাত সেখানে কাটাবে সত্য? তবে অর্ধেক রাত ঘুমাবে এবং বাকী অর্ধেক রাতে সে কন্নৌজের আরো কাছে চলে যাবে। কারণ, রাতের বেলায় কন্নৌজের সৈন্যরা তৎপরতা চালাতে পারে। তারা উভয়েই আগের রাতের জায়গায় শুয়ে পড়ল। সারা দিনের ঘোরাঘুরিতে উভয়েই ছিল ক্লান্ত। ফলে শোয়ার সাথে সাথে উভয়েই ঘুমিয়ে পড়ল।

অর্ধরাতের কিছুটা আগে ঘোড়ার খুড়ের আওয়াজে সালেহের ঘুম ভেঙ্গে গেল। পরিস্থিতি সম্পর্কে সতর্কতার প্রয়োজনে সে তালালকে জাগিয়ে দিল। এদিকে তাদের কানে আরো জোরালো হয়ে উঠলো ঘোড়ার খুড়ের আওয়াজ। একটু পরেই এক অশ্বারোহী নজরে পড়ল। সেই সাথে আলোর মশাল।

মনে হচ্ছে আমাদের কাজ শুরু হয়ে গেছে। দুই তিনটি ঘোড়ার খুড়ের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। এদের পেছনে হয়তো সেনাবাহিনী আসছে।

তারা উভয়েই হামাগুড়ি দিয়ে এমন একটা জায়গা চলে এলো, যেখানে তাদেরকে কারো পক্ষে দেখা সম্ভব নয় কিন্তু তারা পাহাড়ের ঢালের পাহাড়ের নীচ দিয়ে যাতায়াতকারী সবাইকে পরিস্কার দেখতে পাবে।

কিছুক্ষণ পর তারা দু'জন অশ্বরোহীকে দেখতে পেল। একজনের হাতে একটি মশাল। অশ্বরোহী লোক দু'জন যখন তাদের আরো কাছে এলো, তখন তালাল বললো, মনে হচ্ছে এই লোকটি গত রাতের সেই লোক এবং তার সাথে আসা লোকটি কোন নারী।

হতভাগার দল। সেনাবাহিনীর সাথে এদের কোন সম্পর্ক নেই। বললো সালেহ। আগন্তুক অশ্বরোহী কূয়ার মতো পাহাড়ের গুহার কাছে এসে থামল এবং এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখে নিয়ে ফাঁকা জায়গায় প্রবেশ করল। আগন্তুকের একজন ছিল পুরোহিত আর অপরজন রাজ্যপালের কনিষ্ঠা স্ত্রী রাণী শকুন্তলা।

তারা উভয়েই ফাঁকা জায়গার ভেতরে গিয়ে দরজার মতো ফাঁকা জায়গা দিয়ে ভেতরে ঢুকল।

সালেহ ভাই! আমি তোমাকে অনুরোধ করছি, চলো না ব্যাপারটি কি দেখে আসি, বললো তালাল।

এটা দেখার কি আছে। স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছো, একজন নারী আর একজন পুরুষ। নারী লোকটিকে দেখে মনে হচ্ছে সে কোন সাধারণ মহিলা নয় কোন শাহ্জাদী হবে হয়তো। জবাব দিল সালেহ।

রাতের এই আগন্তুক নারী কিংবা পুরোহিত কারো প্রতি সালেহর কোন আকর্ষন ছিল না। কিন্তু তালালের মন কিছুতেই স্বস্তি পাচ্ছিল না। সে সালেহর কথার তোয়াক্কা না করে হঠাৎ করে দৌড়ে নীচে নেমে গেল। সালেহ তাকে আটকাতে পারল না। বাধ্য হয়ে সেও নীচে নেমে এলো।

তারা উভয়েই তাদের পরিধেয় কাপড়ের নীচে একটি করে খঞ্জর ও তরবারী লুকিয়ে রাখতো। উভয়েই তরবারী বের করে অত্যন্ত সন্তর্পনে কাদা পানির কিনারা দিয়ে গুহার একেবারে দরজার মতো ফাকা জায়গাটির কাছে চলে গেল।

পুরোহিতের হাতে রাখা প্রজ্জ্বলিত মশাল গুহার ভেতর থেকে বাইরে কিঞ্চিত আলো বিকিরণ করছিলো। পুরেহিত ও শকুন্তলা কেউই কল্পনা করতে পারেনি, এই গভীর রাতে এখানে তারা দু'জন ছাড়া আর কোন মানুষের অস্তিত্ব থাকতে পারে। পুরোহিত ও শকুন্তলা পরস্পর যে কথাবার্তা বলছিল তালাল ও সালেহ গর্তের বাইরে থেকে তা পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছিল।

রানী! এখানেই ধনভাণ্ডার রাখা হয়েছে। আমি আপনাকে আবারো অনুরোধ করছি, আপনি এই লোভে না পড়ে চলে যান। শকুন্তলার উদ্দেশ্যে বললো পুরোহিত।

এখানে তো কিছুই দেখতে পাচ্ছি না, বললো শকুন্তলা। কি ব্যাপারে? ধনভাণ্ডার কি এই বিছানার নীচে? জিজ্ঞেস করলো শকুন্তলা।

শুনুন রানী! এখন আমি ইচ্ছা করলে আপনাকে হত্যা করতে পারি। আপনি আমাকে হত্যার হুমকি দিয়ে ছিলেন এবং আমাকে কঠোর শাস্তির ভয় দেখিয়েছিলেন। কিন্তু এখন যদি আমি আপনাকে হত্যা করি, তাহলে বলেন কে আমার হাত থেকে আপনাকে বাঁচাবে? আপনাকে আমি হত্যা করে মরদেহ এমন জায়গায় লুকিয়ে ফেলতে পারি, শতবার তালাশ করেও আপনার মরদেহের কোন চিহ্ন কেউ খুঁজে পাবে না।

খবরদার পণ্ডিত মশায়! হুমকির সুরে বললো রাণী। মনে করবেন না এই নির্জনে আপনি আমাকে অবলা নারী ভেবে প্রতিশোধ নিয়ে নেবেন। পণ্ডিতজী মহারাজ! আমি আবারো আপনাকে বলছি, নিজেকে ধোঁকায় ফেলবেন না।

মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত হয়ে যাও রাণী! যদি কাউকে ডাকার প্রয়োজন হয় তবে খুব জোরে চিৎকার করতে পারো, তবে কোন লাভ হবে না।

দোহাই পণ্ডিতজী মহারাজ! খঞ্জর বের করবেন না। দয়া করে আমার একটি কথা শুনুন। হাত দরাজ করে প্রার্থনার সুরে বললো শকুন্তলা।

এ সময় গুহার ভেতর থেকে ধস্তাধস্তি ও অস্বাভাবিক কিছু আওয়াজ শোন গেলো। পুরোহিত শকুন্তলার উপর আক্রমণ করছিলো আর শকুন্তলা বাঁচার জন্যে চেষ্টা করছিলো এবং পুরোহিতের আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্যে শকুন্তলা গুহার ফাঁকা জায়গায় দৌড়াচ্ছিলো।

পলায়নপর শকুন্তলাকে ধরার জন্যে পুরোহিত ছুটাছুটি করছিলো। জ্বলন্ত মশালটি তখন এক জায়গায় মাটিতে গেড়ে দেয়া হয়েছিল। বড় একটি ঘরের মতো গুহাটি ছিল মশালের আলোয় আলোকিত।

পুরোহিত শকুন্তলাকে দৌড়াতে দৌড়াতে এক পর্যায়ে গুহায় প্রবেশ পথের দিকে তাকিয়ে থমকে গেল। এদিকে শকুন্তলাও পালানোর জন্যে গুহার প্রবেশ মুখের দিকে অগ্রসর হতে গিয়ে থেমে গেল। তারা উভয়েই দেখতে পেল

ভবঘুরে বেদুঈনের বেশে ময়লা ছেড়া পোশাকের দুটি লোক খোলা তরবারী নিয়ে গুহা দাঁড়ানো।

অবস্থা দেখে পুরোহিত ও শকুন্তলা উভয়েরই অন্তরাত্মা কেঁপে উঠলো। এদিকে তালাল সালেহ ও নীরবে দাঁড়িয়ে ছিল। কোন কথা বলছিল না।

নিজেকে সামলে নিয়ে খুবই দৃঢ়তা ও গম্ভীর কণ্ঠে পুরোহিত বললেন, কে তোমরা? এখানে কিসের জন্য দাড়িয়ে আছো? চলে যাও এখান থেকে। এখানে আমাদের অনেক লোক আছে। ওরা এলে তোমাদের টুকরোও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

হাতের খঞ্জর ফেলে দাও, দৃঢ় অথচ সহজ গলায় বললো তালাল। খঞ্জর ফেলে দিয়ে উভয়েই আমাদের সামনে এসো। এখানে তোমরা কি করছো, কি আছে এখানে?

পুরোহিত স্মিত হেসে বললেন, আমরা মুসাফির। আমরা কন্নৌজ যাবো। এই মহিলা আমার বিবি। বাইরে আমাদের ঘোড়া দাঁড়ানো রয়েছে। রাতটা কাটানোর জন্যে আমরা এখানে যাত্রা বিরতি করেছি।

সালেহ নীরবে ঠায় দাঁড়িয়ে রইল। তালাল কিছুটা অগ্রসর হয়ে এক ঝটকায় পুরোহিতের হাত থেকে খঞ্জরটা ছিনিয়ে নিয়ে তার তরবারীর আগা পুরোহিতের ঘাড়ে ঠেকিয়ে বললো–

জীবন বাচাতে চাও তো সত্য বলো, এখানে কি আছে? ইচ্ছা করলে আমরাও তা খুঁজে দেখতে পারি, কিন্তু তখন আর তুমি বেঁচে থাকবে না এবং এই নারী থাকবে আমাদের দখলে। তালাল শকুন্তলার দিকে তাকিয়ে বললো, আমি কি বলছি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো। অতএব পরিণতি কি হতে পারে একটু চিন্তা কর।

এখানে ধনভাণ্ডার আছে। তোমরা যা চাও, তাই আমি তোমাদের দিয়ে দেবো। তোমরা তা নিয়ে চলে যাবে। বললো শকুন্তলা।

হ্যাঁ, এখানে ধনভাণ্ডার লুকানো রয়েছে। সে যা বলেছে তাই সত্য। বললেন পুরোহিত।

এই পাহাড়ে ধনভাণ্ডার কোত্থেকে এলো। আর তোমাদের পরিচয় কি? জানতে চাইলো তালাল।

আমি কন্নৌজের প্রধান মন্দিরের প্রদান পুরোহিত। আর সে কন্নৌজ রাজার স্ত্রী রাণী। তোমরা যদি পুরস্কার নিতে চাও, তবে আমি তোমাদের পুরস্কার দিয়ে দেবো। কিন্তু তোমাদেরকে পুরস্কার নিয়ে এখান থেকে চলে যেতে হবে। তালালের উদ্দেশ্যে বললো পুরোহিত।

চলে যাবো না থাকবো সেটা আমরা ভেবে দেখবো। এর আগে বলো ধনভাণ্ডার কোথায়? পুরোহিতকে জিজ্ঞেস করলো তালাল। এসো। বলে রাণী শকুন্তলা তালালের বাজু ধরে তাকে নিয়ে গুহার কাছে চলে গেল এবং বললো, আমি তোমাকে ধনভাণ্ডার দেখিয়ে দিচ্ছি।

শকুন্তলার আহ্বানে তালাল তার সঙ্গে চলে গেল। সালেহ্ তাকে বাধা দিল কিন্তু তালাল বাধা মানল না। সালেহ্ তখন সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না সে কি করবে। সে তালালের অনুসরণও করতে পারছে না, আবার পুরোহিতকেও ছেড়ে যেতে পারছে না। কারণ, পুরোহিতকে ছেড়ে দিলে সে হয়তো তার অন্য লোকদের ডেকে নিয়ে আসতে পারে। এদিকে শকুন্তলার মতো সুন্দরী নারীর সাথে তালালের চলে যাওয়াটাকেও সে মেনে নিতে চাচ্ছে না। কিংকর্তব্য বিমূঢ় অবস্থায় সালেহ হাতের তরবারী উঠিয়ে পুরোহিতের সামনে দাড়িয়ে রইল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সালেহ্ আশংকা করছিল, তালাল জীবিত ফিরে এলেও এই সুন্দরী নারীর কুপ্রভাব তার উপর পড়বেই পড়বে।

শকুন্তলা ও তালাল কিছুক্ষণ পর ফিরে এলো। তালালের চেহারা ও তার ভাবভঙ্গিই বলে দিচ্ছিল, সে আর গযনী বাহিনীর দৃঢ়চেতা কর্তব্য পরায়ন গোয়েন্দা নয়; সে সম্পূর্ণ এক ভিন্ন তালাল।

তালাল এসেই পুরোহিতকে বললো, সে যেন বলে দেয় আসলে ধণভাণ্ডার কোথায় আছে?

এ সময় সালেহ হুংকার দিয়ে বললো; তালাল! বেরিয়ে এসো ওখান থেকে।

তালাল সালেহ'র দিকে একবার তাকিয়ে পুরোহিত ও শকুন্তলার দিকে তাকিয়ে বললো, তোমরা দেয়ালের সাথে ঠেস দিয়ে বসো। এর পর তালাল সালেহকে ওখান থেকে একটু দূরে নিয়ে বললো,

সালেহ্ ভাই! আমার কথাটি মনোযোগ দিয়ে শোন। আমি মোটেও কর্তব্য ভুলে যাইনি এবং কর্তব্য পালনে কোনরূপ অবহেলা করছি না। আমি তোমাকে

ধোঁকা দিচ্ছি না। এখান থেকে আমরা দু'জনে যদি কিছু নিয়ে নেই তাতে ক্ষতি কি?

তালাল! তোমার শরীর থেকে আমি এই মহিলার দুর্গন্ধ পাচ্ছি, সেই সাথে তোমাকে অপবিত্র মনে হচ্ছে। নারীর সবচেয়ে বড় শক্তিই হচ্ছে তার নারীত্ব আর পুরুষের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা হলো তার পৌরুষত্ব। আমার তখনই সন্দেহ হচ্ছিল ওই মহিলা তোমাকে কোন মন্দ উদ্দেশ্যে ভেতরে নিয়ে যাচ্ছে। তুমি দাবি করছো, আমাকে তুমি কোনরূপ ধোঁকা দিচ্ছো না।........

কিন্তু আমি মনে করছি এই নারী ও গুপ্তধন তোমার ও আমার মধ্যে দেয়াল হয়ে দাঁড়িয়েছে। একে কেন্দ্র করে তুমি ও আমি এক সময় একে অন্যের প্রতিপক্ষে পরিণত হতে পারি। তোমার ভুলে যাওয়া উচিত নয়, সুলতান মাহমূদের জয় পরাজয় তোমার ও আমার কর্তব্য পালনের উপরই নির্ভর করে।

সালেহ ভাই! আমার কথাটি একটু শোন। আমরা হিন্দুস্তানের মানুষ। গযনীর লোকেরা আমাদের কি দেয়? গযনী সেনাবাহিনীর কাছ থেকে আমরা যে সামান্য পারিশ্রমিক পাই, মৃত্যু ঝুকি নিয়ে এই জটিল কাজের এতটুকু বিনিময় কি যথেষ্ট?

যে দায়িত্ব আমরা কাধে তুলে নিয়েছি, এর প্রতিদান দেবেন মহান আল্লাহ। তালাল! তুমি কেন নিজেক গযনী সেনাদের কর্মচারী মনে করছো। আমরা গযনী বাহিনীর কর্মচারী নই; ইসলামের সৈনিক।

সালেহ ভাই! হাতের কাছে এতো বিপুল সম্পদ পেয়েও তা ছেড়ে দেয়া ঠিক হবে না।

নিজের লক্ষ্যের কথাটি একবার স্মরণ করো তালাল। আমরা কুরআন শরীফ হাতে নিয়ে শপথ করে ছিলাম কর্তব্য পালনে প্রয়োজনে জীবন বিলিয়ে দেবো। কিন্তু কর্তৃপক্ষকে ধোকা দেবো না। আমরা শপথ করেছিলাম, আমাদের পায়ের নীচে যদি স্বর্ণমুদ্রার স্তুপ ঢেরে দেয়া হয় তবুও সেদিকে তাকাবো না। সর্ববস্থায় নিজের ঈমানকে রক্ষা করবো। প্রিয় তালাল ! কখন কার মৃত্যু এসে যায় বলা যায় না। এমনও হতে পারে ঈমানের বিপরীতে এই সম্পদ জীবনে ভোগ করার সময়ই পাওয়া যাবে না, এর আগেই মৃত্যু এসে যাবে।

ঠিক আছে সালেহ ভাই! আমাকে সময় মতো পরীক্ষা করে নিও। এখন তুমি একটু এখানে দাঁড়াও, আমাকে ওখান থেকে কিছু নিয়ে আসার সুযোগ দাও। এই বলে তালাল সালেহর কথায় ভ্রুক্ষেপ না করেই আবার পুরোহিতের কাছে চলে গেল।

তালাল পুরোহিতকে বললো, আমাকে ধনভাণ্ডারের কাছে নিয়ে চলো।

হ্যাঁ, পণ্ডিত মহারাজ! এখন আর আমাদের অপেক্ষা করার সময় নেই। চলুন! তালালের সুরে সুর মিলিয়ে শকুন্তলাও পুরোহিতকে ধনভাণ্ডার দেখিয়ে দেয়ার তাগাদা দিল।

পুরোহিত বসা অবস্থা থেকে দাঁড়িয়ে ফাঁকা দেয়ালের এক জায়গায় আঙুল রেখে তালাল ও সালেহর উদ্দেশ্যে বললো, তোমরা উভয়েই তোমাদের তরবারী বর্শার মতো করে এখানে আঘাত করো।

পুরোহিতের কথায় সালেহ কোন প্রতিক্রিয়া দেখাল না। সে ঠায় নির্বিকার দাঁড়িয়ে রইল। তালাল অগ্রসর হয়ে সেখানে তরবারী দিয়ে আঘাত করলে তরবারী অর্ধেকেরও বেশী সেখানে দেবে গেল। এবার তালাল সালেহকে আসার জন্যে ডাকল। কিন্তু সালেহ বললো, তোমাদের এই ধনভাণ্ডারের প্রতি আমার কোন আগ্রহ নেই। সালেহ তরবারী তালালের দিকে নিক্ষেপ করে বললো, এই নাও তরবারী। যা করার তুমিই করো।

পুরোহিত তরবারী উঠিয়ে নিয়ে তালালের তরবারীর পাশে বিদ্ধ করে তালালকে বললো, এখন তরবারী দুটো আরো ডানদিকে দাবিয়ে দাও।

উভয় তরবারী যখন ডান দিকে দাবিয়ে দিল, তখন মাটির একটি চাকার মতো ধীরে ধীরে সরে আসতে শুরু করল। এখানে নিশ্চয় আলগা মাটির কোন দেয়াল আছে। তালাল মাটির দেয়ালটিকে শক্ত করে টান দিলে সেটি গড়িয়ে পড়ে গেল এবং একটি সুড়ং এর মতো ফাঁকা জায়গা বেরিয়ে এলো।

রাণী! তুমি এই সুড়ং পথে ঢুকে পড়ো। রাণীর উদ্দেশ্যে একথা বলে পুরোহিত তালালের উদ্দেশ্যে বললো–

তুমিও এর মধ্যে প্রবেশ কর। আমি মশাল নিয়ে তোমার পেছনে পেছনে আসছি।

সালেহর দিকে তাকিয়ে পুরোহিত বললো, তুমি! তুমি কি ভেতরে যাবে না?সালেহ মাথা নেড়ে বললো–

না, আমি ঢুকবো না।

সালেহর অনাগ্রহ দেখে পুরোহিতের ঠোটের কোণায় স্মিত হাসির রেখা ফুটে উঠলো।

রাণী শকুন্তলা, পুরোহিতের কথা শোনেই মাথা নীচু করে সুড়ং এর মধ্যে ঢুকে পড়ল। তার পিছু পিছু তালালও প্রবেশ করল। পুরোহিত তাদের উদ্দেশে বললো, অন্ধকার দেখে তোমরা ভয় করো না।

সালেহ দাঁড়িয়ে থেকে ভাবছিল, পুরোহিত হয়তো মশাল নিয়ে ওদের পিছু পিছু যাবে। কিন্তু ওরা ভেতরে প্রবেশ করার পর পুরোহিত মশালের দিকে ভ্রূক্ষেপই করল না।

একটু পরেই সুড়ং এর ভেতর থেকে কোন কিছু পিছলে পড়ার শব্দ শোনা গেল। এরপর দুবার ধমকের আওয়াজ শোনা গেল। এরই মধ্যে কানে ভেসে এলো শকুন্তলার ক্ষীণ চিৎকার। এ সময় পুরোহিত আড় চোখে সালেহর দিকে তাকাল। পুরোহিতের ঠোটের স্মিত হাসি তখন আরো প্রলম্বিত হয়েছে।

ততক্ষণে সুড়ং এর ভেতরে শোনা গেল তালালের চিৎকার।

সালেহ ভাই! আমাকে এখান থেকে উদ্ধার করো।

তালালের চিৎকার শুনে কোন বিপদ মনে করে সালেহ সুড়ং এর ভেতরের দিকে দৌড় দিতে চাচ্ছিল ঠিক তখনই পুরোহিত তার পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে বলল–

তুমি বলেছিলে এ সব ধনভাণ্ডারে প্রতি তোমার কোন আগ্রহ নেই। তাই তুমি এখানেই থাকো। তোমার মতো মানুষের বেচে থাকার দরকার আছে।

সুড়ং এর ভেতর থেকে ক্রমান্বয়ে শকুন্তলা ও তালালের আর্তচিৎকার আরো প্রকট ভাবে আসতে লাগল। চিৎকার শুনে মনে হচ্ছিল তারা সুড়ং এর মধ্যে কোন গভীর গর্তে পড়ে গেছে। ঘটনার আকস্মিকতায় সালেহ করণীয় কি বুঝে উঠতে প্যারছিল না। সে এটাও বুঝতে পারছিল না আসলে ভেতরে ওরা কেন চিৎকার করছে। সে নীরবে পুরোহিতের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করছিল।

কিছুক্ষণ পর সালেহ পুরোহিতকে জিজ্ঞেস করল, ওরা ভেতরে চিৎকার করছে কেন? পুরোহিত জ্বলন্ত মশাল হাতে নিয়ে সালেহকে বললো,

তুমি আমার পেছনে পেছনে এসো। তোমাকে চিৎকারের কারণ দেখাচ্ছি।

পুরোহিত মশাল নিয়ে আগে আগে সুড়ং পথে প্রবেশ করল। সালেহ পুরোহিতকে অনুসরণ করল। পনেরো বিশ কদম অগ্রসর হয়ে পুরোহিত থেমে গেল এবং সালেহর উদ্দেশ্যে বলল, তুমি আমার পাশে এসে দাঁড়াও! সাবধান সামনে অগ্রসর হবে না।

পুরোহিত এবার হাতের মশালটিকে নীচের দিকে তাক করাল। সালেহ উঁকি দিয়ে দেখতে পেল, সামনে একটি গভীর কূপ। সেই গভীর কূপ থেকে শকুন্তলা ও তালালের আর্তচিৎকতার ভেসে আসছে। ততক্ষণে তাদের আর্তচিৎকার অনেকটাই ক্ষীণ হয়ে এসেছে।

পুরোহিত সালেহর উদ্দেশ্যে বলল, চলো, এবার এখান থেকে বেরিয়ে যেতে হবে। উভয়েই যখন সুড়ং এর ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো, তখন পুরোহিত মাটিতে ক্লান্তিতে বসে পড়ল এবং সালেহর উদ্দেশে বলল, এসো, এখানে বসো। এখন বন্ধুর মতো তোমাকে আমি দুটি কথা বলবো।

সালেহ পুরোহিতের কাছে জানতে চাইলো, আগে আমাকে বলো, যা দেখলাম, তা আসলে কি? তুমি তো তাদেরকে ধনভাণ্ডার দেখতে পাঠিয়ে ছিলে?

আরে দোস্ত! আগে বলো, তোমার পরিচয় কি? সালেহকে জিজ্ঞেস করলো পুরোহিত। তুমি যদি পরিচয় দিতে না চাও। তবে আমি তোমার পরিচয় বলে দিতে পারি। আসলে তুমি মুসলমান। অবশ্য মুসলমান হলেও তুমি হিন্দুস্তানী মুসলমান। তবে তোমরা উভয়েই গযনী বাহিনীর গোয়েন্দা। কি? আমি ঠিক বলিনি?

হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলেছো। পুরোহিতের কথায় সায় দিলো সালেহ। কিন্তু আগে আমার প্রশ্নের জবাব দাও।

যে গভীর কূপ তুমি দেখেছো, এই কূপের মধ্যে হিন্দুস্তানের সবচেয়ে ভয়ংকর বিষাক্ত সাপ রয়েছে। যে সাপে এদের ধ্বংস করেছে।

এ গর্ত আমি খুঁড়েছি এবং এর মধ্যে সাপও আমিই রেখেছি। গর্তের উপড়ে খড়কুটা বিছিয়ে তাতে মাটির আবরণ দিয়েছি। এরা সাথে মশাল নিয়ে গেলেও বুঝতে পারতো না, মাটির নীচে গভীর গর্ত রয়েছে, আর সেই গর্তে অপেক্ষা করছে ওদের মরণ! বললো, পুরোহিত।

তাহলে ধনভাণ্ডার কোথায় রেখেছো? পুরোহিতকে জিজ্ঞেস করলো সালেহ।

ওখানেই আছে, তবে ধনভাণ্ডারে যেতে হলে গুহার উপরে কোন পাটাতন রেখে সেটি পেরিয়ে যেতে হবে। অবশ্য এছাড়াও নিরাপদ আরেকটি পথ আছে।

যাক আমাকে আর সেই পথের কথা বলোনা, পুরোহিতকে থামিয়ে দিল সালেহ। তাহলে হয়তো আমিও কর্তব্য ভুলে পথচ্যুত হয়ে যাবো।

অচেনা বন্ধু! আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শোন। তোমাকে আমি মূল্যবান তথ্য দিচ্ছি। কারণ, তোমার মধ্যে আমি ধনসম্পদের লোভ দেখিনি। লোকে বলে যেখানে ধনরত্ম লুকানো থাকে সেখানে নাকি অবশ্যই সাপ বিচ্ছু থাকে। যে সাপ বিচ্ছু ধনরত্মকে পাহারা দেয়। কথাটি মোটেও সত্য নয়। লোকেরা এও বলে, গুপ্তধন বিষাক্ত সাপের মতো বিষাক্ত হয়ে থাকে। কেউ যদি গুপ্তধন পেয়েও যায় তবে সাপে পরিণত হয়। একথার কারণ হলো, কেউ যাতে গুপ্তধন ছিনিয়ে নেয়ার সাহস না করে।....

দোস্ত! তুমি এখনো যুবক! তুমি এই দুনিয়ার অনেক কিছুই দেখোনি। আমি অনেক কিছু দেখেছি। অনেক কিছু শুনেছি। আমার অভিজ্ঞতার ঝুলিতে অনেক কিছু আছে। আমার অভিজ্ঞতার ঝুলি অনেক সমৃদ্ধ। দীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতায় আমি বুঝতে পেরেছি যার ভেতরে ধনসম্পদের লোভ লালসা বাসা বাধে সে আর মানুষ থাকে না। এই গুহায় যে সাপগুলো রয়েছে মনে করতে পারো এগুলো মানুষের পাপের ফসল। সাপের একটি দিক হলো লোভ, অপর দিকটি হলো লালসা। আর তৃতীয় আরেকটি দিক আছে যাকে বলা হয় খ্যাতি। প্রতিটি পাপই একটি সাপ। এ সাপগুলো মানুষের পায়ের নীচেই গড়াগড়ি করে। ধর্ম কর্ম ত্যাগ করে ধনসম্পদ পেয়ে যদি মানুষ সব কিছু পেয়ে গেছে বলে উল্লাসিত হয় এবং মনে মনে যদি ভাবে আমি পৃথিবী জয় করে ফেলেছি, তাহলে তার বিবেক অন্ধ হয়ে যায়। বিবেকের অন্ধত্বের কারণে একটু ইঙ্গিতেই

সে এ ধরনের সাপের গুহায় গিয়ে স্বেচ্ছায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে। আর তার অতি লোভ তার জীবনকেই কেড়ে নেয়। দোস্ত! আমিও ইচ্ছা করলে এই ধনভাণ্ডার হাতিয়ে নিতে পারতাম। আমি ছাড়া আর কেউ এই ধনভাণ্ডারের খবর জানে না। এই ধনভাণ্ডারের যে প্রকৃত মালিক সেই জানে না, ধনভাণ্ডার কোথায় রাখা হয়েছে। কিন্তু যে দিন থেকে এই ধনভাণ্ডার হেফাযতের দায়িত্ব আমার উপর এসেছে আমি পথ ভ্রষ্ট হওয়ার আশংকায় সারারাত পূর্জা অর্চনা করে কাটিয়েছি।

তোমার ধর্ম সত্য হলে এই ধনরাজী তোমাকে বিভ্রান্ত করতে পারতো না বললো সালেহ। আমাকে দেখ না। তুমি আমাকে বলেই দিয়েছো, সাপের গুহার উপরে কোন পাটাতন রেখে গর্ত পেরিয়ে গেলেই ধনভাণ্ডার পাওয়া যাবে। কিন্তু তাতেও এই ধনভাণ্ডারের প্রতি আমি মোটেও আগ্রহবোধ করছি না। আমি আমার কর্তব্য পালনের ব্যাপারেই চিন্তা করছি। সালেহ্ পুরোহিত আরো বললো, আমার একটি কথা মন দিয়ে শোন পণ্ডিত! তোমাকে দিয়ে আমি আমার কর্তব্য কর্ম পূর্ণ করতে চাই। আমি পবিত্র কুরআন হাতে নিয়ে শপথ করেছি, কর্তব্য পালনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনে আমি জীবন বিলিয়ে দেবো, কখনো কোন লোভ লালসার শিকার হবো না। এখন তোমার প্রাণ আমার হাতে তুমি যদি আমার প্রশ্নের জবাব না দাও, তাহলে বাধ্য হয়েই আমি তোমাকে সাপের গুহায় নিক্ষেপ করবো।

তুমি কি নিজেকে এতোটাই বুদ্ধিমান মনে করো? এই বলে তীর্যক দৃষ্টিতে সালেহর দিকে তাকিয়ে বললো পুরোহিত,

পুরোহিতের কথায় সালেহ হেসে ফেললো। পরক্ষণেই তার হাসি মিলিয়ে গেল পুরোহিতের চেহারায় বিস্ময়কর আত্মবিশ্বাস দেখে। কারণ, পুরোহিত এক হাতে মশাশল নিয়ে নিয়েছে এবং অপর হাতে তরবারী। পুরোহিতের হাতের মশালের হাতল ছিল তরবারীর চেয়েও অনেক দীর্ঘ। পুরোহিত হঠাৎ এমন দ্রুত উঠে গেল যে, সালেহ তার অবস্থান থেকে নড়তেই পারল না।

এবারে পুরোহিত সালেহকে হুমকি দিল, তোমার হাতেও তরবারী আছে এবার এসো, তুমি তোমার কর্তব্য পালন কর, আর আমি আমার কর্তব্য পালন করি।

সালেহ যখন তরবারী উঠিয়ে পুরোহিতের দিকে অগ্রসর হলো, তখন পুরোহিত দীর্ঘ হাতলধারী জ্বলন্ত মশাল দিয়ে সালেহর চেহারায় আঘাত করল এবং সালেহর চেহারা ঝলসে গেল এবং তার দু'চোখে অন্ধকার নেমে এলো। এবার পুরোহিত চিৎকার দিয়ে বললো, পারলে আমার আঘাত থেকে প্রাণ বাঁচাও।

পুরোহিতের চিৎকার শুনে সালেহ লাফ দিয়ে সেখান থেকে সরে গেল।

পুরোহিত আবারো হুমকি দিয়ে বললো, আমি তোমাকে মোকাবেলা করার পূর্ণ সুযোগ দেবো তুমি তোমার কর্তব্য পালন করতে পার।

সালেহ কৌশল বদল করে পুরোহিতের উপর আঘাত করতে চেষ্টা করছিল কিন্তু প্রতিবারই পুরোহিত মশাল দিয়ে সালেহের আঘাত ঠেকিয়ে দিচ্ছিল। কিন্তু পুরোহিত সালেহর উপর কোন আঘাত হানল না। সালেহ একের পর এক আঘাতের চেষ্টা করে হাফিয়ে উঠলো। সালেহর কয়েকটি আঘাত গর্তের দেয়ালে গিয়ে আঘাত করল। এক পর্যায়ে পুরোহিত এক হাতে মশাল ও অন্য হাতে তরবারী নিয়ে সালেহর উপর প্রচণ্ড আক্রমণ করতে শুরু করল। সালেহ পুরোহিতের প্রতিটি আঘাতই তরবারী দিয়ে ফিরিয়ে দিচ্ছিল। কিন্তু পুরোহিতের প্রচণ্ড এক আঘাতে সালেহর তরবারী হাত থেকে দূরে ছিটকে পড়ল। এবার পুরোহিতের মশালের উত্তাপের চাপে সে পিছু হটতে লাগল। যেই সালেহ পিছিয়ে গিয়ে তরবারী উঠাতে চাইল, তখন পুরোহিত তরবারী দিয়ে তার মাথায় প্রচণ্ড আঘাত করল। এবার বাঁচার জন্যে সালেহ বসে গেল। এবার পুরোহিত মশাল দিয়ে সালেহর চেহারায় আঘাত করতে চাইলে সে বসে বসেই আরো পেছনে সরে গেল এবং বসে বসেই পিছনের দিকে সরতে লাগল। পেছন ফিরে সালেহর পক্ষে দেখা সম্ভব ছিল না যে, সে সাপের গুহার পাড়ে চলে এসেছে।

এবার পুরোহিত তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বলল, দেখে নাও, তুমি এখন কোথায় এসে পৌছেছো। তোমার পেছনেও মরণ আগেও মরণ। বলো, বাঁচতে চাও না মরতে চাও।

মরণে আপত্তি নেই, বললো সালেহ। কারণ, আমি ধনরত্নের লোভে মরছি না। কর্তব্য পালন করতে গিয়ে মরছি। এসো, আঘাত করো পণ্ডিত। মরতে মরতেও লড়ে যাবো।

তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে পণ্ডিত বললো, না তোমার মরার দরকার নেই, বাইরে বেরিয়ে এসো। একথা বলে পুরোহিত মশাল নিয়ে গুহার বাইরে বেরিয়ে এলো।

রণক্লান্ত বিধ্বস্ত পরাজিতের মতোই গুহার বাইরে বেরিয়ে এলো সালেহ।

পণ্ডিত গুহা থেকে বাইরে বের হয়ে মশালের হাতল মাটিতে গেড়ে দিয়ে তরবারীটি ছুড়ে ফেলে মাটিতে বসে পড়ল। পণ্ডিত যেন নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল, সালেহ আর তার উপর হামলা করবে না।

এখানে বসো, অনেকটা নির্দেশের ভঙ্গিতেই সালেহকে বললো পণ্ডিত।

কাবুতে পেয়েও তুমি আমাকে কেন হত্যা করোনি? কেন আমাকে তুমি সাপের গুহায় গড়িয়ে পড়তে পিছু হটতেবাধ্য করেননি? বসতে বসতে সালেহ পুরোহিতকে জিজ্ঞেস করল।

আমার দৃষ্টিতে হত্যা করার মতো কোন অপরাধ তুমি করোনি। বরং তোমার কর্তব্য পালন আমাকে মুগ্ধ করেছে' বললো পুরোহিত। তুমি আমার মতোই কর্তব্যপরায়ণ এবং নিজ ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। তোমার মধ্যে লোভ-লালসা নেই। যুদ্ধ বিগ্রহকে আমি ঘৃণা করি। আমি ধর্মের সেবক বটে কিন্তু এক সময় আমি সৈনিক ছিলাম। এর প্রমাণ তুমি হাতে নাতে পেয়েছো। যে ভাবে তুমি আমাকে জব্দ করতে চেয়েছিলে তা কোন সাধারণ লোকের পক্ষে মোকাবেলা করা সম্ভব হতো না। ধনভাণ্ডারকে তুমি ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছো। এজন্য আমি তোমাকে পুরস্কৃত করতে চাই।

তুমি যদি আমাকে পুরস্কৃত করতেই চাও, তাহলে সেই জিনিস তুমি আমাকে দাও, যা আমি তোমার কাছে চাই, বললো সালেহ। তোমার এই ধনভাণ্ডার থেকে আমার কিছুই দরকার নেই।

কি চাও তুমি? জিজ্ঞেস করল পুরোহিত।

কন্নৌজে সৈন্যরা কোথায় সুলতান মাহমূদের সাথে মোকাবেলা করার পরিকল্পনা করেছে? তারা কি দুর্গবন্দী হয়ে লড়াই করবে, না দুর্গের বাইরে গিয়ে গযনী বাহিনীর মোকাবেলা করবে?

শোন দোস্ত! আমরা একে অন্যের শত্রু। আমাকে তুমি এমন কোন প্রশ্ন করো না যে প্রশ্নের জবাব দিলে আমার দেশ ও জাতির ক্ষতি হতে পারে এবং

তাতে সুলতান মাহমূদের বিজয়কে ত্বরান্বিত করতে পারে। তুমি একজন বিশ্বস্ত দেশ প্রেমিক। এজন্য আমি তোমাকে একটি জরুরী কথা বলে দিতে চাই। শোন বন্ধু! আমি যে কথা তোমাকে বলবা সেটি তোমার জন্যে বিরাট পুরস্কার। তুমি এখান থেকেই চলে যাও এবং ফিরে গিয়ে তোমার সুলতানকে বলো, তিনি যেন কন্নৌজের দিকে অগ্রসর না হোন। আমাদের মহারাজা প্রতীজ্ঞা করেছেন, কন্নৌজে এলে সুলতান মাহমূদকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারবেন এবং গঙ্গা যমুনার মধ্যবর্তী জায়গাটিকে তিনি গযনী বাহিনীর জন্যে কবরস্তানে পরিণত করবেন।

তোমাদের মহারাজার কাছে কি এমন শক্তিশালী সেনাবাহিনী আছে? পুরোহিতকে জিজ্ঞেস করলো সালেহ।

যদি কোন সেনাবাহিনী শত্রুকে সম্পূর্ণ ধবংস করার দৃঢ় সংকল্প করে তখন সে তার সামর্থ ও শক্তির দিকে তাকায় না। বললো পুরোহিত। পুরোহিত আরো বললো, কন্নৌজের প্রতিটি নারী শিশু পর্যন্ত গযনী সুলতানের উপর মূর্তি ও মন্দির ধ্বংসের প্রতিশোধ নিতে মরিয়া। তাছাড়া কন্নৌজের মহারাজা শুধু একা নন, তার সাথে লাহোরের মহারাজা ভীমপালও রয়েছেন। তার সেনাবাহিনী এখানে পৌছে গেছে।

ভীমপাল এখন কোথায়? তার সৈন্যরাই বা কোথায়?

একথা আমি তোমাকে বলতে পারবো না দোস্ত বললো পুরোহিত। আমি তোমাকে যে কথাটা বলতে চাচ্ছি তুমি এখান থেকে ফিরে গিয়ে তোমার সুলতানকে সতর্ক করো। তাহলে তিনি হয়তো খুশী হয়ে তোমাকে পুরস্কৃত করবেন। তাকে বলো, এই জঙ্গলাকীর্ণ গোটা এলাকা জুড়ে তার জন্যে মৃত্যুর জাল বিছিয়ে রাখা হয়েছে, এই জাল ছিন্ন করে তিনি বেরিয়ে যেতে পারবেন না। এখানে এলে তার বাহিনীরও সেই অবস্থা হবে, তার বাহিনীর হাতে মহাবনের সৈন্যদের যে অবস্থা হয়েছিল। মহাবনের সৈন্যরা যমুনায় ডুবে মরেছিল, এখন গযনী বাহিনীকেও সেই নদীতেই ডুবে মরতে হবে। ভীমপালের সৈন্যরা ছাড়াও এখানে রয়েছে মথুরা বুলন্দ শহরও মহাবনের পালিয়ে আসা সৈন্যরা। এ সব ফেরারী সৈন্যদের সমন্বয়ে আরেকটি সেনা দল তৈরী করা হয়েছে। এরা সবাই প্রতিশোধের আগুনে জ্বলছে। এখানে এলে তোমাদের সুলতানের পক্ষের দুর্গ অবরোধ করা কোনভাবেই সম্ভব হবে না। ......

দোস্ত! বাস্তবে সুলতান মাহমূদকে এখনো সাত্যিকার প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হয়নি। অথচ তার বাহিনী এখন কোন কঠিন মোকাবেলা করার উপযুক্ত নয়। আমাদের মহারাজারা তাকে সুযোগ দিয়েছেন, যাতে তিনি কন্নৌজের জালে এসে পা দেন। তিনি কিন্তু এই জালেই পা দিতে আসছেন। তাই তুমি দ্রুত ফিরে যাও এবং তাকে ফেরাও। তাকে গিয়ে বলো, অনর্থক মানুষের জীবন হানি ঘটানো এবং বিদেশে এনে নিজ দেশের সৈন্যদের মৃত্যুমুখে ঠেলে দেয়া থেকে তিনি যেন বিরত থাকেন। এখানে এসে জীবন্ত পুড়ে মরার চেয়ে গযনী গিযে রাজার বেশে মৃত্যুবরণ করাই শ্রেয়।

এ কথার পর তারা দু'জনই পাহাড়ের কাছেই সমতলে বেঁধে রাখা ঘোড়ার কাছে এলো। দুটি ঘোড়া পাশাপাশি বাধা ছিল। একটিতে সওয়ার হয়ে এসেছিল শকুন্তলা অপরটিতে এসেছিল পুরোহিত।

পুরোহিত সালেহকে একটি ঘোড়া দেখিয়ে বললো, এই ঘোড়াটি শুকুন্তলার। যে গর্তে তোমার সঙ্গীর সাথেই মরেছে। তুমি ওর ঘোড়াটি নিয়ে যাও।

রাতের পর দিনের প্রথম প্রহরে পুরোহিত মহারাজা রাজ্যপালের রাজপ্রাসাদে মহারাজার সামনে উপবিষ্ট। পুরোহিত মহারাজাকে জানালেন, তার অতি প্রিয় রাণী শকুন্তলাকে ধনভাণ্ডার গ্রাস করে ফেলেছে। পুরোহিত গত রাতের শকুন্তলা ও তার মধ্যকার ঘটে যাওয়া পুরো ঘটনা মহারাজাকে বললেন। শকুন্তলার মৃত্যুর ঘটনা শুনেও রাজার মধ্যে কোন ভাবান্তর হলো না। মহারাজা এই ঘটনা শুনে স্মিত হাসলেন এবং পুরো ব্যাপারটি বুদ্ধিমত্তার সাথে সামাল দেয়ার জন্যে পুরোহিতকে ধন্যবাদ জানালেন।

আমি আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছি মহারাজ! উচ্ছ্বাসিত কণ্ঠে বললো পুরোহিত। রাণী শকুন্তলার সাথে গযনীর এক গোয়েন্দাকেও সাপের গর্তে নিক্ষেপ করেছি। আর এক গোয়েন্দাকে প্রতারিত করে জীবন ভিক্ষা দিয়ে বিভ্রান্ত করে পাঠিয়ে দিয়েছি। তাকে বলে দিয়েছি, তুমি গিয়ে বলবে, তোমাদের সুলতান যেন কন্নৌজের দিকে পা না বাড়ায়।

পুরোহিত সালেহকে যা কিছু বলেছিলেন সবই মহারাজা রাজ্যপালকে বলল। তিনি আরো বললো, মহারাজ! আমি আপনার মর্যাদা ও সম্মানের জন্য

মন্দিরের সম্মান রক্ষার্থে এবং আপনার বিজয়ের জন্যে মিথ্যা বলেছি। আপনি আমার এই মিথ্যাকে সত্যে পরিণত করে দেখাবেন।

ধনভাণ্ডারের চিন্তা করার দরকার নেই। ভগবানের দয়ায় ধনভাণ্ডার পর্যন্ত কেউ পৌছাতে পারবে না। আমি দৃঢ়ভাবে বলতে পারি, যে কথা আমি গোয়েন্দাকে বলে দিয়েছি এর ফলে সুলতান মাহমূদ আতংকিত হয়ে পড়বে। এখন আপনি কিছু সৈন্য শহরের বাইরে পাঠিয়ে দিন। লড়াই করুন মহারাজ! লড়াই করুন!

পণ্ডিত মহারাজ! আপনি এক গোয়েন্দার মাধ্যমে সুলতান মাহমূদকে বিভ্রান্তিকর খবর দিয়ে মারাত্মক ভুল করেছেন বললেন মহারাজা রাজ্যপাল। মহারাজা তখন তার কাছে রক্ষিত ভীমপালের চিঠি পুরোহিতের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, এই চিঠিটি ভীমপাল রায়চন্দ্রকে লিখেছিলেন, রায়চন্দ্র সেটি আমার কাছে একটি নোটসহ পাঠিয়ে দিয়েছেন।

একি? এটি সেই ভীমপালের চিঠি যাকে লোকে নির্ভিক অকুতোভয় বলে ডাকে! তাচ্ছিল্য মাখা কণ্ঠে বললেন পুরোহিত। ভীতু, কাপুরুষ। এজন্যই তো সে আমাদের এলাকায় ঘুরছে তার ভাইও এখানেই রয়েছে। কিন্তু তার সেনাবাহিনী দিয়ে আমাদের সাহায্য না করে শুধু শুধু গযনী বাহিনীর বিরুদ্ধে উস্কানী দিচ্ছে। আবার ভয়ও দেখাচ্ছে।

এই চিঠি পড়ে আপনি ভয় পাবেন না মহারাজ!

এই চিঠিতে যা কিছু লেখা আছে তার সবই বাস্তব পণ্ডিত মশাই! বললেন রাজা রাজ্যপাল। আপনি সুলতান মাহমূদকে ভুল তথ্য দিয়েছেন গঙ্গা যমুনার মধ্যবর্তী স্থানে তার জন্যে কঠিন জাল বিছিয়ে রাখা হয়েছে। এখন দেখতে পাবেন সে আরো কোন অসাধারণ কৌশলে তার সৈন্যদেরকে কন্নৌজে পাঠায়।

দেখবেন, সে সাধারণ অভিযাত্রীদের মতো করে তার সৈন্যদের অগ্রসর হতে দেবে না। এখন তার সৈন্যরা বিশাল এলাকা নিয়ে পাশাপাশি সামনে অগ্রসর হবে। তার সৈন্যদের দুই বাহু বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে থাকবে। তার গোটা সৈন্যবাহিনী এক সাথে সামনে এগুবে না। আপনি মাহমূদের রণকৌশল সম্পর্কে জানেন না পণ্ডিত মশাই! মাহমূদ ভয়ংকর চিতাবাঘ! আপনি তার উপস্থিতি তখন টের পাবেন, যখন আপনার ঘাড় তার দাঁতে আটকে যাবে এবং

আপনার শরীর তার পাঞ্জার ভেতরে চলে যাবে। আক্রান্ত হওয়ার আগে কেউ বলতে পারে না, মাহমূদ মাটির নীচ থেকে আক্রমণ করেছেন না গাছের উপর থেকে হামলে পড়েছে।

মহারাজার কথা শেষ হওয়ার আগেই তাকে জানানো হলো, একজন দূত এসেছে। সে গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ বয়ে এনেছে।

মহারাজা তাকে তাৎক্ষণিক তার কাছে পাঠিয়ে দিতে নির্দেশ দিলেন।

দূত এসে জানাল, গযনীর সৈন্যরা মুনাজ অবরোধ করতে শুরু করেছে।

আমরা যদি ওদের পেছনে দিক থেকে আক্রমণ করি তাহলে ওদের ক্ষতি সাধন করার কি কোন সম্ভাবনা আছে? দূতের কাছে জানতে চাইলেন রাজ্যপাল।

না, মহারাজ! এমন সুযোগ নেই। গযনী বাহিনীর একটি অংশ মুনাজ অবরোধ করছে, আর একটি অংশ মুনাজ ও কন্নৌজের মধ্যবর্তী স্থানে তাঁবু না খাটিয়ে সম্পূর্ণ রণপ্রস্তুতি নিয়ে অবস্থান করছে। রাতের বেলায়ও তারা তাদের ঘোড়াগুলোকে সাথেই রাখে। আমাদের লোকেরা উপজাতীয় লোকদের বেশ ধারণ করে দেখে এসেছে মুসলিম সৈন্যরা বহুদূর পর্যন্ত টহল দিচ্ছে। আমরা সেখানকার প্রতিটি উঁচু গাছ ও উঁচু টিলার উপরে মুসলিম সৈন্যদের অবস্থান নিতে দেখেছি।

এর অর্থ হলো, আমরা যদি মুনাজের সাহায্যে সেনা পাঠাই, তাহলে গযনীবাহিনী পথিমধ্যেই তাদের আটকে দে? জিজ্ঞেস করলেন মহারাজা।

জী হ্যাঁ, মহারাজ! আমাকে বলে দেয়া হয়েছে, আমি যেন আপনাকে মুনাজের দিকে সৈন্য না পাঠাতে বলি, বললো দূত।

পণ্ডিতজী মহারাজ! নিজের কানেই তো অবস্থা শুনলেন, পুরোহিতের উদ্দেশ্যে বললেন কন্নৌজরাজ।

পুরোহিতকে একথা বলে রাজ্যপাল তার সেনাবাহিনীর শীর্ষ কর্মকর্তাদের ডেকে পাঠালেন। সেনা কর্মকর্তারা এলে তিনি গযনী বাহিনীর অবস্থা সম্পর্কে তাদের অবহিত করে বললেন–তোমরা যদি কন্নৌজকে বাচাতে চাও, তাহলে মুনাজের রাজপুতেরা কি করে সে দিকে লক্ষ রাখতে হবে। দেখতে হবে, তারা লড়াই করে না হাতিয়ার ফেলে আত্মসমর্ণ করে। তারা যদি শক্তভাবে

অবরোধের মোকাবেলা করে এবং দুর্গ থেকে বাইরে এসে মোকাবেলায় প্রবৃত্ত হয় তাহলে তাদের সাহায্য করবে। আর যদি তা না হয় তবে তোমাদেরকে কন্নৌজ বাচানোর চেষ্টা করতে হবে।'

১০১৮ সালের নভেম্বরে সুলতান মাহমূদ মুনাজ দুর্গ অবরোধ করেন। তাকে আগেই গোয়েন্দারা খবর দিয়েছিল মুনাজের রাজপুতেরা তাদের স্বজাতির মর্যাদা রক্ষায় জীবন দিয়ে দিতে প্রস্তুত। এদেরকে যুদ্ধে কাবু করা সহজ ব্যাপার নয়। সারা ভারতে এরা লড়াকু জাতি হিসেবে খ্যাত।

সুলতান যে আবরোধ বেষ্টনী গড়ে তুলেন, তা ছিল তিন দিক থেকে বেষ্টিত। এক দিকে ছিল প্রবাহমান যমুনা নদী। সুলতানকে জানানো হয়েছিল, অবরোধকালে কন্নৌজের সৈন্যরা আক্রমণ করতে পারে। কন্নৌজবাহিনীর আক্রমণ আশংকায় তিনি সৈন্যদের একটি অংশকে মুনাজ ও কন্নৌজের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থান নেয়ার নির্দেশ দেন।

সুলতান যখন তিন দিকের অবরোধ কাজ সম্পন্ন করেন, তখন সালেহ সেই পুরোহিতের ভ্রান্তিকর তথ্য নিয়ে সেখানে হাজির হলো।

সালেহ সেখানে পৌঁছারপর গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান সুলতানকে জানাল, গোয়েন্দা সালেহ এই খবর নিয়ে এসেছে। সালেহ খবর পেয়ে সুলতান মাহমূদ মথুরায় খবর পাঠালেন, ওখানে যে সৈন্যদের রেখে আসা হয়েছে অর্ধেক সেখানে রেখে বাকী সৈন্য অতি দ্রুত মুনাজে পাঠিয়ে দেবে। সেই সাথে সেখানে রেখে আসা সকল জঙ্গী হাতিকেও এরা সাথে নিয়ে আসবে। সে সময় সুলতানের হাতে প্রায় সাড়ে তিনশ জঙ্গি হাতি ছিল। মথুরার রিজার্ভ সৈন্যরা মুনাজ পৌঁছালে তাদেরকে তিনি মুনাজ ও কন্নৌজের মধ্যবর্তী এলাকায় পাঠিয়ে দিলেন।

অধিকাংশ ইতিহাসগ্রন্থে সুলতান মাহমূদের সতেরো বারের ভারত অভিযানের মধ্যে মুনাজের উল্লেখ নেই। কোন কোন ইতিহাস গ্রন্থে সামান্য ইঙ্গিত পাওয়া গেলেও মুনাজে যে তার এযাবতকালের ভারত অভিযানের মধ্যে সবচেয়ে কঠিন লড়াই লড়তে হয়েছিল এর বিস্তারিত আলোচনা অনুপস্থিত। মুনাজে ছোট্ট একটি দুর্গজয়ে তার যে শক্তি ক্ষয় করতে হয়েছিল মথুরা মহাবন এবং বুলন্দ শহরের মতো বড় বড় তিনটি লড়াইয়েও এতো শক্তিক্ষয় হয়নি।

মুনাজের রাজপুতদের অবস্থা এমন ছিল যে, সৈন্য ও সাধারণ মানুষদের মধ্যে পার্থক্য করাই মুশকিল হচ্ছিলো। ছোট ছোট ছেলেরাও সৈন্যদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধে নেমেছিল।

ঐতিহাসিক উলবী লিখেছেন, যুদ্ধকালে মুনাজের রাজপুতদের অবস্থা ছিল দড়ি ছেড়া উটের মতো এবং অজেয় দৈত্যের মতো ভয়ংকর।

মুনাজ যুদ্ধের কমান্ড ছিল সুলতানের নিজের হাতে। তিনি সরাসরি রণাঙ্গনে কমাণ্ড দিচ্ছিলেন। তিনি যে দিক দিয়েই তার লোকদেরকে দুর্গ ফটক ভাঙ্গা কিংবা দুর্গ প্রাচীরে ফাটল ধরানোর জন্য পাঠাতেন, দুর্গ প্রাচীরের উপর থেকে তাদের উপর বৃষ্টিরমতো তীর ও বর্শা নিক্ষিপ্ত হতো। গযনীবাহিনীর তীরন্দাজরা অগ্রসর হয়ে দুর্গপ্রাচীরের উপর দণ্ডায়মান তীরন্দাজ ও বর্শাধারীদের উপর তীর বৃষ্টি বর্ষণ শুরু করল গযনীর তীরন্দাজদের তীর বিদ্ধ হয়ে যে রাজপুতেরা দুর্গপ্রাচীর থেকে গড়িয়ে পড়তো সাথে সাথে শূন্যস্থান অন্য রাজপুতেরা পূর্ণ করে ফেলতো। দুর্গ প্রাচীর থেকে মুসলমানদের উদ্দেশ্যে হুমকি ভেসে আসছিল–

'মাহমূদ! বাঁচতে চাইলে ফিরে যাও।'

'হে গযনীর ডাকাতেরা! তোমরা কবরস্থানে এসে গেছো।

এসব হুমকি ধমকির পাশাপাশি নানা অশ্রাব্য গালি গালাজও ভেসে আসছিল দুর্গপ্রাচীর থেকে।

দিনের প্রায় অর্ধেক চলে গেল। অবস্থা দৃষ্টে সুলতান বললেন–

এই দুর্গ সহজে করায়ত্ত্ব করা যাবে না। এজন্য নতুন করে চিন্তা করতে হবে।

অবরোধের প্রথম দিন শেষ হলো। এ দিনে মুসলমানরা ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হলো। মুনাজ দুর্গের ভেতরের পরিস্থিতি এমন ছিল যে, সেখানকার অধিবাসী নারী পুরুষ আবাল বনিতা এমনকি ছোট ছোট শিশুরা পর্যন্ত তীর কামান বর্শা তরবারী হাতে নিয়ে দুর্গপ্রাচীরের উপরে এবং দুর্গের সর্বত্র মহড়া দিচ্ছিল। তারা শ্লোগান দিচ্ছিল, আমাদেরকে দুর্গের বাইরে গিয়ে গযনী বাহিনীর উপর আক্রমণের অনুমতি দেয়া হোক। মুনাজের রাজা রায়চন্দ্র ছিলেন দূরদর্শী ও জাত লড়াকু। তিনি আনাড়ী ছেলে মেয়েদেরকে দুর্গের বাইরে

এমনকি দুর্গপ্রাচীরে যাওয়ার অনুমতি দিচ্ছিলেন না। তিনি আবেগী লোকদের উদ্দেশ্যে বলছিলেন, অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধি ছাড়া শুধু আবেগের জোরে যুদ্ধ করা যায় না। অবশ্য তোমরা মুনাজের সম্মান। কিন্তু তোমরা জানো না গযনীর সৈন্যরা চোর ডাকাতের দল নয়। ওরা এমন ভয়ংকর যোদ্ধা যাদের সামনে পাহাড়ের মতো শক্ত প্রাচীর কাঁপতে থাকে। তোমাদের প্রশিক্ষিত সৈন্যরা দুর্গপ্রাচীরে রয়েছে। কোন কারণে শত্রু সৈন্যরা যদি দুর্গের ভেতরে ঢুকে পড়ে তখন মুনাজের ইজ্জত রক্ষার দায়িত্ব হবে তোমাদের উপর। মথুরা ও মহাবনের কাপুরুষরা যে ভাবে গযনী সৈন্যদের হাতে দুর্গ তুলে দিয়েছে আমরা সে ভাবে তাদের হাতে দুর্গ তুলে দেবো না।

রাজা রায়চন্দ্রের কথা শোনে সমবেত জনতা শ্লোগান দিতে লাগলো, আমাদেরকে দুর্গের বাইরে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হোক, আমরা চরমভাবে প্রতিশোধ নেবো।

নগরবাসীর আবেগ ও উচ্ছাস দেখে রাজা রায়চন্দ্র সমবেত লোকদের থেকে কিছু সংখ্যক লোককে বাছাই করে তার কাছে থাকতে বললেন এবং প্রতিশ্রুতি দিলেন, তোমাদেরকে প্রয়োজনের সময় দুর্গের বাইরে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হবে। রাজার আশ্বাসে জনতার ক্ষোভ কিছুটা প্রশমিত হলো।

এদিকে রাজা রায়চন্দ্রের রাজপ্রাসাদে নারীরাও অস্ত্র সজ্জিত হয়ে গেলো। তারা শহরের অন্যান্য নারীদেরকে লড়াইয়ের জন্য সংগঠিত করতে শুরু করল।

রাজপ্রাসাদের মধ্যে মাত্র একজন ছাড়া আর সবার মধ্যেই বিরাজ করছিল যুদ্ধ উন্মাদনা। কিন্তু রাজা রায়চন্দ্রের উর্বশী কন্যা রাধার মধ্যে এই যুদ্ধের কোনই প্রতিক্রিয়া ছিল না। তার অবস্থা অনেকটা এমন ছিল, এই মাটি মানুষের হানাহানির সঙ্গে যেন তার কোনই সম্পর্ক নেই।

আগেই বলা হয়েছে, রাজা রায়চন্দ্রের বোন শিলা ও কন্যা রাধা রাজা রাজ্যপালের ছেলে লক্ষণপালের সাথে সুলতান মাহমূদকে হত্যা করার জন্য অভিযানে বের হয়েছিল। শিলা ও রাধার রূপ সৌন্দর্য ছিল কিংবদন্তিতুল্য। তারা ভেবেছিল তাদের রূপসৌন্দর্যের যাদুকরী আকর্ষণে মুগ্ধ করে তারা সুলতানকে হত্যা করতে সক্ষম হবে।

কিন্তু পথিমধ্যে এক কুমির শিলাকে শিকারে পরিণত করল। যে দৃশ্য দেখে রাধা জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল। অতঃপর লক্ষণ ও রাধা উভয়কেই গযনীর টহলরত গোন্দোদের হাতে গ্রেফতার হয়ে মথুরায় সুলতান মাহমূদের কাছে পেশ করা হয়।

সুলতান তাদেরকে কোন প্রকার শাস্তি না দিয়ে সসম্মানে নিজ নিজ বাবার কাছে পাঠিয়ে দেন। তখন থেকেই রাধা আমূল বদলে যায়।

ছোট বেলা থেকে রাধা মুলমানদের সম্পর্কে যা শুনে এসেছিল, গযনীর সৈন্যদের হাতে গ্রেফতার হওয়ার পর থেকে বাড়ীতে ফিরে আসা পর্যন্ত তাদের আচার-আচরণ দেখে রাধার এতো দিনের ধারণা ধারণা বিশ্বাস মিথ্যা প্রমাণিত হলো।

সেই শৈশব থেকেই হিংস্র জন্তুর মতোই রাধার মনে ছিল মুসলমানদের প্রতি ঘৃণা। সে মুসলমানদের হাতে গ্রেফতারী এড়াতে বিষপানে আত্মহত্যা করতে চেয়েছিল। কারণ সে জানতো, তার মতো সুন্দরী তরুণীকে মুসলিম সৈন্যরা শিকারী হিংস্র জন্তুর মতোই ক্ষতবিক্ষত করে ফেলবে। জানতো মুসলিম সৈন্যরা খুবই হিংস্র এবং নারীখেকো।

কিন্তু গ্রেফতার হওয়ার পর অবাক বিস্ময়ে রাধা প্রত্যক্ষ করলো, তাকে ও লক্ষণপালকে গ্রেফতারকারী দলনেতা নিজ কন্যা ও ছেলের মতোই মর্যাদা দিয়েছে। তার চেয়েও বিস্ময়ের ব্যাপার, চরম শত্রু জেনেও সুলতান মাহমূদ তাদের প্রতি সামান্যতম উষ্মা পর্যন্ত প্রকাশ করেননি বরং তাদের জাতীয়তাবোধের ব্যাপারে প্রশংসা করেছেন এবং কোন প্রকার শাস্তি না দিয়ে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত অপরাধীদেরকে তার সেনাসদস্যকে দিয়ে সসম্মানে বাড়ী পর্যন্ত পৌঁছার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।

রাধার বিশ্বাস ছিল মুসলমানরা বাস্তবিকই অসভ্য, তাদের কোন নীতি ধর্ম নেই। রাধার কাছে পৌত্তলিকতার বাইরে কোন ধর্ম মতের অস্তিত্ব ছিল না। আত্মমর্যাদাবোধ ও সম্ভ্রম রাজপুতদের কাছে ছিল জীবনের চেয়ে দামী। কিন্তু ধর্মের শত্রুদের ধ্বংস করার জন্যে জাত্যাভিমানী এই রাজপুত কন্যা নিজের সম্ভ্রমকেও হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহারের ইচ্ছাপোষণ করেছিল। কিন্তু দীর্ঘ সময় সে মুসলমানদের হাতে গ্রেফতার থাকার পরও তার এই অপরূপ রূপ সৌন্দর্য

নিয়ে কেউ টুশব্দটি পর্যন্ত করেনি। অথচ গোটা অঞ্চল জুড়ে রাধার রূপের প্রশংসা করে না এমন মানুষ একজনও ছিল না।

লক্ষণ গ্রেফতার হওয়ার পর দলনেতাকে তাদের সাথে রক্ষিত সোনাদানা দিতে চাইলো এবং তাদের মুক্তির বিনিময়ে ঘোড়া বোঝাই করে ধন-রত্ন দেয়ার প্রস্তাব করলো। কিন্তু মুসলমান সৈন্যরা বিপুল এই ধনভাণ্ডারের প্রতি বিন্দুমাত্র আকর্ষণবোধ করলো না। বরং তারা লক্ষণের প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করে কর্তব্য পালনে অবিচল রইলো।

রাধাকে যখন সুলতান মাহমূদের সামনে হাজির করা হলো, তখন সুলতানের চেহারার দিকে তাকিয়ে রাধার মনে প্রচণ্ড ঘৃণা জন্মে ছিল। সে আশঙ্কা করছিল নিশ্চয়ই সুলতান কোন ভয়ঙ্কর প্রতিশোধ নেবেন। কিন্তু রাধার সব আশঙ্কা ও কল্পনার বিপরীতে সুলতান তখন বললেন–

"আমরা এই জাত্যাভিমানী শত্রুকন্যাকে সম্মান করি। আমরা তাদের সংকল্পকে মোবারকবাদ জানাই।"

সুলতান মাহমূদ যখন তার সৈন্যদের নিয়ে মুনাজ দুর্গ অবরোধ করলেন, তখন রাধার কানে সুলতানের সেই কথা ধ্বনিত হতে লাগল–

"আমাকে হত্যা করার চেষ্টা তোমাদের অবশ্যই থাকা উচিত। এই চেষ্টার সফলতা ব্যর্থতা তোমাদের কৃষ্ণদেবী বা বাসুদেবের হাতে নয়, সফলতার চাবিকাঠি আমাদের আল্লাহ্র হাতে। তিনি হলেন সেই প্রভু, যার পয়গাম নিয়ে আমরা ভারতে এসেছি।"

এরপর সুলতান তার সেনাপতিকে নির্দেশ দিলেন–

এদেরকে সসম্মানে ওদের শহরের কাছে রেখে আসার ব্যবস্থা করো এবং তাদের ঘোড়া, সোনাদানা সবই দিয়ে দাও।"

সাথে সাথে সুলতানের নির্দেশ কার্যকর করা হলো। রাধা ও লক্ষণপালকে শাহী অতিথির মতোই সেনাপ্রহরায় তাদের শহরের কাছে রেখে আসা হলো।

* * *

সুলতান মাহমূদকে হত্যার মিশনে যাওয়ার আগে রাধা যে আবেগ ও উচ্ছ্বাস নিয়ে গিয়েছিল কিন্তু ফিরে এসে যখন সে তার বাবাকে মিশনের ব্যর্থতা সম্পর্কে অবহিত করছিলো তখনকার অভিব্যক্তি ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। রাধা তার বাবাকে ভিন্ন এক সুরে বললো, আমরা যখন মুসলিম সৈন্যদের হাতে গ্রেফতার হয়ে সুলতান মাহমূদের সামনে নীত হলাম, তখন সুলতান মাহমূদ আমাকে নিজ কন্যার মতোই সম্মান ও মর্যাদা দিয়ে কথা বললেন। রাধা তার বাবাকে তার গ্রেফতারী এবং লক্ষণ ও তার সাথে সুলতানের কথোপকথনের পুরো ইতিবৃত্ত জানালো। কিন্তু রাধার বাবা রায়চন্দ্র রাধার মানসিক পরিবর্তনের ব্যাপারটি বুঝতে পারেননি। ফলে তিনি রাধাকে বললেন–

আমরা আমাদের এই বেইজ্জতির কঠিন প্রতিশোধ নেবো।'

রাধা অন্য দশটি কুমারী মেয়ের মতো ছিল না। সে যেমন ছিল সুন্দরী তেমনই বুদ্ধিমতি। কিন্তু মিশনের ব্যর্থতা ও গযনী বাহিনী সম্পর্কে তার পরিবর্তিত বাস্তব ধারনার পর তার বাবা যখন মুসলমানের বিরুদ্ধে কঠিন লড়াইয়ের হুংকার দিলেন, তা শুনে রাধার মাথায় যেন আসমান ভেঙ্গে পড়ল।

স্বভাবগতভাবে রাধা ছিল খুবই আত্মপ্রত্যয়ী এবং সাহসী। কিন্তু পরিবর্তিত পরিস্থিতি তার সবকিছু ওলট পালট করে দিল। দুনিয়ার সব কিছু থেকে নিজেকে সরিয়ে ফেলল রাধা। একাকী নীরব নি:শব্দে দিন কাটাতে লাগল সে।

রাজ দরবার রাজমহল শহরের অলিগলি ভেতর বাহির সবখানে তখন যুদ্ধের সাজ-সাজ রব, গযনী বাহিনীকে প্রতিরোধের হুংকার, রণপ্রস্তুতি। যে কোন দিন গযনীর সৈন্যরা দুর্গ প্রাচীর ভেদ করতে পারে। রাজা রায়চন্দ্র এখন লড়াই ছাড়া আর কোন বিষয়ে কোন কথাই বলেন না।

মন্দিরগুলোতে মুসলমানদের বিরুদ্ধে লোকজনকে ক্ষেপিয়ে তোলা হচ্ছিল এবং রক্তাক্ত লড়াই করে মুসলমানদের পরাজিত করার জন্যে জনগণকে প্ররোচনা দেয়া হচ্ছিল। এর ফলে মুনাজের নারী মহলের মধ্যে সৃষ্টি হয় যুদ্ধ উন্মাদনা। তারা পুরুষের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াইয়ের প্রস্তুতি নিতে শুরু করে।

রাজমহলে রায়চন্দ্রের রক্ষিতারাও পর্যন্ত লড়াইয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছে। ব্যতিক্রম শুধু রাধা। সে সব কিছু থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে রাজমহলে

একাকী শুয়ে থাকতো। নয়তো দুর্গ প্রাচীরের উপরে ওঠে গযনী সৈন্যদের আগমন পথের দিকে তাকিয়ে থাকতো।

এক দিন সন্ধ্যার আগে দুর্গ প্রাচীরে দাঁড়িয়ে রয়েছে রাধা। সম্পূর্ণ উদাস মন। দূরের আকাশের লালিমায় স্থির তার দৃষ্টি। এমন সময় রাধার কণ্ঠে উচ্চারিত হলো।

"সে এদিক দিয়ে আসবে! জানি না কবে আসবে সে।"

"কে আসবে?" তার পাশের কেউ জিজ্ঞেস করল।

কারো দিকে না তাকিয়ে উদাস মনেই সে জবাব দিল- "মুসলমান; গযনীর সৈন্যরা!"

একথা বলেই হঠাৎ কেদে উঠলো রাধা। আশ-পাশে তাকিয়ে নীরব হয়ে গেল তার কণ্ঠ। রাধা পাশে তাকিয়ে দেখল, এক ঋষী তার পাশেই দাঁড়ানো। এবং সে রাধার কাছে জানতে চাচ্ছিল কে আসবে? অথচ রাধা এমনই উদাস-আনমনা ছিল যে, এতো কোলাহল ও হট্টগোলের মধ্যেও সে নিজেকে একাকী ভেবে ছিল।

এই ঋষি সম্পর্কে রাধা জানতো। অনেক প্রভাব প্রতিপত্তি ও মর্যাদাবান লোক এই ঋষি। মুনাজের প্রধান পুরোহিতও তাকে দেখলে দু'হাত জড়ো করে কুর্ণিশ করে। ঋষি ধর্মীয় গুরু হওয়ার পাশাপাশি খ্যতিমান একজন চিকিৎসকও। মানুষকে ধর্মের দীক্ষা দেয়ার পাশাপাশি তিনি মানসিক রোগী ও ভূত-প্রেতের আছর করা লোকদের চিকিৎসা করেন। মানুষকে ভূত-প্রেতের অত্যাচার প্রভাব থেকে হেফাযত করেন। এমন একজন মহামনীষীকে কাছে দেখেও যে রাধার উল্লাসিত হওয়ার কথা ছিল সেই রাধার কাছে ঋষির উপস্থিতি অসহ্য মনে হলো। মনে মনে ভীষণ ক্ষুব্ধ হলো রাধা।

ঃ রাজকুমারী কি মুসলমানদের আগমনের অপেক্ষা করছেন?"

বিনীত কণ্ঠে রাধাকে জিজ্ঞেস করলেন ঋষি।

আমি যার জন্যেই অপেক্ষা করি? আপনি আমার ব্যক্তিগত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করছেন কেন?" ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললো রাধা।

হস্তক্ষেপ করিনি রাজকুমারী! এসেছি আপনার দুঃখে শরীক হতে। আমি জেনেছি, আমাদের রাজকুমারীর উপর ভৌতিক আছর পড়েছে যার চিকিৎসা আমাকে করতে হবে। মহারাজ আমাকে বলেছেন, আপনি মথুরা থেকে ফিরে আসার পর থেকেই মারাত্মকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। অবশ্য হওয়ারই তো কথা।

আমি জানি রাজকুমারী! মুসলমানরা মানুষ নয়, হায়েনার মতো হিংস্র। এরা মানুষ খাওয়ার জন্যই এদেশে আসে। আপনি না বললেও আমি জানি, ওরা আপনার সঙ্গে কি আচরণ করেছে। এরা সোনা-দানা হীরা জহরত আর নারীর জন্যে পাগল। এই নারী আর ধনরত্নের জন্যেই এরা বারবার হিন্দুস্তানে আসে।

মিথ্যা কথা! সবই মিথ্যা। উত্তেজিত কণ্ঠে বললো রাধা।

আপনি যা বলছেন, তারা আমার সাথে এমন কোন আচরণ করেনি। তারা নারী লোভী নয়। গযনী সুলতানের দরবারে আমি একজনও নারী দেখিনি। আমার বাবার মতো রাজা মহারাজাদের দরবারেই নারী বেশী থাকে। বাবার মতো রাজাদের পেছনে দাঁড়িয়ে সুন্দরী তরুণীরা পাখা দোলায়। তাদের সেবা করে তরুণীরা। সুন্দরী তরুনীরাই তাদের ঘুম পাড়ায়, ঘুম থেকে জাগায়। মিথ্যা কথা। মুসলমানরা হিংস্র জন্তু নয় প্রকৃতই মানুষ। বরং ভালো মানুষ। তারা আমাদের দেয়া সোনাদানা গ্রহণ করেনি।

ঋষি জ্ঞানী লোক, পোড় খাওয়া অভিজ্ঞ। সে রাধার কথার বিরোধিতা না করে বরং তার সাথে সহানুভূতি ও স্নেহমাখা কথা বলতে শুরু করলেন। মায়া ও মমতার পরশ দিয়ে ঋষি রাধার ক্ষোভকে কিছুটা প্রশমিত করে ফেললেন। অবস্থা এমন হলো যে, কয়েক দিনের নীরব নিস্তব্ধ হয়ে ওঠা রাধা কথা বলতে বলতে ঋষির সাথে হাঁটতে শুরু করল।

এরপর থেকে প্রতিদিন ঋষি রাধার কাছে আসতে শুরু করলেন। দীর্ঘ সময় রাধা ঋষীর সাথেই ব্যয় করে। তার সাথে নানা বিষয়ে কথা বলে। বিভিন্ন প্রসঙ্গে কথা বলে ঋষি বুঝতে পারলেন, রাধা ঠিকই মুসলমান আছরে আক্রান্ত। তা ছাড়া রাধার মধ্যে একটা প্রচণ্ড ভীতিও কাজ করছে।

রাধা ঋষিকে জানাল, প্রতি রাতেই সে সেই কুমিরকে স্বপ্নে দেখে, কুমিরের মুখে শিলার মরদেহ ঝুলছে এবং কুমিরের মুখ থেকে তাজা রক্ত ঝরছে। তখন আতংকিত হয়ে রাধা চিৎকার দিয়ে ঘুম থেকে জেগে ওঠে এবং তার সারা শরীর ঘামে ভিজে যায়।

রাধার এই আতংক দূর করার চিকিৎসা ছিল তার সাথে কথা বলে মনের আতংক দূর করে ফেলা। ঋষী নানা বিষয়ে রাধার সাথে কথা বলে তার মন থেকে কুমিরের ভয় এবং মুসলমান প্রীতি দূর করার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু রাধার শারীরিক অবস্থা ক্রমান্বয়ে আরো খারাপ হতে লাগল। রাজা রায়চন্দ্র যুদ্ধের ব্যস্ততার জন্যে রাধার প্রতি মনোযোগ দিতে পারছিলেন না। তিনি রাধার সুচিকিৎসার জন্যে ঋষীকে নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন।

ঋষী ছাড়াও রাধার চিকিৎসার জন্যে আরো খ্যাতিমান অভিজ্ঞ বৈদ্য আনা হলো। কিন্তু রাধার শারীরিক অবস্থার আরো অবণতি ঘটল। এক পর্যায়ে রাধা ওষুধ পথ্য খাওয়া ছেড়ে দিল। ঋষি ছাড়া আর কাউকেই সে কাছে ঘেষতে দিতো না। ঋষিই হয়ে উঠলেন তার বিশ্বস্ত সঙ্গী। একদিন রাধা ঋষিকে বললো–

ঋষীজী! মুসলমানদের সুলতান আমাকে বলেছিল, জয় পরাজয় তোমাদের কৃষ্ণদেবী ও বাসুদেবের হাতে নয়, জয় পরাজয় আমাদের আল্লাহর হাতে.....।

এখন তো আমি তার প্রতিটি কথারই বাস্তব প্রতিফলন দেখছি। আচ্ছা, ওই ঝিলের জল কুমিরটি কি মুসলমানদের আল্লাহ? যে শিলাকে খেয়ে ফেলেছে?

আমাদের দুই সৈনিককে কে হত্যা করলো? আমরাই বা কেন গ্রেফতার হলাম?

হরিকৃষ্ণের জন্ম ভূমির ধ্বংসস্তূপ আমি দেখে এসেছি। সেখানকার মূর্তিগুলোর ভাঙা টুকরো আমি দেখেছি। এরাই না আমাদের দেবদেবী, আমাদের ভগবান! এদের যদি কোন শক্তি থাকতো তাহলে নিশ্চয়ই মুসলমানরা তাদের আক্রমণ করার আগেই ধ্বংস হয়ে যেতো।

রাধার ইসলাম ধর্মের সততার প্রতি আকর্ষণ এবং পৌত্তলিকতার প্রতি অশ্রদ্ধা দেখে ঋষি নানা যুক্তি ও ঘটনা বলে রাধাকে পৌত্তলিকতার বিশুদ্ধতা

বোঝাতে লাগলেন। তিনি রাধাকে এমন সব ঘটনাবলী শোনালেন, যেগুলো কোন সচেতন ও চিন্তাশীল মানুষের কাছে যৌক্তিক ও সত্য বলে মনে হয় না। পৌত্তলিকতার বিপরীতে ঋষি ইসলাম ধর্মকে অসত্য এবং মিথ্যা প্রতিপন্ন করার জন্য নানান অযৌক্তিক কথা কাহিনী বর্ণনা করতে শুরু করলেন। একপর্যায়ে ঋষি বলতে লাগলেন, মুসলমানরা মিথ্যুক, লুটেরা প্রতারক, ধোঁকাবাজ, হিংস্র।'

আপনি তাদের যাই বলুন, আমি নিজ চোখে যা দেখেছি, তাকে তো আর মিথ্যা বলতে পারি না।' ঋষির কথার জবাবে বললো রাধা। 'আমার সাথে লক্ষণপাল ছিল। একপর্যায়ে সেও বলেছিল, রাধা! আমি মুসলমানদের অব্যাহত বিজয়ের রহস্য বুঝে ফেলেছি। সে বলেছিল, আমি মুসলমানদের মধ্যে নারী ও মদের ব্যবহার দেখিনি। এটাই তাদের বিজয়ের অন্যতম কারণ।

রাধা ঋষিকে জানালো, যে দিন মুসলমানরা আমাদের বিদায় করে দেয়, সে দিন খুব ভোরে আমাকে ও লক্ষণকে জাগিয়ে দিয়ে ছিল। আমরা ঘুম থেকে জেগে দেখি তখনো সূর্য উঠতে অনেক দেরী। চারদিকে তখনো অন্ধকার। ঠিক সেই সময় কোত্থেকে জানি সুন্দর ও মনোমুগ্ধকর আওয়াজ ভেসে আসছিল। আমরা ভেবেছি, এটা হয়তো তাদের ভাষার কোন সঙ্গীত হবে। আওয়াজটা আমার কাছে খুবই চমৎকার লাগছিল।

আমি আমার পাহারাদারকে জিজ্ঞেস করলাম–

কেউ কি গযনীর ভাষায় গান করছে?

পাহারাদার আমাকে জানাল, এটি গানের আওয়াজ নয়। এটি আযানের আওয়াজ। এই শব্দগুলো আমাদের আল্লাহর শব্দ।

আমি আযানের কোন শব্দই বুঝতে পারিনি কিন্তু আযানের ধ্বনী যেন আমাকে যাদুর মতো মুগ্ধ করল। একটু পরে আমি দেখলাম, মথুরায় অবস্থানকারী সকল সৈন্য একটি খোলা জায়গায় সমবেত হলো এবং সারি বেধে দাঁড়াল। একলোক সবার সামনে দাঁড়িয়ে কখনো ঝুকছে, কখনো দাঁড়াচ্ছে আবার কখনো মাটিতে মাথা আনত করে রাখছে। আর বাকীরা তাকে অনুসরণ করছে। আমি পাহারাদারকে জিজ্ঞেস করলাম, সবাই ওখানে এমন করছে কেন? প্রহরী জানাল, এটাই আমাদের ইবাদত।

ঋষিজী! মুসলমানদের এই ইবাদত আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে। পাহারাদারকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, তোমরা কার ইবাদত কর? তোমাদের সামনে তো কোন মূর্তি নেই?.....

পাহারাদার বললো, আমরা যার ইবাদত করি, তিনি থাকেন আমাদের হৃদয়ে। তিনি সব জায়গাই বিরাজ করেন। তিনি আমাদের রব। তিনিই আমাদের জয়ী করেন। আমরা যখন তার ইবাদতে ত্রুটি করবো, তার নির্দেশ পালন করা থেকে বিরত থাকব তখন সব ক্ষেত্রেই আমাদের পরাজয় ঘটতে থাকবে।'

ঋষি রাধার কথা শুনে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। রাধা অনবরত কথা বলেই যাচ্ছিল। রাধা বললো,

তোমাদের সুলতান হয়তো এই ইবাদত করেন না? কারণ, তিনি তো সুলতান।

পাহারাদার জানাল, সুলতানও এই ইবাদতে রয়েছেন। তিনি হয়তো সৈনিকদের মধ্যে কোথাও রয়েছেন। তিনিও সাধারণ সৈনিকদের মতোই মাথা নত করে ঝুকে সিজদা দেন। ইবাদতের সময় তিনি আর সুলতান থাকেন না।

ঋষিজী! আমরা ছোট বেলা থেকেই দেখছি, আমাদের পিতা মহারাজ যদি কখনো মন্দিরে যান তখন সবাইকে মন্দির থেকে বের করে দেয়া হয়।

ঋষিজী! বলুন তো? আসলে সত্য কোনটি?....আমাদের কি কোন রব নেই?

রাধার প্রশ্নের জবাবে ঋষি বলতে লাগলেন, পৌত্তলিক ধর্মে কাকে রব মনে করা হয়। কিন্তু রাধা ঋষির কথায় অনাস্থা প্রকাশ করে বললো, তাহলে কুমিরই কি আমাদের রব? না, কুমির আমাকে প্রতি রাতেই ভয় দেখায়, সে রব হতে পারে না। রব আমার অন্তরে বিরাজ করছেন।

* * *

মহারাজ! রাজকুমারী পাগল হয়ে গেছে। রাধার কাছ থেকে উঠে গিয়ে রাজা রায়চন্দ্রকে জানালেন ঋষি। মনে হয় মথুরায় মুসলমানরা তাকে এমন কিছু পান করিয়েছে, যার প্রভাব তার শরীর থেকে এখনও যায়নি। এই রোগের চিকিৎসা আমার সাধ্যের বাইরে মহারাজ! রাজকুমারী তার ধর্মের প্রতি বিতৃষ্ণ হয়ে গেছে। এখন সে নানান অহেতুক কথা বলতেই থাকে। অনেক সময় কথা বলতে বলতে নীরব হয়ে যায়। অনেক সময় বিকট চিৎকার দিয়ে তার চেহারা কাপড় বা হাতে ঢেকে ফেলে। অধিকাংশ সময়ই বলতে থাকে, 'আমার রব আমার হৃদয়ে এসে গেছে'। এটা সেই মুসলমানদের আছর মহারাজ!

ঠিক আছে। তাকে আর আপনার চিকিৎসা করার দরকার নেই। তাকে তার অবস্থাতেই থাকতে দিন।' বললেন রাজা রায়চন্দ্র। আমি সুলতান মাহমূদের মাথা কেটে এনে তার সামনে ফেলে দেবো। তখন ঠিকই দেখবেন তার মন থেকে মুসলমানদের রব চলে যাবে। এখন এসব নিয়ে ভাববার অবসর আমার নেই ঋষিজী! গযনী বাহিনী অনেক কাছে চলে এসেছে।" বলে রাজা রায়চন্দ্র রাজপ্রাসাদ থেকে বেরিয়ে গেলেন।

রাজার সাথে যখন ঋষি রাধার ধর্ম বিদ্বেষী হওয়ার কথা বলেছিলেন, তখন সেখানে উপস্থিত ছিল আরো দু'জন বৈদ্য ও দু'জন সেবিকা। রাধার ধর্ম বিদ্বেষের কথা শুনে তারা কানে আঙ্গুল দিলো।

ঠিক এ সময় রাধা হঠাৎ করে বিছানা থেকে উঠে বাইরের দিকে ছুটতে লাগল। রাধাকে দৌড়ে বেশী দূর যেতে দেয়া হয়নি। তাকে ধরে ফেলা হলো। তখন রাজারায় চন্দ্র রাজ প্রাসাদ ছেড়ে চলে গেছেন।

রাধার মা'কে রাধার বাইরে চলে যাওয়ার কথা জানানো হলো। এই খবর শুনে রাধার মা খুবই উদ্বিগ্ন হলেন। কারণ, তখন মুসলমানরা অবরোধ করে ফেলেছে। এমতাবস্থায় রাধা বেরিয়ে গেল নির্ঘাত সে নিহত হবে। তিনি মেয়ের এই অবস্থা দেখে বৈদ্যকে বললেন,

আপনারা ওকে এমন কোন ওষুধ দিন, যা সেবনে সে অচেতন হয়ে থাকবে। হুঁশ হলে আবার সেই ওষুধ খাইয়ে তাকে অচেতন করে রাখা হবে। রানীর নির্দেশে বৈদ্যরা রাধাকে একটি ওষুধ খাইয়ে দিল। কিছুক্ষণের মধ্যে রাধা অচেতন হয়ে গেল। তারপর কক্ষের দরজা বাইরে থেকে আটকে দিয়ে সবাই রাধার কক্ষ থেকে বেরিয়ে এলো।

* * *

অবরোধের প্রথম দিন অতিবাহিত হলো। দিন রাতের মধ্যে এক মুহূর্তও বিশ্রাম করেননি সুলতান মাহমূদ। এক সময় তিনি দুর্গের পিছনে নদীর পাশে চলে গেলেন। নদী দুর্গের প্রাচীর স্পর্শ করে প্রবাহিত হচ্ছিল। সেখান থেকে ফিরে এসে সুলতান তার কমান্ডারদের বললেন, প্রতিটি পদাতিক ইউনিট থেকে দুই বা চারজন করে দক্ষ ও সাহসী সৈনিককে বাছাই করো এবং তাদের সমন্বয়ে ভিন্ন একটি দল গঠন করে তাদেরকে রিজার্ভ সৈন্যদের সাথে অবস্থান করতে বলো।

অবরোধের দ্বিতীয় দিন গযনীর সৈন্যরা আবারো দুর্গের প্রধান ফটক ভাঙার জন্যে আক্রমণ চালালো। কিন্তু দুর্গ প্রাচীরের উপর থেকে রাজপুতেরা বর্শা বল্লম ও তীরের তুফান ছুটিয়ে দিলো। বিপুল ক্ষয় ক্ষতি হলো মুসলিম বাহিনীর। কিন্তু দুর্গ ফটক ভাঙার কোনই অগ্রগতি করা সম্ভব হলো না। এরপরও ফটক ভাঙার চেষ্টায় বিরত দিলেন না সুলতান। এভাবে টানা সাত দিন চললো ফটক ভাঙার চেষ্টা আর রক্তাক্ত আক্রমণ প্রতি -আক্রমণ।

সপ্তম দিন শেষে সন্ধ্যার পর সকল পদাতিক ইউনিট থেকে বাছাইকরা রিজার্ভ সৈন্যদেরকে তার অনুগামী হতে নির্দেশ দিলেন সুলতান। এই বাহিনীতে সৈন্য ছিল তিনশ'য়ের কিছু বেশী। সুলতান এই যোদ্ধাদের উদ্দেশ্যে বললেন—

গযনী ও ইসলামের মর্যাদার প্রশ্নে তোমাদেরকে আজ কঠিন ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। ইসলাম এখন তোমাদের জীবন প্রত্যাশা করে। তোমাদের মধ্যে কেউ যদি জীবন দিতে কুণ্ঠাবোধ করো তবে সে তার ইউনিটে ফিরে যেতে পারো। রাতের এই অন্ধকারে আমি ফেরত যাত্রীকে দেখতে পাবো না। আমি এজন্য কারো প্রতি সামান্যতম বিরাগভাজনও হবো না।......

হে আল্লাহর সৈনিকেরা! আল্লাহ ছাড়া রাতের এই অন্ধকারে তোমাদের কেউ চিনতে পারছে না। কেয়ামতের দিনও আল্লাহ ছাড়া আর কেউ তোমাদের চিনতে পারবে না।' একথা বলে সুলতান দীর্ঘক্ষণ নীরব হয়ে গেলেন। এরপর বললেন,

এখন কি আমি ধরে নিতে পারি, তোমরা সবাই আমার সাথে রয়েছো?

সমস্বরে আওয়াজ ওঠলো, 'আমরা সবাই আপনার সাথে আছি সুলতানে মুহতারাম! আমরা তো জীবন বিলিয়ে দেয়ার জন্যই আপনার সাথে এসেছি। আপনি নির্দেশ করুণ সুলতান! আমরা আপনার নির্দেশের অপেক্ষায় আছি।

আজ তোমরা আমার নির্দেশে নয়, আল্লাহর নির্দেশে লড়াই করবে।" বললেন সুলতান। আজ রাতের এ লড়াইয়ে এই কুফরিস্তানে আল্লাহর নাম প্রচারিত হবে। শোন বন্ধুরা! এই দুর্গের পেছনে যে দুর্গ প্রাচীর রয়েছে, সেটি একেবারে পানি ছুয়ে রয়েছে। তোমাদের হাতে দুর্গ প্রাচীর ভাঙা এবং সুড়ঙ্গ খননের সরঞ্জাম দেয়া হচ্ছে, তোমাদের মধ্য থেকে পঞ্চাশজন পানিতে নেমে দুর্গ প্রাচীরের নীচ দিয়ে সুড়ং করবে।

এখন সেখানে বেশী পানি নেই। এ সময়ে বেশী পানি থাকে না। কিন্তু পানি ঠাণ্ডা থাকে। যারা সাঁতার জান না, তারা নদীতে নামবে না। তোমাদের ঝুকি হলো, দুর্গ প্রাচীরের উপর থেকে শক্ররা যদি তোমাদের দেখে ফেলে তাহলে তোমাদের উপর বৃষ্টির মতো তীর নিক্ষেপ করবে।

দুর্গ প্রাচীর কতটুকু চওড়া তা আন্দাজ করতে তোমাদের কষ্ট হবে না। অর্ধেক প্রাচীর পর্যন্ত যদি তোমরা সুড়ং করতে পারো দেখবে বাকী অর্ধেক পানিই করে ফেলবে।

প্রায় তিন শতাধিক মৃত্যুঞ্জয়ী পদাতিক সৈন্য থেকে সুলতান পঞ্চাশজনকে আলাদা করলেন। রাতে লড়াইয়ের তীব্রতা থেমে গিয়েছিল। অন্ধকারের কারণে তীরন্দাজরা তীর নিক্ষেপে ক্ষান্ত হয়ে পড়েছিল। অবশ্য দুর্গ প্রাচীরের উপরে এবং বুরুজগুলোতে রাতেও তৎপরতা ছিল।

সুলতান ছিলেন দুর্গ প্রাচীর থেকে প্রায় সিকি মাইল দূরে। তিনি বীর সৈন্যদের আল্লাহর উপর সোপর্দ করে তাদেরকে দুর্গ প্রাচীর ঘেষে নদীর কিনারা দিয়ে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দিলেন।

* * *

রাজপুতেরা নদীর দিক থেকে আক্রমণের আশংকামুক্ত ছিল। কারণ, গযনী বাহিনীর কাছে নদী পথে আক্রমণের কোন সাজ সরঞ্জাম ছিল না। এ পর্যন্ত

তারা নদীপথে কোন আক্রমণ পরিচালনা করেনি। ফলে রাজপুতেরা এদিক থেকে আক্রমণের ব্যাপারে পূর্ণ-ঝুকি মুক্ত ছিল।

অথচ গযনী বাহিনীর পঞ্চাশজন জীবন ত্যাগী যোদ্ধা নদীর দিক থেকেই আক্রমণের জন্যে অগ্রসর হচ্ছিল। এই পঞ্চাশ অভিযাত্রী উঁচু নলখাগড়া ও গাছগাছালীর আড়াল দিয়ে দুর্গ প্রাচীর কিছুটা দূরে থাকতেই নদীতে নেমে পড়ল। ধনুক তরবারী ছাড়াও তাদের সাথে ছিল শাবল আর খুন্তি কোদাল। নদীর পানি ছিল প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। নদীর তীরের কাছে পানি কোমর পর্যন্ত। মাঝে মধ্যে গর্তের মতো ছিল, যেখানে পানির পরিমাণ গলা বা বুক পর্যন্ত ছিল। যোদ্ধারা পরস্পর হাত ধরাধরি করে অগ্রসর হচ্ছিল।

এক সময় তারা ঠিকই দেয়ালের কাছে পৌঁছে গেল। নদীর তীরবর্তী দেয়ালটি খাড়া ছিল না, ছিল ঢালু। ফলে দুর্গ প্রাচীরের উপর থেকে নীচের সবকিছু পরিষ্কার দেখা যেতো। কিন্তু রাতের অন্ধকারে উপর থেকে প্রাচীরের নীচের কোন কিছু দেখার উপায় ছিল না।

আল্লাহর নাম দিয়ে পঞ্চাশজন যোদ্ধা পানিতে দাঁড়িয়ে দুর্গ প্রাচীরের পাথর খোলার চেষ্টা শুরু করে দিল। কিন্তু একদম নিঃশব্দে কোনকিছু করার উপায় ছিল না। শাবল ও খুন্তির আঘাতের আওয়াজ দুর্গ প্রাচীরের উপর পর্যন্ত চলে যাচ্ছিল। কিন্তু সুড়ংকারীদের সুবিধা এই ছিল যে, পানিতে প্রাচীরে শাবল মারার আওয়াজ প্রতিধ্বনীত হয়ে এমন তরঙ্গ শব্দ সৃষ্টি হচ্ছিল, সেখানে আসলে কি হচ্ছে তা সহজে কারো পক্ষে বোঝার উপায় ছিল না।

দুর্গ প্রাচীর ভাঙতে গেলে খুন্তি শাবলের আওয়াজ হবে এ বিষয়টি সুলতান আগেই আন্দাজ করেছিলেন। তিনি পঞ্চাশজনের বাহিনীকে ওখানে পাঠানোর পরই তাদের প্রাচীর ভাঙার আওয়াজকে ছাপিয়ে দেয়ার জন্যে লড়াইরত সৈন্যদেরকে নির্দেশ দিয়ে রেখে ছিলেন, তারা সবাই যাতে এক সাথে হৈ-হুল্লা করে উঠে এবং দফ-নাকাড়া বাজাতে শুরু করে।

সম্মুখ ভাগে মুসলিম বাহিনীর প্রচণ্ড শোরগোল, দফ নাকাড়ার বাজনা ও শ্লোগান শোনে দুর্গের সকল রাজপুত এদিকে এসে জড়ো হলো। তাদের ভাব ছিল নিশ্চয় এদিক থেকে গযনী বাহিনী চূড়ান্ত আঘাত হানছে। এই হৈ-হুল্লা আক্রমণের পূর্ব ইঙ্গিত ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না।

ওদিকে কোন প্রতিবন্ধকতার শিকার না হওয়ায় পঞ্চাশজন যোদ্ধা নিশ্চিন্ত মনে দুর্গপ্রাচীর থেকে পাথর খুলতে লাগল। ঘন্টা খানিক পরেই তারা প্রাচীর ভেদ করে মাটির স্পর্শ পেয়ে গেল। সুড়ং খনন করে এর আয়তন বড় করা তেমন মুশকিল ছিল না; কিন্তু অসুবিধা সৃষ্টি করল পানি। পাথর খোলার সাথে সাথে খালি জায়গা নদীর পানিতে ভরে যাচ্ছিল।

পঞ্চাশজন লোক এক সাথে খনন করার কারণে সুড়ং ছিল যথেষ্ট বড়। তারা দ্রুত খনন কাজ চালিয়ে যাচ্ছিল। খননের এক পর্যায়ে বিশাল একটি পাথর দেখা দিল। খননকারীদের কাছে শক্ত ও মজবুত শাবল ছিল। তারা সেই শাবল দিয়ে ক্রমাগত আঘাত করে সেই পাথরকেও মূল কাঠামো থেকে খুলে ফেলল। বিশাল পাথর খোলার সাথে সাথেই দুর্গের আলো দেখা গেল। এ সময় খননকারীরা দ্রুততার সাথে অন্য পাথর খুলে দিলে প্রায় পনেরো বিশ হাত চওড়া সুড়ং তৈরী হয়ে গেল। সুড়ং এতোটা উচু হলো যে, একজন মানুষ সোজা দাঁড়িয়ে অনায়াসে এর ভেতর দিয়ে যাতায়াত করতে পারবে।

শেষ পাথরটি খোলে ফেলার সাথে সাথেই দুর্গের ভেতরে পানি ঢুকতে শুরু করল।

এমন সময় দুর্গের ভেতরের কেউ পানি দেখে চিৎকার শুরু করে দিল। ততক্ষণে খননকারীদের খননকাজ শেষ। তারা শত্রুদের উপস্থিতি টের পেয়ে পিছু হটতে শুরু করল।

কিন্তু রাজপুতেরাও ছাড়ার পাত্র নয়। শত্রুর উপস্থিতি টের পেয়ে তারা মশাল উচু করে এদিকে দৌড়ে এলো। রাজপুতেরা ছিল বর্শা ও তরবারী সজ্জিত। তখনই উভয় পক্ষের মধ্যে লড়াই শুরু হয়ে গেল। গযনীর সৈন্যরা তো পানিতেই ছিল রাজপুতেরা দলে দলে এসে পানিতে ঝাপিয়ে পড়তে শুরু করল। পানির মধ্যে শুরু হয়ে প্রচণ্ড লড়াই। এ সময়ের মধ্যে সুড়ং পথে দিয়ে রাজপুতেরা মশাল হাতে নিয়ে আসতে শুরু করলে মশালের আলোয় শত্রু মিত্র পরিষ্কার দেখা যেতে লাগল।

এ দিকে সুলতান মাহমূদ সুড়ং খননকারীদের দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছিলেন। তিনি তাদের অবস্থা জানার জন্য কয়েকজন সৈন্যকে প্রেরণ করলেন। তারা এসে খবর দিল নদীর মধ্যে লড়াই শুরু হয়ে গেছে।

খবর শুনে সুলতান একটু অগ্রসর হয়ে দেখলেন, নদীর মধ্যে অসংখ্য মশাল জ্বলছে, যেন নদীতে চলছে মশাল মিছিল। এ সময় তিনি বাকী সৈন্যদেরকে নদীতে নামিয়ে দিলেন এবং তাদের সাথে মশালও দিয়ে দিলেন। এ সময় সুলতান মাহমূদ কমান্ডারদের বললেন–

মনে হচ্ছে আমার যোদ্ধারা সুড়ং খনন কাজ শেষ করে ফেলেছে, এই সুড়ং পথেই হয়তো রাজপুতেরা নদীতে নেমেছে। যাও, তোমরা গিয়ে বাস্তব অবস্থা দেখে আমাকে জানাও।

নদীর পানি সুড়ং পথে তীব্র বেগে দুর্গে প্রবেশ করছিল। আর সেই পথ দিয়ে রাজপুতেরা দুর্গের বাইরে আসছিল। কমান্ডারগণ এগিয়ে দেখল, নদীতে অসংখ্য মশাল নাচছে এবং আহত নিহত সৈন্যরা নদীর স্রোতে ভেসে যাচ্ছে।

এদিকে সুলতান মাহমূদ ভাবছিলেন, সুড়ং পথে দুর্গের ভেতর তার সৈন্যদের প্রবেশ করানো যায় কিনা। এমন সময় সুড়ং খননকারী এক আহত যোদ্ধা ফিরে এসে সুলতানকে জানাল।

সুড়ং পথে ভেতরে সৈন্য পাঠানো যাবে না সুলতান! এমনটি করলে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হবে।"

বাস্তব অবস্থা অনুধাবন করে নদীতে যুদ্ধরত সকল যোদ্ধাকে তিনি ফিরিয়ে আনতে নির্দেশ দিলেন। প্রত্যক্ষদর্শী ইতিহাসিকগণ যারা প্রতিদিনের ঘটনাবলীর বিস্তারিত বিবরণ লিখেছেন তা অনেক দীর্ঘ।

সেসব বর্ণনার সারমর্ম হলো, গযনীর অকুতোভয় যোদ্ধারা ব্যাপক রক্তক্ষয় করে দুর্গ প্রাচীরের দু'জায়গায় ভাঙন সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছিল। কিন্তু রাজপুতেরা এমন বীরত্ব ও ত্যাগের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল যা দেখে সুলতানের কণ্ঠে ইশ্ ইশ্ ধ্বনী উচ্চারিত হলো। তিনি রাজপুতদের বীরত্বও ত্যাগের মহোৎসব দেখে বিস্মিত হলেন।

সেখানে গযনীর সৈন্যরা ভাঙা প্রাচীর দিয়ে দুর্গের ভেতরে গিয়ে আক্রমণের কথা ছিলো সেখানে রাজপুতেরা বাইরে বেরিয়ে এসে গযনী সৈন্যদের উপর আক্রমণ করে আবার দুর্গে ফিরে যাচ্ছিল। শুধু তাই নয়, রাজপুত সৈন্যরা এক পর্যায়ে দুর্গে ফটক খোলা রেখেই বাইরে এসে মুসলমানদের উপর আক্রমণ করে আবার দুর্গে ফিরে যেতো।

এই অবস্থা দেখে এক পর্যায়ে সুলতান মাহমূদ কমান্ডারদের বললেন, এরা বাহাদুর কিন্তু কিছুটা নির্বোধ। এরা নির্বিচারে নিজেদের শক্তি খরচ করছে। তাই আক্রমণ না করে এখন শুধু প্রতিরোধ করো। আর তাদের শক্তিক্ষয় করতে দাও।'

দুই প্রতিপক্ষে মধ্যে যখন এমনই মরণপণ যুদ্ধ চলছে, রাজা রায়চন্দ্রের কুমারী কন্যা রাধাকে তখন একাধারে ওষুধ খাইয়ে অচেতন করে রাখা হচ্ছিলো। যখনই রাধা হুঁশ ফিরে পেতো, তার কণ্ঠে অতি ক্ষীণ আওয়াজে উচ্চারিত হতো! আল্লাহ্ আমার হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছে। একথা শোনার সাথে সাথে রাজকীয় বৈদ্য পুনরায় রাধাকে সংজ্ঞাহীনের ওষুধ খাইয়ে দিতেন।

এভাবে চব্বিশ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর পঁচিশতম দিনে সুলতান মাহমূদ সৈন্যদের নির্দেশ দিলেন, দুর্গের প্রাচীরের উপরে এবং ভাঙা অংশগুলোতে তীব্র আক্রমণ করে দুর্গের ভেতরে প্রবেশের চেষ্টা করবে এবং দুর্গ ফটক খোলে রাজপুতেরা বাইরে এলে প্রচণ্ড আক্রমণ করে দুর্গ ফটক খোলা রাখার চেষ্টা করবে।

পঁচিশতম দিনের লড়াই ছিল চূড়ান্ত লড়াই। ইতোমধ্যে রাজপুতেরা তাদের বিপুল শক্তি ক্ষয় করে ফেলেছে। গযনীর সৈন্যরা যখন সব কয়টি দুর্গ-ফটকের ভাঙা অংশ এবং দুর্গ প্রাচীরের উপর একযোগে আক্রমণ করে বসল, তখন রাজপুতেরা হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিল। মুসলমানরা দুর্গে প্রবেশ করে দেখতে পেল শত্রুদের জনবল একেবারেই কম।

রাজপুতেরা তখন মোকাবেলা করার চেয়ে আত্মহত্যাকেই বেশী প্রাধান্য দিচ্ছিল। অনেক রাজপুত পরিবার পরিজন সবাইকে ঘরে বন্দি করে আগুন ধরিয়ে দিল এবং আত্মীয় স্বজন ও পরিবার-পরিজনসহ আগুনে আত্মহুতি দিল। বাইরের রাজপুতদের সামনে কোন হিন্দু নারী নজরে পড়লেই হল সে দৌড়ে গিয়ে তাকে হত্যা করছিল। মুনাজের বহু সৈন্য উঁচু দুর্গ-প্রাচীর ও বুরুজ থেকে নীচে ঝাপিয়ে পড়ে মৃত্যুবরণ করল।

সুলতান মাহমূদ যখন দুর্গে প্রবেশ করলেন, তখন এক কথায় দুর্গের ভেতরের সবখানে আগুন জ্বলছে এবং সেই আগুনে রাজপুতেরা ভস্ম হচ্ছে। বলা চলে মুনাজের সব অধিবাসী আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে। শুধু রাজমহলটি ছিল অক্ষুণ্ন। রাজমহলে কেউ অগ্নি সংযোগ করেনি।

গযনীর সৈন্যরা রাজ প্রাসাদে প্রবেশ করে দেখতে পেল জায়গায় জায়গায় মরদেহের স্তুপ। রাজপুতেরা একে অন্যকে হত্যা করেছে। খুব ঠাণ্ডা মাথায় তারা এই পরাজয়ের গ্লানি থেকে বাঁচার জন্যে আত্মহুতির পথ বেছে নিয়েছে। রাজমহলের রক্ষিতা ও নর্তকীদের দেহেও খঞ্জর তরবারী বিদ্ধ অবস্থায় দেখা গেল। রাজমহল তল্লাশী করে রাজা রায়চন্দ্র এবং রানীর মরদেহ তাদের শয়নকক্ষের পালঙ্কের উপর পাওয়া গেল।

গযনীর সৈন্যরা রাজমহলের প্রতিটি কক্ষ তল্লাশী করলো। কোথাও জীবন্ত কাউকে পাওয়া যায় কি-না। কিন্তু সব কক্ষেই তারা দেখতে পেলো মৃত মানুষের মরদেহ। সব কক্ষই ছিল খোলা। কিন্তু একটি কক্ষ ছিল বাইরের দিক থেকে বন্ধ। ছিটকিনী খুলে সৈন্যরা দেখতে পেলো এক তরুণী মৃতপ্রায় অবস্থা বিছানায় শুয়ে আছে। মানুষের আওয়াজ পেয়ে মৃতপ্রায় মেয়েটি ধীরে ধীরে চোখ মেললো এবং ক্ষীণ একটি আওয়াজ করল।

আওয়াজ শুনে উপস্থিত সৈন্যরা তার কাছে গিয়ে বুঝলো তরুণীটি মৃত নয়, তবে মারাত্মক অসুস্থ।

অসুস্থ রাধা অস্পষ্ট আওয়াজে জিজ্ঞেস করলো-

তোমরা কি মুসলমান সৈনিক? তোমাদের সুলতান কোথায়? তাকে ডেকে আনো। আমি তার কাছে বলতে চাই, আমি তার আল্লাহর নাম নিয়েই মরছি। আমি তার হাতে চুমু খেয়ে মরতে চাই।

জীবন্মৃত তরুণীর কণ্ঠে একথা শুনে গযনীর যোদ্ধারা বিস্মিত হলো। একটি অসুস্থ শত্রু মেয়ের জন্যে এই অবস্থায় সুলতানকে এখানে আনা ঠিক হবে না মনে করে সৈন্যরা রাধার কথায় তেমন গুরুত্ব দিল না। রাধা যখন দেখতে পেলো তার কথায় এদের কাছে কোন গুরুত্বপাচ্ছে না, তখন হতাশাগ্রস্থ হয়ে তাদের দিকে কতোক্ষণ তাকিয়ে থাকলো। এরই মধ্যে তার মাথা নীচের দিকে ঢলে পড়লো। সাথে সাথেই নিথর হয়ে গেলো রাধার হৃদকম্পন। বস্তুত রাধা আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস নিয়ে গযনী বাহিনীর সৈন্যদের সাক্ষী রেখে দুনিয়া থেকে বিদায় হলো।

* * *

ব্যাপক রক্তপাত জীবনহানির পর গণ আত্মহত্যার মাধ্যমে মুনাজের রাজপুতেরা দুর্গ মুসলমানদের কব্জায় ছেড়ে দিল বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নিজেরাই অগ্নি সংযোগ করে দুর্গের সকল বাড়ী ঘর ধ্বংস করে দিল। রাজপুতদের কাছ থেকে মুনাজ দুর্গের নিয়ন্ত্রণ নিতে সুলতান মাহমূদকে লড়তে হলো জীবনের অন্যতম কঠিনতম লড়াই। এতে ব্যাপক জনশক্তিও কুরবানী দিতে হলো।

মুনাজ দুর্গ দখলের পর সুলতান মাহমূদের লক্ষ ছিল কন্নৌজ দুর্গ। কিন্তু কন্নৌজ সম্পর্কে তার কাছে পরস্পর বিরোধী খবর আসছিল। উভয়বিদ সংবাদের মধ্যে কোনটি সত্য কোনটি মিথ্যা তা যাছাই করা মুশকিল বিষয় হয়ে উঠছিল।

গোয়েন্দা সালেহ্ সুলতানকে জানিয়ে ছিল, মুনাজ ও কনৌজের মধ্যবর্তী জায়গায়ই হবে তাদের সাথে কঠিন মোকাবেলা। কিন্তু পরে যা খবর আসছিল তাতে জানা যাচ্ছিল মুনাজ ও কন্নৌজের মধ্যবর্তী স্থানের কোথাও হিন্দু সৈন্যদের কোন চিহ্ন পাওয়া যাচ্ছে না।

মুনাজ যুদ্ধে সুলতানকে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়েছে। এজন্য তিনি তাৎক্ষণিক অগ্রাভিযানের নির্দেশ না দিয়ে কিছুটা সময় নিতে চাচ্ছিলেন। যাতে ক্লান্ত ও আহত যোদ্ধারা একটু বিশ্রাম নিয়ে নিতে পারে।

কয়েকদিন মুনাজে অবস্থান করার পর সেনাপতিগণ সুলতানকে পরামর্শ দিলেন, অভিযানের নির্দেশ দিয়ে দেয়া হোক! বিলম্ব করলে অবশেষে ভীম পালের সৈন্যরা এসে শত্রু বাহিনীর শক্তি বাড়িয়ে দিতে পারে।

বাস্তবতা ও ঝুকির আশংকা বিবেচনা করে সুলতান কন্নৌজের দিকে অভিযানের নির্দেশ দিলেন। তিনি গোটা বাহিনীকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে একটি অংশকে যমুনা নদীর তীরে ঘেষে এবং অপর একটি অংশকে গঙ্গা নদীর তীর ঘেষে সামনে অগ্রসর হতে বললেন। অগ্রবর্তী দলকে খুবই শক্তিশালী করা হলো। মাঝে থাকলেন তিনি নিজে বেশীরভাগ সৈন্য নিয়ে; আর পেছনে রাখলেন একটি রিজার্ভ বাহিনী। প্রতিটি ইউনিট পূর্ণ রণপ্রস্তুতি নিয়ে সম্মুখে অগ্রসর হচ্ছিল।

১০১৮ সালের ২০ ডিসেম্বর মোতাবেক ৪০৯ হিজরী সনের ৮ শাবান কন্নৌজ পৌঁছলেন সুলতান। তিনি গোটা দুর্গ অবরোধ করলেন। কিন্তু খুবই হাল্কা প্রতিরোধের মুখোমুখি হলো মুসলিম সৈন্যরা। অনেকটা নির্বিঘ্নে অবরোধ আরোপ করতে দেয়াকে তিনি কন্নৌজ শাসকদের একটা কূটচাল মনে করে রিজার্ভ সৈন্যদেরকে পূর্ণ সতর্ক থাকতে বললেন। বাস্তব পরিস্থিতি অনুধাবন এবং বাইরের আক্রমণ সম্ভাবনা যাছাই করার জন্যে বহুদূর পর্যন্ত তিনি পর্যবেক্ষক ও গোয়েন্দাদের ছড়িয়ে দিলেন। তার প্রবল আশংকা ছিল হিন্দুরা অবশ্যই পেছন দিক থেকে আক্রমণ করবে। কিন্তু সুলতান মাহমূদের সকল আশংকা-উদ্বেগের অবসান ঘটিয়ে অবরোধের দ্বিতীয় দিনই কন্নৌজের দুর্গবাসী সাদা পতাকা উড়িয়ে দিল।

* * *

সুলতান মাহমূদ প্রথমে চৌকস একটি ইউনিটকে দুর্গের ভেতরে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। এরপর একই সাথে আরো দু'টি সেনা ইউনিটকে ভেতরে পাঠালেন। এরা ভেতরে যাওয়ার সাথে সাথেই ভেতরের অবস্থার খবর এসে গেলো যে, ভেতরে কোন ধরনের সংঘর্ষ বাঁধার সম্ভাবনা নেই। তখন সুলতান নিজে কন্নৌজ দুর্গের ভেতরে প্রবেশ করলেন।

সুলতান ভেতরে প্রবেশ করলেন। কন্নৌজ সৈন্যদের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের জিজ্ঞেস করে জানা গেল অবরোধ আরোপের আগেই কন্নৌজের মহারাজা পরিবার পরিজন নিয়ে অজ্ঞাত স্থানে চলে গেছেন। সুলতান মাহমূদের নির্দেশে হিন্দু সেনাপতি ও কমান্ডারদের জিজ্ঞেস করা হলো, রাজ্যের ধন-ভাণ্ডার কোথায়? তারা তাদের জানা মতে ধনভাণ্ডারের অবস্থান জানালো; কিন্তু সেখানে তল্লাশী করে কিছুই পাওয়া গেল না।

সুলতান রাজমহলকে ধ্বংস করে দেয়ার নির্দেশ দিলেন এবং প্রধান মন্দিরের সব মূর্তি ভেঙে ফেলার হুকুম দিলেন।

খাজানা না পাওয়ার কথা চাউড় হলে সালেহ্ মন্দিরের প্রধান পুরোহিতকে গ্রেফতার করিয়ে আনলো। পুরোহিতকে যখন ধনভাণ্ডারের কথা জিজ্ঞেস করা হলো তখন তিনি সুলতানকে জানালেন– ধন-ভাণ্ডারের খবর আপনার সালেহ

নামক গোয়েন্দা জানে। কিন্তু সেখানে হয়তো এখন আর কিছুই নেই। মহারাজা হয়তো সবই সাথে নিয়ে গেছেন।

ঐতিহাসিক আবুল কাসিম ফারিশ্‌তা লিখেছেন, "সুলতান মাহমূদের এই বিজয় কোন সাধারণ বিজয় ছিল না। কন্নৌজ বিজয় ছিল রাজনৈতিক বিচারে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ কন্নৌজ বিজয়ের ফলে ভারতের বিশাল অংশ সুলতানের দখলে চলে এলো।

সিমনতাশের বেহালা

১০১৭ সাল মোতাবেক ৪১০ হিজরী। সুলতান মাহমূদ মথুরা থেকে কন্নৌজ পর্যন্ত বিস্তর এলাকা জয় করে বিজয়ী বেশে গযনী ফিরে এলেন। সুলতানের বিজয়ী বাহিনী ফেরার আগেই গযনী খবর পৌছে গিয়েছিল, এবার সুলতান কয়েকজন রাজা মহারাজাকে পরাজিত করেছেন এবং ও বহু রাজ্য জয় করে দেশে ফিরছেন।

সুলতানের ফিরে আসার সংবাদ পেয়ে গযনীর আবাল বৃদ্ধসহ সব মানুষ রাস্তায় বেরিয়ে এলো। সাধারণ লোকেরা আনন্দে শ্লোগান দিচ্ছিল, বিজয়ী সৈন্যরাও হর্ষধ্বনি করছিল। নারীরা দূরে দাঁড়িয়ে বিজয়ী সেনাদের শুভেচ্ছা জানচ্ছিল।

গযনীর অধিবাসীরা যখন উনপঞ্চাশ হাজার হিন্দু বন্দির বিশাল সারি এবং সাড়ে তিনশত জঙ্গী হাতির দীর্ঘ লাইন দেখল তখন আনন্দের আতিশয্যে খুশীতে নাচতে শুরু করল। গযনীর শিশুরা পর্যন্ত সুলতানের পথ আগলে দাঁড়িয়ে তাকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছিল। গযনীর উল্লসিত মানুষের হর্ষধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে ওঠেছিল।

অনেক গোড়া ঐতিহাসিক এবং পরবর্তীকালের ইতিহাসবিদ লিখেছেন, মথুরা, মহাবন, মুনাজ ও কন্নৌজ বিজয়ের পর সুলতান মাহমূদ গযনী পৌছে নির্দেশ দিলেন–

যেসব ধন সম্পদ হিন্দুস্তান থেকে আনা হয়েছে, শাহী মহলের বাইরের খালি জায়গায় সেগুলোকে রেখে দেয়া হোক। সৈন্যরা যখন সংগৃহীত

সোনাদানা মণিমুক্তা এক জায়গায় স্তূপাকারে রাখলো, তা দেখে গর্ব ও অহংকারে মাহমূদের মাথা উঁচু হয়ে গিয়েছিল।

এতটা বাস্তব যে, কন্নৌজ বিজয়ের পর গযনী ফিরে সুলতান মাহমূদ অর্জিত সকল যুদ্ধলব্ধ সম্পদ তার বাসভবনের সামনে স্তূপাকারে রাখতে নির্দেশ দিয়েছিলেন।

কিন্তু সে সময়কার অন্যতম ঐতিহাসিক যমখ্শরী এবং আবু আব্দুল্লাহ লিখেছেন, "কন্নৌজ, মথুরা, মহাবন ও মুনাজ বিজয়ের পর গযনী ফেরার সাথে বিজয়োল্লাসে উদ্বেলিত গযনীবাসির উৎসাহ ও আগ্রহের আতিশয্য দেখে সুলতান মাহমূদ যুদ্ধ লব্ধ সকল সম্পদ রাজমহলের বাইরে রাখার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এবং এসব সম্পদ দেখিয়ে তিনি জনতার উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, "এসব সম্পদ তোমাদের, তোমাদের জীবন মান উন্নয়নে এ সম্পদ ব্যয় করা হবে।"

বাস্তবেও তিনি এই অঢেল সম্পদ গযনীর অধিবাসীদের জাতীয় জীবন উন্নয়নে ব্যয় করেছিলেন। এই যুদ্ধের পর তিনি মর্মর পাথরের একটি বিশাল মসজিদ নির্মাণ করিয়েছিলেন। এই মসজিদের সাথে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি মসজিদের নাম রেখেছিলেন "আসমানী মহল"।

মসজিদটি রূপ-সৌন্দর্যে ছিল অনুপম। এই মসজিদ নির্মানে তিনি বহু জায়গার বিখ্যাত সব স্থাপত্যবিদ এনে জড়ো করেছিলেন। মসজিদের দেয়াল এবং ছাদে যে সব নক্সা উৎকীর্ণ করিয়েছিলেন সেগুলোতে স্বর্ণ ও রৌপ্য গলিয়ে কারুকাজকে আরো মনোমুগ্ধকর করা হয়েছিল। মিনারগুলোর উপরিভাগে দেয়া হয়েছিল স্বর্ণের প্রলেপ।

বিশ্ববিদ্যালয়টিকে তিনি প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে সেকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠে রূপান্তরিত করেছিলেন। মসজিদের ভেতরে আকর্ষণীয় কারুকার্যময় গালিচা বিছানো হয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি বিভিন্ন ভাষার অসংখ্য গ্রন্থরাজী সংগ্রহ করে সেগুলোকে স্থানীয় ভাষায় ভাষান্তরিত করিয়েছিলেন। জ্ঞান ও প্রজ্ঞার একটি অনন্য কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল সুলতান মাহমূদের বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্বের নানা জায়গা থেকে তিনি বিশেষজ্ঞ জ্ঞানীদের এখানে জমায়েত করেছিলেন এবং তাদের জন্যে খুবই উচ্চ মানের সম্মানী ভাতা বরাদ্দ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদেরও নিয়মিত বৃত্তি দিতেন।

বিভিন্ন যুদ্ধে শাহাদত বরণকারীদের সন্তানদেরকে সেখানে বিনা খরচে শিক্ষা দেয়া হতো এবং তাদের ও পরিবারের সার্বিক ব্যয় সরকারী ভাণ্ডার থেকে নির্বাহ করা হতো।

ঐতিহাসিক আবুল কাসিম ফারিশ্‌তা এবং আল বিরুনী লিখেছেন, জামে মসজিদ ও বিশ্ববিদ্যালয় মথুরা ও কন্নৌজ বিজয়ের স্মারক হিসেবে নির্মাণ করা হয়েছিল। অধিকাংশ ঐতিহাসিক সুলতান মাহমূদের সোমনাথ বিজয়কে অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন, কিন্তু সুলতান মাহমূদের দৃষ্টিতে মথুরা বিজয় ছিল সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, মথুরা ছিল হিন্দুদেবতা হরিকৃষ্ণের জন্মভূমি। হিন্দুদের কাছে মথুরা ছিল মুসলমানদের মক্কা মদীনার মতোই পবিত্র স্থান।

এই অভিযানে সুলতান মাহ্‌মূদ যে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ অর্জন করেছিলেন এর মধ্যে স্বর্ণ-মুদ্রা ছিল ত্রিশ লাখ। আর মণিমুক্তা হীরা জহরত ও স্বর্ণের টুকরোর কোন হিসাব ছিল না। পঞ্চান্ন হাজার হিন্দু গ্রেফতার হয়েছিল এবং সাড়ে তিনশ হাতি গযনী বাহিনীর হাতে এসেছিল। ঘোড়া ও তরবারীর তো কোন হিসাবই ছিল না।

ঐতিহাসিক ফারিশ্‌তা লিখেছেন, বিপুল ধন-সম্পদ ছাড়াও এই অভিযানে সুলতান মাহমূদ হিন্দুস্তান থেকে তিনটি বিস্ময়কর জিনিস এনেছিলেন। এর মধ্যে একটি ছিল ময়নার মতো পাখি, একটি হাতি এবং একটি পাথর।

মথুরা থেকে কন্নৌজ যাওয়ার পথে বিস্ময়কর এই হাতিটি তার হাতে এসেছিল। যমুনার ডান তীরে আসাঙ্গী নামক একটি ছোট রাজ্য ছিল। এই রাজ্যের শাসক ছিলেন চন্দ্র রায়। সুলতান মাহমূদকে তার গোয়েন্দারা জানিয়ে ছিল রাজা চন্দ্ররায়ের কাছে এমন বিশালদেহী একটি হাতি রয়েছে যে, এমন হাতি গোটা হিন্দুস্তানে আর কোথাও আছে বলে জানা যায়নি। শুধু বিশালদেহী হিসেবেই এই হাতিটি বিখ্যাত নয়, এটি নাকি শত্রু শিবিরে গিয়ে আতংক ছড়াতে খুবই পটু। অন্যান্য হাতির মতো এটি শত্রু বাহিনীর তীর বর্শার আঘাতে আহত হয়ে রণাঙ্গন ত্যাগ করে না।

কৌশলগত কারণে এই হাতিটি গযনী বাহিনীর জন্যে ঝুঁকিপূর্ণ ছিল। সুলতান মাহমূদ আসাঙ্গী দুর্গ অবরোধ করে রাজা চন্দ্ররায়কে হাতিটি হস্তান্তরের জন্য পয়গাম পাঠালেন। পয়গামে বললেন–

হাতিটি হস্তান্তর করে দিলে খুবই সহজ শর্তে অবরোধ প্রত্যাহার করা হবে।"সুলতানের পয়গামের জবাবে রাজা চন্দ্ররায় বললেন–

"রাজধানী থেকেও হাতিটি আমার কাছে বেশী গুরুত্বপূর্ণ। জীবন থাকতে আমি এই হাতি হাতছাড়া করবো না।"

তারপর রাজা চন্দ্ররায় এবং গযনী বাহিনীর মধ্যে শুরু হলো তুমুল যুদ্ধ। দুই বাহিনীর মধ্যে যুদ্ধ চলছে, এমন সময় চন্দ্ররায়ের বিশালদেহী হাতিটি রাজকীয় ভঙ্গিতে সুলতান মাহমূদের কাছাকাছি চলে এলো। হাতির উপরে যেসব আরোহী সওয়ার ছিল গযনী সৈন্যদের তীর বিদ্ধ হয়ে মরে গিয়ে হাতির হাওদায় পড়েছিল। হাতিকে নিয়ন্ত্রণ করার মতো কোন মাহুত ছিল না। হাতিটি স্বেচ্ছায় যখন সুলতানের অবস্থানের দিকে এলো তখন সেটির চাল ছিল একেবারেই শান্ত নিরীহ।

কাঙ্খিত হাতিকে এদিকে নিয়ন্ত্রণহীনভাবে আসতে দেখে সুলতান মাহমূদ সেটিকে কব্জা করার নির্দেশ দিলেন। সুলতানের নির্দেশে দু'জন যোদ্ধা জীবনের ঝুকি নিয়ে ঘোড়া থেকে লাফিয়ে হাতির হাওদায় উঠে গেল এবং হাতিটির নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিল।

বিনা প্ররোচনায় বিনা নির্দেশনায় নিজ থেকে হাতি গযনী বাহিনীর কাছে চলে আসায় সুলতান মাহমূদ বললেন–

ঃ এই হাতি আল্লাহ আমাদের দান করেছেন।"

সুলতান এই হাতির প্রাপ্তিতে খুশী হয়ে এটির নাম দিয়েছিলেন "খোদা দাদ।"

ঐতিহাসিক ফারিশ্তা লিখেছেন– সুলতান মাহমূদের আনা বিস্ময়কর পাখিটির বৈশিষ্ট্য ছিল, পাখির পিঞ্জিরা কোন ঘরে বা বাড়ীতে রাখলে সেই বাড়ীতে কেউ বিষ নিয়ে প্রবেশ করতে পারতো না। পাখি বিষের অস্তিত্ব টের পেলেই পিঞ্জিরায় অস্থিরভাবে ছটফট করতো। যেনো সে পিঞ্জিরা ভেঙে বেরিয়ে যাবে এবং বিশেষ ধরনের আওয়াজ করতো। লোকেরা পাখির এই আওয়াজ ও অস্থিরতা দেখে তল্লাশী করে লুকিয়ে রাখা বিষ খুঁজে বের করে নিতো। ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, সুলতান মাহমূদ বিস্ময়কর এই পাখিটি উপঢৌকন স্বরূপ বাগদাদের খলীফাকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

ফারিশ্‌তা লিখেছেন, যে পাথরটি সুলতান মাহমূদ ভারত থেকে নিয়ে এসেছিলেন, এটির বৈশিষ্ট্য ছিল, এই পাথর চুবিয়ে ক্ষত স্থানে পানি দিলে ক্ষত খুব দ্রুত শুকিয়ে যেতো।

* * *

এই অভিযান থেকে গযনী ফেরার পর সুলতান মাহমূদ একটি ছোট্ট কাফেলা নিয়ে তার শায়খ ও মুর্শিদ তথা আধ্যাত্মিক গুরু ও শায়খ আবুল হাসান কিরখানীর উদ্দেশে রওয়ানা হলেন। মুর্শিদের দরবারে পৌছার আগেই তিনি কাফেলার সঙ্গীদের থামিয়ে দিয়ে ঘোড়া থেকে নেমে পড়লেন। তখন তিনি ছিলেন খুবই সাধারণ পোশাক পরিহিত। এই পোশাকে অপরিচিতদের পক্ষে সুলতান মাহমূদকে চেনা সম্ভব ছিল না। শায়খের আস্তানার অনেক দূরেই তার নিরাপত্তা রক্ষীদের রেখে একাকী পায়ে হেটে মুর্শিদের দরবারে হাজির হলেন সুলতান। শায়খ ও মুর্শিদের দরবারে তিনি কখনো রাজকীয় বেশভূষা নিয়ে উপস্থিত হননি। মুর্শিদের দরবারে গিয়ে তিনি তার হাতে চুমু দিয়ে মাথা নীচু করে বসে পড়লেন।

'সেই সময়টি স্মরণ করুন সুলতান! এককার যখন আপনি পরাজিত হয়ে হিন্দুস্তান থেকে ফিরে এসেছিলেন। সুলতানকে দেখে প্রথমেই বললেন শায়খ আবুল হাসান কিরখানী। তিনি আরো বললেন, তখন আপনি ছিলেন বিপর্যস্ত বিধ্বস্ত। আপনার অগণিত সৈন্য নিহত হয়েছিল। আপনার সেনাবাহিনী পর্যুদস্ত হয়ে পড়েছিল। ভেঙে গিয়েছিল আপনার মনোবল। আপনাদের বিপন্ন মনে করে আপনার শত্রুরা আপনার উপর শকুনের মতো ঝাপিয়ে পড়েছিল। তখন আমি আশংকা করেছিলাম, আপনি না আবার মনোবল হারিয়ে শত্রুদের মোকাবেলায় যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া থেকে বিরত থাকেন।.......

জয় পরাজয় আল্লাহর হাতে সুলতান! যে পরাজয় স্বীকার করে নেয় পরাজয় তার ভাগ্যলিপি হয়ে ওঠে। আর সেই পরাজয় স্বীকার করে নেয় যার ঈমান দুর্বল হয়ে পড়ে। শহীদদের মিশনকে এগিয়ে নেয়া ছাড়া আপনি তাদের রক্তের ঋণ কিছুতেই শোধ করতে পারবেন না।.....

শহীদদের ত্যাগকে সম্মান করা আপনার কর্তব্য। যারা বুক টান করে মৃত্যুকে পরওয়া না করে শ্লোগানে শ্লোগানে মুখরিত করে হিন্দুস্তানে গিয়েছিল, কিন্তু তারা আর গযনীতে ফিরে আসেনি, তাদের আত্মত্যাগ ভুলে গেলে এর শাস্তি দুনিয়াতেই আপনাকে ভুগতে হবে। কারণ, এরা আপনার নির্দেশে যায়নি, গিয়েছিল আল্লাহর পয়গাম ছড়িয়ে দিতে, আল্লাহর বিধানকে বুলন্দ করতে।"

"শহীদদের স্মৃতি রক্ষার্থে আমি তাদের স্মারক হিসেবে গযনীতে একটি জামে মসজিদ এবং একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্যে নির্মাণ কাজ শুরু করে দিতে নির্দেশ দিয়ে দিয়েছি। বিনীত কণ্ঠে মুর্শিদকে জানালেন সুলতান। তাদের স্মৃতিস্বরূপ আমি একটি স্মৃতি মিনার নির্মাণ করাচ্ছি। শহীদদের পরিবার বর্গের জন্য সরকারী ভাতার ব্যবস্থা করেছি এবং তাদের সন্তানদের বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা নিয়েছি।"

"এসবই ভালো কাজ। তবে আমার ক'টি কথা মনোযোগ দিয়ে শুনুন সুলতান।' বললেন শায়খ কিরখানী। তারপর কিরখানী বললেন,

বিজয়ের পর গযনীর লোকেরা আপনাকে এভাবে অভ্যর্থনা দিয়েছে, যাতে মনে হয় আপনি যেন আসমান ছুয়ে নীচে নেমে এসেছেন। আমি শুনেছি আপনার পথে নারীরাও ফুল ছিটিয়েছে। কবিরা আপনার প্রশংসায় কবিতা রচনা করেছে, শিল্পীরা আপনার প্রশংসায় সঙ্গীত গেয়েছে। রাজ দরবারে অসংখ্য লোক এসে আপনার হাতে চুমু দিয়ে আপনাকে দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ বিজয়ী আখ্যা দিয়েছে।.......

এ মুহূর্তে আপনি হয়তো বুঝতে পারছেন না, যেগুলো আপনার দৃষ্টিতে আজ ফুলের মতো কোমল মনে হচ্ছে প্রকৃত পক্ষে সেগুলো ফুল নয় বরং কাঁটা। কবি শিল্পী আর তোষামোদকারীরা আপনার যে প্রশংসা করছে আসলে সেগুলো প্রশংসা নয় মধুতে মেশানো বিষ। বিষ মধু বলে আপনাকে পান করানো হচ্ছে।......

আল্লাহ না করুন, আজ যদি কোন কারণে আপনি ক্ষমতাচ্যুত হন তাহলে এই প্রশংসাকারীরা সমস্বরে কোরাশ তুলবে যে, প্রকৃতপক্ষে মাহমূদ এমনটিরই উপযুক্ত। সুলতানী করার মতো কোন যোগ্যতাই তার মধ্যে ছিল না। তখন এরা সেই লোকের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হবে ক্ষমতার মসনদে যাকে তারা দেখবে....।

তোষামোদ ও প্রশংসা ক্ষমতা ও মসনদের ঘুণ পোকার মতো। দৃশ্যত শক্রর চেয়ে লুকিয়ে থাকা এই ঘুণ অত্যন্ত ভয়ংকর। খুব সন্তর্পণে ক্ষমতার তখ্‌তকে ভেতর থেকে ফোকলা করতে থাকে। আপনি যে রাতে বিজয়ের আনন্দ উৎসব করতে গযনীর লাখো অভিজাত শ্রেণীর লোককে দাওয়াত দিয়ে ভোজনের আয়োজন করেছিলেন, ভুলে গিয়েছিলেন সেই রাতে গযনীতেই বহু লোক দুঃখে- শোকে শুকনো রুটি খেয়ে অর্ধাহারে এক বুক কষ্ট নিয়ে ঘুমিয়েছে। এমনও হয়তো অনেক লোক ছিল, সেই রাতে যাদের পেটে এক টুকরো রুটিও যায়নি।.....

তোষামোদকারীরা হয়তো আপনাকে সেকথাই বুঝিয়েছে, গযনী সালতানাতের লোকেরা খুবই সুখে আছে এবং সবাই আপনার প্রশংসা করছে। মাহমূদ! নিজের বিবেকের আয়নায় নিজের চেহারা দেখবেন এবং জনতার চেহারা তোষামোদীদের চোখে নয় নিজের চোখে দেখবেন। একাকী আপনাকে ভাবতে হবে, আপনি গযনীর শাসক নন। ব্যক্তিগতভাবে আপনিও গযনীর অন্য দশটি মানুষের মতোই একজন মানুষ। অতএব অন্য দশজনের যে অবস্থা আপনাকেও তেমনই থাকতে হবে। নাগরিকদের চোখই হতে হবে আপনার চোখ।

শাসন, রাজত্ব আর কূটচাল পাশাপাশি থাকে মাহমূদ। ক্ষমতা লোভী তোষামোদী লোকেরা শাসকের সাথে প্রতারণা করে আর শাসক জনগণের সাথে প্রতারণা করে। একটা জিনিস আপনাকে বুঝতে হবে, অপরাধ ও সৎকাজ হাত ধরাধরি করে চলে। যে শাসক বা সুলতান তার চোখে তোষামোদীদের টুপি পরিয়ে রাখে এবং কানে প্রশংসাবাণীর সীসা ঢেলে দেয়, সে আল্লাহ্‌র কাছে অপরাধী বিবেচিত হয়।....

যে আল্লাহ্‌ আজ আপনাকে ক্ষমতা ও মর্যাদা দান করেছেন, তিনি এই ক্ষমতা আপনার কাছ থেকে ছিনিয়েও নিতে পারেন। তোষামোদীদের প্রশংসা বাণীর চেয়ে মজলুম ও অত্যাচারিতের দীর্ঘশ্বাস আল্লাহর কাছে অনেক বেশী দ্রুত পৌঁছে। হিন্দুস্তানের বিজয় আপনার প্রজাদের সংখ্যা বিপুলভাবে বাড়িয়ে দিয়েছে। ফলে আপনার দায়িত্ব ও কর্তব্যও অনেকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এমনটি যেন না হয় সোনা-রূপা আপনাকে একদেশদর্শী করে দেয়। যে সম্পদ আপনার

কব্জায় এসেছে, তা আল্লাহর অনুগ্রহ ও আমানত। এ সম্পদ আপনার ব্যক্তিগত সম্পদ নয়। প্রাসাদ ষড়যন্ত্র থেকে আপনাকে বেরিয়ে আসতে হবে এবং বহি:শত্রুদের প্রতি আপনার কড়া দৃষ্টি রাখতে হবে।....

সাম্প্রতিক বিজয়ের জন্যে আমি আপনাকে মোবারকবাদ জানাচ্ছি। আমি অনুভব করছি হিন্দুস্তানের বিজিত এলাকাগুলোয় আযানের ধ্বনি মুখরিত হয়। আপনাকে আবারো সেই সব জায়গায় যেতে হবে। যেসব স্থানে কালসাপের মাথা এখনো থেতলে দেয়া সম্ভব হয়নি। আমি ভবিষ্যতের একটা চিত্র পরিস্কার দেখতে পাচ্ছি, যদি হিন্দুদের মাথা গুড়িয়ে দেয়া না যায় তাহলে কুচক্রী এই হিন্দুজাতি ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত অব্যাহত রাখবে।.... ঠিক আছে এখন আপনি গযনী ফিরে যান, গিয়ে আগামী যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুতি শুরু করে দিন।”

“সম্মানিত মুর্শিদ! আপনি যে দিক নির্দেশনা দিয়েছেন, এই দিক নির্দেশনা আমার খুব বেশী প্রয়োজন ছিল। কুফরী শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করেই আমার জীবন কেটে যাবে এই বাস্তবতা আমি হৃদয়ে গেথে নিয়েছি, এ বিষয়ে আমার মধ্যে কোন সংশয় সন্দেহ নেই। আমার দুঃখ ও দুশ্চিন্তার কারণ হলো, স্বজাতির লোকেরা আমার সবচেয়ে ভয়ানক শত্রু। স্বজাতির প্রতিবেশী শাসকরা আমাকে ধ্বংস করার জন্যে এক জোট হয়েছে। গৃহযুদ্ধে আমাকে বারবার প্রচুর রক্ত ঝরাতে হচ্ছে।”

“একটা পার্থক্য আপনাকে বুঝতে হবে সুলতান! বললেন আবুল হাসান কিরখানী। এক পক্ষ হলো আপনার সালতানাতের শত্রু। এই শত্রুপক্ষ আপনার কাছ থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নিতে চায়। আর এক পক্ষ হলো এমন শত্রু যারা ইসলামকে দুর্বল করে দিতে তৎপর। এদেরকেই বলা হয় গাদ্দার। আপনাকে ব্যক্তিগত শত্রু এবং ইসলামের শত্রুদের পার্থক্য বুঝতে হবে। আপনার ক্ষমতা ও মর্যাদার বিরোধিতার কারণে কাউকে জীবিত রাখবেন না। আপনার স্ত্রী কন্যা পুত্র আপন ভাইও যদি ইসলামের ক্ষতিকর কাজে লিপ্ত হয় তবে তাকে বেচে থাকার সুযোগ দেবেন না।

কাশগরের শাসক কাদের খান, তার প্রতিবেশী শাসক আবুল মনসুর আরসালান খান এবং তোগা খান আপনার সালতানাত দখল করার জন্যে পায়তারা করছে। ওরা আবারও গৃহযুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে। এরা ইসলামী

খেলাফতকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে দিচ্ছে। খৃষ্টানরা এদেরকে সহযোগিতা করছে। এরা যদি মাথা তুলে এদের মাথা গুড়িয়ে দিন। তবে গুড়িয়ে দেয়ার আগে ওদের এটা বোঝার সুযোগ দেবেন যে তারা ভুলপথে ছিলো।"

* * *

গযনী সালতানাতের মোটামুটি ইতিবৃত্ত হলো, পূর্ব তুর্কিস্তানের শাসক এলিকখান ছোট ছোট রাজ্যগুলোর শাসকদেরকে ঐক্যবদ্ধ করে সুলতান মাহমূদের ক্রমবর্ধমান শক্তিকে বিপর্যস্ত করার অব্যাহত চক্রান্তে লিপ্ত ছিল। (এই সিরিজের প্রথমও দ্বিতীয় খণ্ডে এদের বিরুদ্ধে সুলতান মাহমূদের একাধিক যুদ্ধের কথা বিবৃত হয়েছে।)

ইতোমধ্যে এলিক খানের মৃত্যু হয়েছে। তার স্থলে ক্ষমতাসীন হয়েছে তার ভাই আবুল মনসুর আরসালান খান।

আরসালানকে আল আসমও বলা হতো। আসম অর্থ বধির। সে কানে মোটেও শুনতো না। এজন্য তাকে আসম নামে ডাকা হতো। কাশগরের শাসক ছিল কাদের খান। তার প্রতিবেশী রাজ্যের শাসক ছিল তোগাখান। এগুলো ছিল একেকটি ছোট্ট ছোট্ট সামন্ত রাজ্য। এরা সবাই ছিল বাগদাদের অধীন। তখন বাগদাদের কেন্দ্রীয় খেলাফতের গুরুত্ব অনেকাংশেই কমে গেছে। বাগদাদের খলীফা কাদের বিল্লাহ আব্বাসী নিজেও ছিলেন একজন ক্ষমতালোভী। কাদের বিল্লাহ নিজেই পর্দার অন্তরালে সুলতান মাহমূদের বিরুদ্ধে এসব সামন্ত শাসকদেরকে গৃহযুদ্ধে ইন্ধন যোগাতেন।

* * *

সুলতান মাহমূদ মথুরা ও কন্নৌজ বিজয় শেষে যখন গযনীতে ফিরে এলেন তখন কাদের খান আরসালানের রাজমহলে এসে উপস্থিত হলো। সাথে কাদের খানের তরুণী মেয়ে আকসীও এলো। রাতের বেলায় যখন কাদের খান ও আরসালান খাছ কামরায় একান্ত আলোচনায় মগ্ন তখন কাদের খানের যুবতী

কন্যা আকসী আরসালানের ষোড়শী কন্যা সিমনতাশ রাজ মহল সংলগ্ন বাগানে পায়চারী করছিল।

সুনসান নীরব নিস্তব্ধ রাত। ঝিঁঝি পোকার গুঞ্জন ছাড়া আর কোন আওয়াজ নেই। এই নির্জনতার মধ্যে মৃদুলয়ের একটি মনকাড়া সুর বাতাসে ভেসে আসছিল। সেই মৃদু আওয়াজ ছিল একটি বেহালার সুরলহরী। সেই মনকাড়া সুরের সাথে কারো গুনগুনানীর শব্দও শোনা যাচ্ছিল। বেহালার মৃদু আওয়াজ ও গুনগুনানীর শব্দের মধ্যে এক ছিল মায়াবী আকর্ষণ। যে কাউকে এই বেহালার সুর মুগ্ধ বিমোহিত ও তন্ময় করে দিতে সক্ষম ছিল।

মন মাতানো এই সুরের স্রষ্টা ছিল একজন দৃষ্টিশক্তিহীন বেহালাবাদক। সিমনতাশই এই বেহালাবাদকে বাগানের এক কোণে বসিয়ে রেখেছিল এবং আকসীকে নিয়ে আনমনে বাগানে পায়চারী করছিল। দৃষ্টিহীন বেহালা বাদক প্রায় বছর দেড়েক থেকে আরসালানের রাজ দরবারে অবস্থান করছে। আরসালানের যুবতী কন্যা সিমনতাশ সঙ্গীত খুবই পছন্দ করতো। এক কথায় সে ছিল সঙ্গীতপ্রিয়।

এক দিন দৃষ্টিহীন বেহালাবাদক রাজমহলের কাছে এসে তার বেহালায় সুর তুললো। সিমনতাশ বেহালার সুরে মুগ্ধ হয়ে তাকে রাজমহলে ডেকে পাঠাল। আরসালান দৃষ্টিহীন শিল্পীর কণ্ঠে একটি সঙ্গীত শোনার পরই তাকে রাজ দরবারের শাহী শিল্পী হিসেবে মনোনীত করে ফেললেন।

আবুল মনসুর আরসালান তার কন্যাকে খুবই স্নেহ করতেন এবং তার সঙ্গীত প্রিয়তাকেও তিনি পছন্দ করতেন। এই সুবাদে সিমনতাশ মাঝে মধ্যেই তার পিতার জ্ঞাতসারে রাজদরবারের এই শিল্পীকে তার ঘরে ডেকে পাঠাতো। এ ব্যাপারে সিমনতাশের বাবা আরসালান ছিল খুবই উদার।

"সিমনতাশ! শুনছো, শুনতে পাচ্ছো, কি সুন্দর সুর! সত্যি পাগল করার মতো। উচ্ছ্বাসিত কণ্ঠে সুরের আওয়াজে মুগ্ধ হয়ে সিমনতাশকে বললো আকসী। মনে হচ্ছে, আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি।

"জানো আকসী! যার সুর ও বেহালার বাজনা তোমাকে পাগল করে তুলছে, সেই শিল্পী দৃষ্টিহীন। বান্ধবী কাদের কন্যাকে বললো আরসালান কন্যা। আল্লাহ তার চোখে আলো দেননি কিন্তু কণ্ঠে দুনিয়ার যাদুকরী আওয়াজ

দিয়েছেন। আব্বা অনুমতি দেন না বলে, নয়তো আমি এই শিল্পীকে সুলতান মাহমূদের দরবারে নিয়ে যেতাম।"

"আরে তা কেন? এই শিল্পীকে তুমি সুলতান মাহমূদের দরবারে নিয়ে যেতে চাও কেন? সুলতান মাহমূদের সাথে তোমার কি কাজ?" জিজ্ঞেস করলো আকসী।

"কি আর হবে। এক মুসলমানের সাথে আরেক মুসলমানের যে সম্পর্ক থাকে আমারও তার সাথে একই কাজ। আমি এই দৃষ্টিহীন শিল্পীর সঙ্গীতের মাধ্যমে সুলতান মাহমূদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতাম। তুমি কি শোননি, তিনি হিন্দুস্তানের কতো হিন্দু রাজাকে পরাজিত করেছেন এবং কতো মূর্তি ভেঙেছেন?"

"তাতে তোমার খুশী হওয়ার কি আছে? বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলো আকসী। সুলতান মাহমূদ তো তোমার ও আমার খান্দানের শত্রু সে যেসব হাতি ঘোড়া ঢাল তলোয়ার হিন্দুস্তান থেকে নিয়ে এসেছে, সেসব তো আমার ও তোমার খান্দানের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হবে। মনে হয় তুমি তোমার খান্দানের ইতিহাস জানো না সিমন!"

"আমার বংশের অতীত ইতিহাস সম্পর্কে আমি পূর্ণ অবগত; আমার অতীত সম্পর্কে অবগত বলেই আমি সুলতান মাহমূদের গুণগ্রাহী" বললো সিমনতাশ। তিনি আমাদের শত্রু নন, বরং আমার ও তোমার পরিবার তার শত্রু। সুলতান মাহমূদ ইসলামের পতাকাবাহী। তিনি একজন সফল মূর্তি সংহারী। তুমি হয়তো জানো না তিনি হিন্দুস্তানের কতোজন হিন্দু রাজা মহারাজাকে পরাজিত করে বিজয়ী হয়ে দেশে ফিরে এসেছেন। কিন্তু তিনি সেখানে রাজত্ব করার জন্যে থেকে যাননি।"

"তার এসব যুদ্ধ ও অভিযানতো হিন্দুস্তানের ধন সম্পদ লুট করার জন্যে সিমন! ধন-সম্পদ হাতিয়ে নিতেই সে বারবার হিন্দুস্তানে হানা দেয়। এবার তো সে হাতি বোঝাই করে সোনা দানা নিয়ে এসেছে। সে অগণিত সোনাদানা সাধারণ মানুষ ও তার সৈন্যদের মধ্যে বিলিয়ে দিয়েছে। আর এখন সে আমাদেরকে তার গোলামে পরিণত করার তৎপরতা চালাচ্ছে।

"আরে! আমিতো তার বন্দী হতেও প্রস্তুত।' উচ্ছ্বাসিত কণ্ঠে বললো সিমনতাশ।

"তোমার মধ্যে কোন আত্মমর্যাদাবোধ নেই সিমন! তিরস্কারভরা কণ্ঠে বললো আকসী। তুমি না এলিক খানের ভাতিজী! যে এলিক খান আজীবন সুলতান মাহমূদের বিরুদ্ধে লড়াই করেন। তোমার আব্বা কি এ ব্যাপারে তোমাকে কিছু বলেননি?"

"আমি সবই জানি আকসী। আমার চাচা এলিকখান সুলতান মাহমূদের সাথে প্রতিটি যুদ্ধেই পরাজিত হয়েছেন এবং পালিয়ে জীবন রক্ষা করেছেন। এ ব্যাপারে আমার আব্বার আর কি বলার আছে? আমার আব্বাতো বধির। তিনি তাই শুনতে পান যা তাকে শোনানো হয়।

"তুমি তোমার বাবাকে নির্বোধ মনে করো? বিস্ময়মাখা কণ্ঠে জানতে চাইলো আকসী। মনে হচ্ছে, আল্লাহ তাআলা তোমার মধ্যে শুধু রূপ সৌন্দর্যই দিয়েছেন, আত্মমর্যাবোধ ও জ্ঞানগরিমা দেননি। গযনী ও খোরাসানের মধ্যে তোমার মতো সুন্দরী দ্বিতীয়টি হয়তো নেই। কিন্তু তোমাকে রূপের রানী মনে হলেও জ্ঞান বুদ্ধিতে একেবারে শূন্য মনে হয়।

"আমাকে নির্বোধ বলতেই পারো কিন্তু আমার গৃহ শিক্ষককে তুমি কিছুতেই নির্বোধ বলতে পারবে না। আমার শিক্ষক একজন জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সাগর। তিনি আমাকে আমার খান্দানের ইতিহাস বলেছেন। তিনি আমাকে বলেছেন, বাবার মধ্যে দূরদর্শীতার অভাব আছে। আমি বলেছিলাম এটাতো তার অক্ষমতা যে তিনি শুনতে পান না। আমার শিক্ষক বললেন, শ্রবণশক্তি দুর্বল হওয়াটাই আসল কথা নয়। মূলত যারাই ক্ষমতার মসনদে বসে তারাই বধির হয়ে যায়। তারা মনে করে সবই তারা শোনে; কিন্তু তখন তাদরেকে রূঢ় বাস্তব ঘটনা ও কঠিন সত্য কথাগুলো শোনানো হয় না।....

ক্ষমতাসীনরা মনে করে তারা সবই দেখছেন কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি তাদের দৃষ্টি থেকে আড়াল করে দেয়া হয়। তারা মনে করে তারাই সঠিক চিন্তা করছে, কিন্তু সঠিক বিষয়টি তারা ভাবার অবকাশ পায় না। তাদের মেধা মননে ভিন্ন চিন্তা চাপিয়ে দেয়া হয়।....

আকসী! আমার শিক্ষক একদিন আমাকে বললেন, তোমার চাচা এলিকখান বধির ছিলেন না তিনি ছিলেন যথেষ্ট বিবেক ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি। কিন্তু গযনী জয় করার ভূত তার মাথায় চেপে বসেছিল এবং সুলতান

মাহমূদকে পরাজিত করে বন্দী করার খায়েশ তাকে পেয়ে বসেছিল। ফলে বাস্তব পরিস্থিতি যে কানে শোনার কথা ছিল তার কানে সেই বাস্তব কথা আর কখনো প্রবেশ করেনি। যে বাস্তব দৃশ্য তার দেখার কথাছিল তিনি তা দেখতে পাননি। যে বাস্তবতা তার বোধ-বুদ্ধিতে অনুভব করার কথা ছিল তা তিনি অনুভব করতে পারেননি।

তিনি গযনীকে তার রাজ্যের অধীন করার নেশায় অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। এ ধরনের সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের মিথ্যার আশ্রয় নিতে হয়। ফলে এলিকখানও তার প্রজাদের সাথে মিথ্যাচার শুরু করে দিয়েছিলেন। তিনি নানা মিথ্যা বলে তার প্রতিবেশী শাসকদের প্রভাবিত করতে লাগলেন, মসজিদের খুতবায় মিথ্যা বলতে লাগলেন। কুরআন শরীফ হাতে নিয়ে মিথ্যা বলতে শুরু করলেন। তিনি তার সেনা ও প্রজাদের বলতে লাগলেন, 'সুলতান মাহমূদ একজন লুটেরা। সে তার রাজ্য বিস্তারের জন্যেই এসব লুটতরাজ করে। এলিকখান মিথ্যা শপথ করে নিজের লিপ্সা চরিতার্থ করতে গিয়ে ভ্রাতৃঘাতি লড়াইয়ের সূচনা করলেন। ফলে মুসলমানদের ঐক্য ভেঙে গেল। মুসলিম শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ল। এর বিপরীতে কুফরী শক্তি আরো শক্তিশালী হলো।....

আমার শিক্ষক আমাকে এও বলেছেন, সুলতান মাহমূদ যদি তার সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রতি আগ্রহী হতেন, তাহলে প্রতিবেশী ছোট্ট ছোট্ট রাজ্যগুলো দখল করে নেয়ার মতো সামরিক শক্তি তার সব সময়ই ছিল। তুর্কিস্তানের খানদেরকে তার বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য করানো তার জন্যে মোটেও কঠিন ছিল না। কিন্তু এসবে তার দৃষ্টি ছিল না। সুলতান মাহমূদের দৃষ্টি ছিল অন্যত্র।...

মুহাম্মদ বিন কাসিম ভারতের যে অঞ্চলে ইসলামের আলো ছড়িয়ে দিয়েছিলেন, ভারতের হিন্দু শাসকরা সেইসব এলাকার মুসলমানদের জীবন সংকীর্ণ করে ফেলেছিল এবং মুসলমানদেরকে ইসলাম ও ঈমান নিয়ে বেঁচে থাকার অধিকার কেড়ে নিয়েছিল। ফলে সেই এলাকার মসজিদগুলো ধ্বংস হয়ে মন্দিরের সংখ্যা বেড়ে গিয়েছিল। মুসলমানরা হারিয়ে ফেলেছিল আত্মপরিচয়। সুলতান মাহমূদ একবার আদিষ্ট হলেন—

"তুমি হিন্দুস্তানের নিবনিবু ইসলামের আলোকে প্রজ্জ্বলিত করো।"

জানো আকসী! সুলতান মাহমূদের একজন আত্যাত্মিক গুরু আছেন। তিনি হলেন শায়খ আবুল হাসান কিরখানী। জ্ঞান প্রজ্ঞা দূরদর্শিতায় তিনি এতোটাই প্রাজ্ঞ যে, ভবিষ্যতে কি হতে যাচ্ছে তা তিনি অনেকটা নির্ভুলভাবে অনুমান করতে পারেন। সাধারণ মানুষরা যা কাল্পনাও করে না, তার দেমাগ অবলীলায় সেইসব বিষয় চিন্তা করে। তিনি সময়ের গতি বুঝেন এবং সমাজের পরিবর্তন ও করণীয় সম্পর্কে আগে থেকেই মানুষকে সর্তক করেন। সেই কিরখানী সুলতান মাহমূদকে বলেছেন– " কুফর এবং স্বজাতির গাদ্দারদেরকে সর্বাগ্রে তোমাকে খতম করতে হবে....।

আমার শিক্ষক বলেছেন, যখন ভাই ভাইয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয় তখন তাদের ক্ষতস্থান থেকে ঝড়ে পড়া প্রতি ফোঁটা রক্তে যমীন কেঁপে ওঠে। আসমান কাঁদে এবং আল্লাহর ফেরেশতাগণ কাঁদে।"

"সিমনতাশ! তুমিতো এর আগে কখনো এমন কথা বলোনি। আকসী সিমনতাশের মুখ দু'হাতে চেপে ধরে বললো। এ বয়সে তোমার এসব ভারিক্কি কথাবার্তা শোভা পায় না। তোমার শিক্ষক হয়তো তোমাকে ভুল শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি তো দেখছি এই বয়সেই তোমাকে দরবেশে পরিণত করতে চান। এমন একটি সুন্দর রাতে, এমন সুন্দর সুর লহরীও গানের মধ্যে তুমি কেমন যেন রুক্ষ শুষ্ক হয়ে যাচ্ছো সিমন!"

"হৃদয় যখন আলোয় আলোকিত হয়ে যায় তখন এমনটিই হয়ে থাকে আকসী! আমাকে তুমি রুচিহীন বলছো। আসলে আমি রুচিহীন নই। আমার রুচির জন্যই তো এই দৃষ্টিহীন শিল্পী রাজ দরবারের রাজকীয় শিল্পীতে পরিণত হয়েছে। আমি হৃদয় আলোকিত করার যে কথাগুলো বলেছি, এসবই আমি পেয়েছি আমার শিক্ষকের পাঠ ও এই দৃষ্টিহীনের সঙ্গীত থেকে। আমি সব সময়ই এই শিল্পীর বেহালার তারে ভিন্ন কিছু অনুভব করি। এই শিল্পীর সঙ্গীত সব সময় আমাকে অপার্থিব পয়গাম শোনায়।"

"সঙ্গীত? সঙ্গীতের মধ্যে আবার তুমি কি পয়গাম আবিস্কার করো সিমন?" জানতে চাইলো আকসী।

"সে কথা আমি তোমাকে বলে বোঝাতে পারবো না। তবে তা আমি হৃদয় দিয়ে অনুভব করি।"

দৃষ্টিহীন শিল্পী ধীরলয়ে বেহালা বাজাচ্ছিল এবং কেমন যেন আবেশ জড়ানো সুরে গুণগুণাচ্ছিল। কখনো শিল্পীর কণ্ঠের চেয়ে বেহালার আওয়াজ আবার কখনো বেহালার আওয়াজের চেয়ে শিল্পীর কণ্ঠ উচ্চকিত হচ্ছিল। এক সময় সিমনতাশ ও আকসী পায়চারী করতে করতে দৃষ্টিহীন শিল্পীর কাছে চলে এলো। কিন্তু শিল্পী আপন মনে সঙ্গীত ও বেহালায় মগ্ন ছিল। সে কারো উপস্থিতি মোটেও টের পেলো না।

"তুমি তোমার বাবাকে এ বিষয়টি বোঝাতে পারবে যে, সুলতান মাহমূদ তার সাম্রাজ্য বিস্তারে উৎসাহী নয়? আকসী সিমনতাশকে প্রশ্ন করলো। তোমার আব্বা কি বিশ্বাস করবেন সুলতান মাহমূদের সার্বিক যুদ্ধ উন্মাদনা ইসলামের জন্যে?"

"না, আমি হয়তো তা পারবো না। তাছাড়া আব্বাকে এ ব্যাপারে বোঝানোর প্রয়োজনও আমি বোধ করি না। বললো সিমনতাশ। আব্বা হয়তো সুলতান মাহমূদের বিরোধিতা করেন বটে কিন্তু তিনি হয়তো সুলতান মাহমূদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হবেন না। তিনি শত্রুতা করেন ঠিকই বিরোধিতাও করেন, সেজন্য সুলতানের কোন সহযোগিতাও করবেন না।"

"আমি তোমাকে একটি গোপন কথা বলতে চাই সিমন" বললো আকসী। তোমার আব্বা কিন্তু সুলতান মাহমূদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছেন।"

"তাই না-কি! তাহলে আমি তাকে যুদ্ধ থেকে বিরত রাখবো।" উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বললো সিমনতাশ।

"মাথা ঠিক করো সিমন! কিছুটা উষ্মামাখা কণ্ঠে বললো আকসী। কোন তুর্কি মেয়ের জন্যে এমন আত্মমর্যাদাহীন হওয়া শোভা পায় না। তুমিতো দেখছি মানসিকভাবে গযনীর বাদী হয়ে গেছো।"

হঠাৎ দৃষ্টিহীন শিল্পীর বেহালার আওয়াজ বেতাল হয়ে গেলো যেন কেউ বেহালার তারে প্রচণ্ড আঘাত করেছে। বেহালাটি একটু বেসুরো উঁচু আওয়াজ তুলে স্তব্ধ হয়ে গেলো।

"সুলতান মাহমূদ এখন ভয়ংকর একটি শক্তি। সে যেভাবে হিন্দুস্তানের রাজ্যগুলো দখল করেছে এভাবে তুর্কিস্তানের সবগুলো রাজ্যও দখল করে নেবে। তুমি দেখোনি কি ভাবে খাওয়ারিজম দখল করে নিলো। তুমি কি ভুলে গেছো এখন কে খাওয়ারিজম শাসন করছে? বললো আকসী।

"সুলতান মাহমূদের বিখ্যাত সেনাপতি আলতানতাশ এবং তার ডেপুটি আরসালান জাযেব। জানো এরা গযনীর কসাই। তারা যাকেই গযনীর প্রতিপক্ষ মনে করছে তাকেই হত্যা করেছে।"

"তাহলে আমার ও তোমার আব্বা কি করতে চান?" জানতে চাইলো সিমনতাশ।

"তারা খোরাসানের উপর আক্রমণ করতে চান।" বললো আকসী। সুলতান মাহমূদের কাছে খবর পৌছার আগেই তারা খোরাসানকে কব্জা করে নিবেন। কিন্তু সুলতান মাহমূদ যখন জবাবী আক্রমণ করবেন, তখন সেই আক্রমণ কে প্রতিরোধ করবে?"

"কেন? তোমার আব্বা আবুল মনসুর, আমার আব্বা কাদের খান এবং বুখারার শাসক তোগা খান মাহমূদের মোকাবেলা করবেন। তুমি জানো না, সুলতান মাহমূদের বিরুদ্ধে তুর্কিস্তানের সকল শাসকদের জোটবদ্ধ করা হচ্ছে।" বললো আকসী।

সিমনতাশ হাসতে লাগল, যেন তার হাসি আর শেষ হবে না। তার হাসি ছিল বিদ্রূপাত্মক! দীর্ঘ হাসির পর সিমনতাশ আকসীর উদ্দেশে বলল, কতিপয় টিকটিকি আর নেংটি ইঁদুর মিলে কি সিংহের মোকাবেলা করতে পারে?"

"তোমার এই সিংহের যদি জীবনই না থাকে, তবে কি মোকাবেলা করতে পারবে না?" রহস্যময় কণ্ঠে বললো আকসী।

"জীবনই থাকবে না মানে?" বিস্মিত কণ্ঠে জানতে চাইল সিমনতাশ।

তাকে খোরাসান আক্রমণের আগেই হত্যা করা হবে। কথাটি মুখ ফসকে বলে ফেললো আকসী। সাথে সাথে প্রসঙ্গ পাল্টানোর জন্যে আকসী বললো। তোমার বেহালাবাদকের মনে হয় ঘুম পেয়েছে, নয়তো চলে গেছে। আর তো বেহালার সুর শোনা যাচ্ছে না।'

ঠিক তখনই আবার দৃষ্টিহীন বেহালাবাদকের বেহালার মৃদু সুর বাজতে শুরু করল। সেই সাথে বাদকের অনুচ্চ কণ্ঠের হালকা আমেজের কণ্ঠও কানে ভেসে এলো।

সিমন! তোমার বেহালাবাদক হঠাৎ নীরব হয়ে গিয়েছিল কেন? সে কি আমাদের কথা শোনার জন্যে বাজনা বন্ধ করে দিয়েছিল?"

আকসী! একজন দৃষ্টি প্রতিবন্ধী বেহালাবাদকের ব্যাপারেও তোমার এতো ভয়? বললো সিমনতাশ। এই দৃষ্টিহীন লোকটির বেহালা ছাড়া জগতের আর কোন কিছুর প্রতি কোন আগ্রহ নেই।

আকসী সিমনতাশের হাত ধরে তাকে আরো কিছুটা দূরে নিয়ে গিয়ে বলল, তুমি জানো না সিমন! সুলতান মাহমূদের গোয়েন্দারা সব জায়গায় থাকে। আমার আব্বা তার দরবার থেকে দুই গোয়েন্দাকে পাকড়াও করে জল্লাদের হাতে তুলে দিয়েছেন। আমার তো মনে হয় তোমার আব্বার দরবারেও গযনীর গোয়েন্দা আছে।"

"তা হয়তো থাকতে পারে। কিন্তু দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী একজন জাত বেহালা পাগল কখনো গোয়েন্দা হতে পারে না। কিন্তু তুমি যে বললে সুলতান মাহমূদকে হত্যা করা হবে! কিভাবে কখন তাকে হত্যা করা হবে?"

সম্ভবত আজই এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হবে।' বললো আকসী। সিমন! আমার তো মনে হয় তোমার গৃহ শিক্ষক হয়তো গযনীর গোয়েন্দা। গোয়েন্দা না হলে তুর্কিস্তানের এমন ভয়ংকর শত্রুকে সে ইসলামের পতাকাবাহী বলতে পারতো না। তুমি যদি তোমার আব্বার জীবন বাঁচাতে চাও, তাহলে তোমার গৃহ শিক্ষকের কথা আর বিশ্বাস করো না। এই ধূর্ত বুড়োটা তোমাকে বিভ্রান্ত করছে।"

সুলতান মাহমূদকে হত্যার কথা শুনে সিমনতাশের কণ্ঠণালী যেন শুকিয়ে এলো। সে আর কোন কথাই বলতে পারছিল না। আকসী একের পর এক কথা বলেই যাচ্ছিল এবং আনন্দে ভেঙ্গে পড়ছিল।

দীর্ঘক্ষণ পর অত্যন্ত বিধবস্ত কণ্ঠে সিমনতাশ বললো,

আকসী! আমাদের এখন যাওয়া দরকার। অনেক রাত হয়েছে। তুমি তোমার ঘরে চলে যাও, আমি দৃষ্টিহীন এই লোকটিকে তার ঘরে দিয়ে আসি।"

আরে, তুমি যাবে কেন? কোন চাকরানী কর্মচারীকে বলো ওকে দিয়ে আসুক।

কিন্তু সিমনতাশ আকসীর কথার কোন জবাব না দিয়েই বেহালাবাদকের দিকে অগ্রসর হলো।'

* * *

রাজ প্রাসাদের কাছেই একটি ঘরে থাকতে দেয়া হয়েছিল দৃষ্টিহীন সঙ্গীত শিল্পীকে। সিমনতাশ শিল্পীর হাত ধরে তাকে তার থাকার ঘরে নিয়ে গেল। পথিমধ্যে তাদের মধ্যে কোন কথাই হয়নি। কিন্তু শিল্পীকে ঘরে পৌঁছে দিয়ে সিমনতাশ বের হতে যাচ্ছে তখন শিল্পী সিমনকে থামতে অনুরোধ করে বললো–

আপনি শাহজাদী! আর আমি আপনার এক নগণ্য সেবক।' উদাস কণ্ঠে বললো শিল্পী। যদি কিছু মনে না করেন তাহলে আপনাকে একটি কথা বলতে চাই। আমার এখন এখান থেকে চলে যাওয়া উচিত।"

কেন? তোমার চলে যেতে হবে কেন? প্রশ্ন করলো সিমনতাশ।

কাদের খানের শাহজাদী আমাকে গযনীর গোয়েন্দা বলে সন্দেহ করেছেন। সিমন শাহজাদী......। রাজত্ব শাসন এসব ব্যাপারে আমার বিন্দুমাত্র কোন আগ্রহ নেই। আমার পৃথিবীটাতে শুধু আছে নিকষ অন্ধকার আর আমার এই বেহালার সুর। চোখের অন্ধকারকে আমি বেহালার তারের সাহায্যে আলোকিত করে রাখি।"

না না, আকসী তোমাকে গোয়েন্দা বলেনি। হঠাৎ করে তোমার বেহালা একটু ঝাঝালো আওয়াজ করে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল এবং তুমিও নীরব হয়ে গিয়েছিলে, তাই সে ভেবেছিল তুমি হয়তো আমাদের কথাবার্তা শোনার চেষ্টা করছিলে।

কাদের খানের কন্যার মুখে সুলতান মাহমূদকে হত্যার কথা শোনে আমার হাত কেঁপে ওঠে এবং হাতের আঙ্গুল ....বেহালার তারে আঘাত হানে। ফলে হঠাৎ করে ঝাঝালো আওয়াজে বেহালাটি কর্কশ হয়ে ওঠে। সেই সাথে আমার কণ্ঠও রুদ্ধ হয়ে যায়।"

সুলতান মাহমূদ খুন হলে পৃথিবীতে কি কেয়ামত ঘটে যাবে? এজন্য তোমার হাত কেঁপে উঠবে কেন? জিজ্ঞেস করলো সিমনতাশ।

সুলতান হোক আর সাধারণ সৈনিকই হোক, কারোরই অন্যায় খুনের শিকার হওয়া স্বাভাবিক নয় শাহজাদী! আমি জানি, আপনি সুলতান মাহমূদকে প্রাণাধিক শ্রদ্ধা করেন। সুলতান নিহত হলে আপনি যেমন কষ্ট পাবেন, তদ্রুপ আমিও কষ্ট পাবো শাহজাদী। কারণ, আপনার মতো আমিও সুলতান মাহমূদকে ইসলামের ঝাণ্ডাবাহী মনে করি।"

"সুলতানের প্রতি তোমার সুধারনা তোমার মধ্যেই থাকুক। এ নিয়ে এখানকার কারো সাথে কথা বলো না। দৃষ্টিহীন শিল্পীকে সতর্ক করে দিল সিমনতাশ।

শাহজাদী! কে তাকে হত্যা করবে, কখন হত্যা করবে? উদ্বিগ্নকণ্ঠে জানতে চাইল শিল্পী।

এ বিষয়টি এখনো আমার জানা সম্ভব হয়নি, জবাব দিল সিমনতাশ। ঠিক আছে। আমি এখন যাই, তুমি বিশ্রাম করো।"

আর একটু সময় থাকো শাহজাদী! তুমি আমাকে রেখে গেলেই আমি আরাম করতে পারবো না। একথা শোনার পর আমার পক্ষে আর ঘুমানো সম্ভব হবে না।

"না ঘুমিয়ে দুশ্চিন্তা করে কি হবে? তার কি কোন উপকার করা তোমার পক্ষে সম্ভব? বললো সিমনতাশ। তোমার পক্ষে তো আর এই গৃহ যুদ্ধ বন্ধ করা সম্ভব নয়, তুমি তো সুলতানকে খুনীদের হাত থেকে বাচাতে পারবে না।"

আপনি যদি আমাকে এ ব্যাপারে তথ্য দিতে পারেন, তাহলে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হওয়ার আগেই আমি গযনী গিয়ে সুলতানকে আগেভাগেই সতর্ক করবো।"

তুমি আসলেই একজন আবেগী মানুষ। দৃষ্টিহীন শিল্পীর কথায় হেসে ফেললে সিমনতাশ। তুমি তো দেখতে পাও না। এতদূর গযনীর পথ তুমি কি করে যাবে?"

পড়েমরে এক ভাবে চলে যাবো শাহজাদী। তাও যদি না পারি, তবে এই এলাকায় আমার কিছু শিষ্য আছে তাদের কাউকে পাঠিয়ে দেবো।"

তুমি কি এ ব্যাপারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ? তুমি যা বলছো তা কি তুমি করে দেখাতে পারবে? একটু দৃঢ় কণ্ঠে শিল্পীকে জিজ্ঞেস করলো সিমনতাশ।

আপনি আসল কথাটি আমাকে বলেই দেখুন না শাহজাদী। বাকীটা আমি আপনাকে করে দেখিয়ে দেবো। শাহজাদী! সুলতান মাহমূদ সম্পর্কে আপনার বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার কথা জানার পরই কেবল আমি শ্রদ্ধা ও আস্থার কথা বলেছি।

আমাদের মধ্যে যে সব কথাবার্তা হয়েছে, তা যেন কেউ জানতে না পারে। শিল্পীকে সতর্ক করে দিল সিমনতাশ।

* * *

দৃষ্টিহীন বেহালাবাদকের ঘর থেকে বেরিয়ে নিজের ঘরে প্রবেশ করতে করতে সিমন তার মাকে ডাকল, মা! মা! আব্বা কি আমাদের বংশের অপমৃত্যুর ধারাটাকেই তাজা রাখতে চায়?"

কি হয়েছে বেটি?"

মা! তুমি কি জানো না, কাশগরের খান এখানে কি জন্যে এসেছে?

খোরাসানের উপর আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছে শত্রুবাহিনী। এজন্য কাদের খান আব্বাকে চাচা এলিকখানের পথেই চালিত করতে এসেছে। অথচ চাচার মৃত্যুর দুঃখটা এখনো দগদগে ঘায়ের মতোই আমাদের পীড়া দিচ্ছে। মা! তুমি কি আব্বাকে এ পথ থেকে ফেরাতে পারবে?"

মা মেয়ের মধ্যে যখন এসব কথাবার্তা হচ্ছিল ঠিক সেই সময় আবুল মনসুর আরসালান খান দরজা ঠেলে সেই ঘরে প্রবেশ করলেন। মা মেয়ে দু'জনই উঁচু আওয়াজে কথাবার্তা বলছিল। ফলে তা শুনতে পেয়ে আরসালান খান চোখ বড় বড় করে মা মেয়ের দিকে তাকাল।

আরসালান খানকে প্রবেশ করতে দেখে সিমনতাশের মা ঘরের দরজা বন্ধ করে দিলেন।

মনে হচ্ছে তোমরা কোন জটিল বিষয়ে কথাবার্তা বলছিলে? স্ত্রীর কাছে জানতে চাইলো আরসালান খান। সিমনতাশের মা স্বামীর কানে মুখ লাগিয়ে বললেন, "আপনি শুধু আমাদের বাহ্যিক চেহারা দেখতে পাচ্ছেন, আপনি যদি আমাদের মনের ভেতরের দৃশ্য দেখতে পেতেন, তাহলে সেখানে আপনার নজরে পড়তো ইসলামের নিবেদিত প্রাণ সৈন্যদের ক্ষতবিক্ষত লাশ, আপনি দেখতে পেতেন ইসলামের পতাকা কিভাবে রক্তে রঞ্জিত হচ্ছে। আপনি আমাদের চোখের অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখুন, সেখানে আপনি দেখতে পাবেন একই ধর্মের অনুসারী একই আল্লাহর ও একই রসূল সা.-এর কলেমা পাঠকারী মানুষ একে অন্যের রক্তে কিভাবে হোলি খেলছে।'

"চুপ করো। রাজকীয় কর্মকাণ্ড নিয়ে তোমাদের মাথা ঘামানোর দরকার নেই। গর্জে উঠলেন আবুল মনসুর। আমি কি করবো না করবো, এ ব্যাপারে দখলদারী করার দুঃসাহস তোমরা কোত্থেকে পেলে?"

"হ্যাঁ, এখন আমি কিছু বললেই দুঃসাহস হয়ে যায়। আর যখন আমার দেহে তাজা রূপ-যৌবন ছিলো, তখন শত মন্দকথা বললেও তা দুঃসাহস হতো না। ঝাঝালো কণ্ঠে বললেন সিমনতাশের মা। এখন তো আর আমাকে প্রয়োজন নেই। পাঁচ পাঁচটি সুন্দরী যুবতী আপনাকে সব সময় ঘিরে থাকে। এজন্যই আল্লাহ আপনার কান বধির করে দিয়েছেন, চোখেও টুপি এটে দিয়েছে। মাথাটাও ওই ছুকড়িরা দখল করে নিয়েছে। এখন আর আপনার পক্ষে নিজের বুদ্ধিতে কোন কিছু চিন্তা করা সম্ভব হয় না। আপনি কি কখনো ভেবেছেন, যে দুই ছুকড়িকে তুহ্‌ফা হিসেবে আপনার কাছে পাঠানো হয়েছে, কি উদ্দেশে কেন এদের এখানে পাঠানো হয়েছে?

"সে যাই হোক। তোমাকে আমি যে অধিকার ও সুবিধা দিয়েছি, তা আমি আর কাউকে দেইনি। বললেন আবুল মনসুর। তুমি জানো না বেগম! আমরা সুলতান মাহমূদকে জানতে দিচ্ছি না, আমরা শক্তি সঞ্চয় করছি এবং ধীরে ধীরে একটি সম্মিলিত বাহিনী তৈরীর চেষ্টা করছি। মাহমূদ এটা জানতে পারলে খাওয়ারিজমের মতো আমাদেরকেও গিলে ফেলতে চাইবে। তুমি জানো না বেগম! সুলতান মাহমূদ এখন কতো বিপুল শক্তির অধিকারী।"

"আব্বু আপনাকে একথা কে বলেছে যে সুলতান মাহমূদ আপনার রাজ্য গিলে ফেলার জন্যে শক্তিশালী হয়েছে? বাবার কানে মুখ লাগিয়ে উচ্চ আওয়াজে বললো সিমনতাশ। এই ধারণা হয়তো আপনাকে তুর্কিস্তানীরা দিয়েছে। তুর্কিরা আপনাকে দাবার ঘুটির মতো ব্যবহার করছে।"

"ও কথা বলো না বেটি! কাদের খানের প্রতি আমার বিশ্বাস আছে। সে যা বলে ভেবে চিন্তে খোঁজ খবর নিয়েই বলে। লোকটিকে আমার বিশ্বস্ত মনে হয়।'

"বিশ্বস্ত তো মনে হবেই। কারণ আপনার কাছে তার বিশ্বস্ততা প্রমাণ করতে সে তার যুবতী কন্যাকে সাথে করে নিয়ে এসেছে। শ্লেষাত্মক ভঙিতে বললেন সিমনের মা। ওই ছুকড়ি যেভাবে সেজেগুজে হাতমুখ নাড়িয়ে আপনার গায়ের সাথে গা মিশিয়ে কথা বলছিল, তার সবই আমি দেখেছি। একটা খেমটা মাথাড়ির আহলাদের জন্যে আপনি কি গোটা সেনাবাহিনীকে গযনী বাহিনীর হাতে জবাই করে ফেলতে চান?"

"আব্বু! রক্ষয়ী এই গৃহ যুদ্ধের এ পথে ক্ষতি ছাড়া আর কি পেয়েছি আমরা? চাচা এলিকখান গৃহযুদ্ধে জড়িয়ে পালিয়ে পালিয়ে আতংক নিয়ে রাজ্য শাসন করেছেন। চাচীতো বলেছেন, চাচাকে পরাজিত করার পরও সুলতান মাহমূদ তার রাজ্য দখল করেননি।" বললো সিমনতাশ।

মা ও মেয়ে দু'জন আবুল মনসুরের দু'কানে মুখ লাগিয়ে উচ্চ আওয়াজে আবুল মনসুরকে বোঝাতে চেষ্টা করলো, তিনি যেন কিছুতেই কাদের খানের প্ররোচনায় পা না দেন। আবুল মনসুর তাদরেকে যুক্তি দিয়ে বুঝাতে চেষ্টা করলেন; কিন্তু মা ও মেয়ের যুক্তির কাছে আবুল মনসুরের যুক্তি টিকতে পারছিল না।

এক পর্যায়ে আবুল মনসুর আল্লাহর দোহাই দিয়ে বললেন, আল্লাহর কসম! তোমরা আমার কথা শোন। আমি চতুর্দিক থেকে অবরুদ্ধ গেছি। একদিকে সুলতান মাহমূদ আর এক দিকে কাদের খান ও তোগা খান। আমি যদি এদের কথা না শুনি তাহলে এরা আমার ক্ষতি করবে, আর যদি এদের কথা শুনি তাহলে আমাকে সুলতান মাহমূদের শত্রুতা মেনে নিতে হয়।"

"সুলতান মাহমূদের সাথে আপনার শত্রুতার দরকার কি? আপনি তার সাথে দোস্তি করে ফেলুন, তাহলেই তো সমস্যা দূর হয়ে যায়। বললেন সিমনের মা।

" মাহমূদ আমাদের খান্দানের শত্রু। বংশের চিহ্নিত শত্রুকে আমি দোস্ত বানাতে পারি না।.....হঠাৎ ক্ষেপে উঠলেন আবুল মনসুর। ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললেন– "তোমরা জেনে রাখো, আমার খান্দানকে অপদস্থ করার প্রতিশোধ আমি অবশ্যই মাহমূদের কাছ থেকে নেবো।......এখন আর আমার পক্ষে পিছিয়ে আসা সম্ভব নয়। আমরা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি। আমাদের পরিকল্পনা চূড়ান্ত।"

"এই চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের মধ্যে কি সুলতান মাহমূদকে হত্যার পরিকল্পনাও আছে আব্বু? প্রশ্ন করলো সিমন। ঠিক এ সময় মা মেয়ে একজন অপরজন দিকে তাকিয়ে চোখ টিপে দিয়ে ক্ষীণ আওয়াজে সিমন তার মাকে বললো–

মা, তুমি ভাবভঙ্গি বদল করে আব্বুর কাছ থেকে তাদের পরিকল্পনা জানার চেষ্টা করো।'

'মেয়ের কথায় তার মা ভাবভঙ্গি সম্পূর্ণ বদলে ফলে বললো– আপনি যদি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন, তাহলে আর সেটি পরিবর্তনের কথা আমরা বলবো না। বরং আপনি পরিকল্পনামতো এগিয়ে যান। আমরা আপনাকে সাহস যোগাবো।'

কি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আপনারা? আমাদেরকেও বলুন। যাতে আমরাও আপনাকে সহযোগিতা করতে পারি।' মা ও মেয়ের কৌশলে আটকে গেলেন আবুল মনসুর। তিনি কিছুটা আবেগপ্রবণ হয়ে পড়লেন এবং কাদের খান তোগা খান এবং তার সম্মিলিত বাহিনীর যুদ্ধ পরিকল্পনা এবং যুদ্ধের আগেই সুলতান মাহমূদকে হত্যার চক্রান্তের কথা সবিস্তারে বলে দিলেন।

* * *

পরদিন কাদের খান যখন আবুল মনসুরের রাজমহল থেকে সুলতানের বিরুদ্ধে চক্রান্তের নীল নক্সা শেষে বিদায় নিচ্ছিলেন, তখন সিমনতাশ দৃষ্টিহীন সঙ্গীত শিল্পীকে তার ঘরে ডেকে এনে বললো– "তুমি বলেছিলে, আমি যদি সুলতানের বিরুদ্ধে সংগঠিত চক্রান্তের ব্যাপারে তোমাকে জানাতে পারি তাহলে তুমি এ খবর নিয়ে গযনী চলে যেতে পারবে। আমার জিজ্ঞাসা হলো, এ ব্যাপারে কিসের ভিত্তিতে আমি তোমার উপর ভরসা করবো? কে যাবে গযনী খবর নিয়ে?"

"আসলে আমার কাছে এমন কোন ব্যবস্থা নেই যা দিয়ে আমি আপনার কাছে আমার বিশ্বস্ততা প্রমাণ করতে পারবো।' জবাব দিলো দৃষ্টিহীন শিল্পী। তবে আমি যা বিশ্বাস করি আপনিও যদি তা-ই বিশ্বাস করেন, তাহলে আপনার উচিত আমার উপর আস্থা রাখা।

"বার্তা নিয়ে গযনী কে যাবে? সে কথা দয়া করে আপনি জানতে চাইবেন না। আপনি শুধু একটি ঘোড়া সংগ্রহ করে দেবেন এবং সেই ঘোড়ার লাগাম আমার হাতে তুলে দেবেন। আমি কিছু দিন আপনার দৃষ্টির আড়ালে চলে যাবো, কিছু দিন পর আবার আপনার কাছেই ফিরে আসবো।'

'কুরআন শরীফ নিয়ে তাতে চুমু দিয়ে দৃষ্টিহীন শিল্পীর হাতে তুলে দিয়ে সিমনতাশ বললো- "এটি জগতের সবচেয়ে পবিত্র কিতাব কুরআন। এটি হাতে নিয়ে শপথ করো, তুমি প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবে।"

"না শাহজাদী! কসম করা ঠিক হবে না' বললো শিল্পী। কসম করলেই অন্তর আয়নার মতো পরিষ্কার হয়ে যায় না। দেখা যায়, বেঈমান মোনাফেক লোকেরাই বেশী কসম করে। আপনার দেয়া এই কুরআন শরীফ আমার সাথে থাকবে। আমার এটির দরকার আছে। ফিরে এসে এটি আপপনাকে ফেরত দেবো।......কবে নাগাদ আমার লোক পাঠাতে হবে? শাহজাদী?"

"আজই! আজই তোমার লোককে পাঠানোর ব্যবস্থা করতে হবে। তোমার লোক কি আজ রওয়ানা হতে পারবে? জানতে চাইলো সিমনতাশ।

"তা পারবে। বললো অন্ধ শিল্পী। কিন্তু আপনাকে ঘোড়ার ব্যবস্থা করতে হবে এবং বলতে হবে পয়গাম কি?"

"মনোযোগ দিয়ে শোন।" বললো সিমন।

'তোমার লোককে সুলতানের সাথে সাক্ষাত করে বলতে হবে, কাদের খান, তোগা খান ও আবুল মনসুর মিলে শীঘ্রই খোরাসানে আক্রমণ চালাবে এবং আপনাকে গোপনে হত্যা করাবে। সুলতানকে একথাও বলতে হবে, এক শাসক কন্যা তার বাবার বিরুদ্ধে গিয়ে আপনার সহযোগী হিসেবে এই ঝুঁকিপূর্ণ পথে নেমেছে। তিনি যেন আমার প্রতি বিন্দুমাত্র সংশয় না করেন বরং বিদ্রোহী এই কন্যাকে ইসলামের এক নগণ্য সেবিকা মনে করেন।

সেই সাথে সুলতান যেন আমাকে নিজের সন্তানের মতোই মনে করেন। সুলতানকে বলতে চাই, আমি জানি এরা তিনজন সম্মিলিতভাবেও আপনাকে কাবু করতে পারবে না, সুলতান হয়তো এক আক্রমণেই এদের সবাইকে ধরাশায়ী করতে সক্ষম হবেন। কিন্তু তাতেও তো প্রচুর রক্তক্ষয় হবে, জীবন হানি ঘটবে।

গযনী, খোরাসান, খাওয়ারিজম, বলখ, বুখারার সেই মায়েরা ভ্রাতৃঘাতি সংঘাতে যুবক সন্তানদের মৃত্যু দেখে আজো পর্যন্ত কাঁদে। সন্তান হারা মায়েরা নিজ সন্তানকে হারিয়ে যেভাবে কান্না করে, তাদের দীর্ঘশ্বাসে আজো আকাশ

বাতাস কেঁপে ওঠে.....। সুলতানকে আরো বলতে হবে, আমার পিতা আবুল মনসুর কাদের খান ও তোগা খানকে ভয় করে। সুলতান নিজে থেকে মৈত্রীর পয়গাম পাঠিয়ে আমার বাবার অন্তর থেকে এই আতংক দূর করতে পারেন। আমার এই আহ্বানকে নিজ কন্যার আবেদন মনে করে অগণিত যোদ্ধাকে ভ্রাতৃঘাতি লড়াইয়ে নিহত হওয়া থেকে সুলতান বাঁচাতে পারেন।...

আমার বাবার মৃত্যুতে নিজের এতীম হয়ে যাওয়ার জন্যে আমার কোন দুঃখ নেই। আমার মায়ের বৈধব্যতেও আমি বিন্দুমাত্র পরিতাপ করবো না। আমার শত দুঃখ ও অনুতাপ শুধু সে কারণে যাদের জীবন দেয়ার কথা ছিল কুফরী শক্তির বিরুদ্ধে তারা ভ্রাতৃঘাতি লড়াইয়ে অর্থহীন ভাবে জীবন দিচ্ছে। পক্ষান্তরে তাতে কুফরী শক্তি আরো শক্তিশালী হচ্ছে।”

“তুমি কি আমার সব কথা মনে রাখতে পারবে শিল্পী? আমি তোমাকে যেভাবে বললাম তুমি কি সেভাবে গযনীর সুলতানকে বলতে পারবে? বললো সিমনতাশ।

“জী হ্যাঁ। আপনি যেভাবে বলেছেন, আমি ঠিক সেভাবেই বলবো এবং সেইভাবেই বার্তা সুলতানের কাছে পৌছে যাবে। সিমনতাশকে আশ্বস্ত করতে বললো শিল্পী।

“আমি আস্থা রাখতে পারছি না। তুমি একজন জাত শিল্পী। গঙ্গীত নিয়ে তুমি সারাক্ষণ ডুবে থাকো। তুমি আমার আবেগ ও অনুভূতি অনুভব করতে পারবে কিনা তাই আমি ভাবছি। নিজের ভাবনায় ডুবে থাকা কোন লোক জগতের অন্য কিছু বুঝে উঠতে পারে না। তোমার পক্ষে বোঝা কঠিন, ক্ষমতার মোহে কিভাবে শাসকরা সাধারণ মানুষের মধ্যে ধর্মীয় উত্তেজনা সৃষ্টি করে হানাহানিতে লিপ্ত করে। অথচ এর নেপথ্যে থাকে শুধুই শাসকদের ক্ষমতার লোভ।

‘সিমন শাহজাদী! এখন সাহিত্য করার সময় নয়। অর্থহীন সংশয় ঝেড়ে ফেলে আমাকে বলুন সুলতানের কাছে কি বার্তা পৌছাতে হবে? আমাকে এতোটা নির্বোধ মনে করবেন না শাহজাদী! আমি সব কিছুই বুঝি এবং সব কিছুই অন্যকে বোঝাতে পারি।’

"ঠিক আছে শিল্পী। তুমি চলে যাও। সুলতানকে গিয়ে বলো, তিনি যেন আমার আব্বার কাছে মৈত্রীর পয়গাম পাঠান এবং গযনী বাহিনী যেন তার বেচে থাকাকে নিশ্চিত করে।

* * *

কিছুক্ষণ পর শহর থেকে একটি ঘোড়া বের হলো। ঘোড়াটির লাগাম ধরে আছে একজন দৃষ্টিহীন লোক। লোকটির এক হাতে ঘোড়ার লাগাম অন্য হাতে একটি লাঠি। তার কাঁধে ধনুক ঝুলানো থলের মধ্যে তীরের ফলা। তার ঘোড়াটি পূর্ণ যুদ্ধ সাজে সজ্জিত। লোকটিকে খুব কম লোকেই চেনে। যারা তাকে চিনে ঘোড়ার লাগাম ধরে যুদ্ধ সাজে কাধে তীর ধুনুক নিয়ে তাকে হাঁটতে দেখে তারা হাসছে।

এই ঘোড়াওয়ালা আর কেউ নয় রাজ দরবারের বেহালাবাদক। সে এই অবস্থায় শহরের প্রধান গেট পেরিয়ে গেল। বেহালা বাদক ঘোড়াকে টেনে নিয়ে গেল কিছুদূর। তারপর শহর থেকে কিছুটা দূরে গিয়ে সে ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হলো। আরো কিছুদূর অগ্রসর হয়ে সে হাতের লাঠিটি ফেলে দিয়ে ঘোড়াকে তাড়া করলো। কিন্তু খুব দ্রুত সে ঘোড়াকে দৌড়াতে দিল না। নিজের আত্মবলের উপর নির্ভর করে দৃষ্টিহীন শিল্পী অশ্বারোহন করার দুঃসাহস করলো। অবশ্য ঘোড়াটি তাকে নিয়ে ঠিক পথেই অগ্রসর হতে লাগল।

পনেরো ষোল মাইল পর দেখা দিল ঘনবন। এই বনে সাধারণত শাহী দরবারের লোকেরা শিকার করতে আসে। জঙ্গলকীর্ণ এই জায়গাটি বহু উচু নীচু টিলা ও খানা খন্দকে রয়েছে। এলাকাটিতে হরিণের খুব বিচরণ। সাধারণত হরিণ শিকারের জন্যেই এলাকাটি বিখ্যাত।

এখানকার হরিণগুলো বেশ বড় এবং স্বাস্থ্যবান হয়ে থাকে। হঠাৎ করে দৃষ্টিহীন শিল্পীর ঘোড়ার সামনে দিয়ে একটি আহত হরিণ পালাচ্ছিল। হরিণটির গায়ে দু'টি তীর বিদ্ধ। শিল্পী আহত হরিণের পিছু ধাওয়া করল। হরিণটি আহত হওয়ায় বেশী দৌড়াতে পারছিল না। শিল্পীর ঘোড়া হরিণের কাছাকাছি পৌছতেই তীরদান থেকে একটি তীর নিয়ে ধনুকে ভরে ছুড়তেই হরিণটির পেছনের পায়ে নিক্ষিপ্ত তীর আঘাত হানল। এবার আর হরিণটি দৌড়াতে পারল না। একটি লাফ দিয়ে মাটিতে পড়ে গেল।

আহত হরিণটিকে ধাওয়া করছিল একদল শিকারী। কিন্তু তারা ছিল হরিণ থেকে অনেক দূরে। শিল্পী যখন তীর বিদ্ধ করে হরিণের গতি থামিয়ে দিয়ে হরিণের কাছে গিয়ে থামল ততোক্ষণে হরিণের পিছু ধাওয়াকারী শিকারী দল শিল্পী ও হরিণের কাছে পৌঁছে গেল। দৃষ্টিহীন শিল্পী হরিণের পিছু ধাওয়াকারী শিকারী দলটিকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে বললো–

"আমি আপনাদের থেকে পালিয়ে আসা হরিণটিকে ফেলে দিয়েছি।' একথা তার মুখে উচ্চারিত হলো বটে কিন্তু শিকারী দলকে দেখে মনে মনে সে ঘাবড়ে গেল। কারণ, সে শিকারী দলটিকে চিনে ফেলেছিলো।

শিকারী দলের লোকজনও দৃষ্টিহীন লোকটিকে দেখে বিস্মিত হলো। কারণ, শিকারী দলের দলপতি ছিল কাদের খান। তার পিছনের ঘোড়াতেই সওয়ার ছিল কাদেরখানের সফর সঙ্গী কন্যা আকসী। আর অন্যেরা ছিল কাদের খানের উপদেষ্টা আর নিরাপত্তারক্ষী। কাদের খান যে দিন আবুল মনসুরের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে পথিমধ্যে হরিণ শিকারে মেতে ওঠেছিল সেই দিনই দৃষ্টিহীন শিল্পী আবুল মনসুরের কন্যার সহযোগিতায় সুলতানকে হত্যার চক্রান্তের খবর নিয়ে রওয়ানা হয়েছিল।

কাদের খান প্রথমে হরিণের গায়ে একটি তীর বিদ্ধ করে আর দ্বিতীয় তীরটি বিদ্ধ করে তার মেয়ে আকসী। কিন্তু দু'টি তীর বিদ্ধ হওয়ার পরও হরিণ ছুটে পালাতে সক্ষম হয় কিন্তু ঘটনাক্রমে আহত হরিণটি; অন্ধ বেহোলা বাদকের সামনে পড়ে যাওয়ায় সে চূড়ান্ত আঘাত হানে এবং একটি তীর বিদ্ধ করতেই হরিণটি মাটিতে লুটিয়ে পড়তে বাধ্য হয়।

শিল্পীকে দেখে কাদের খান বলে বসলেন, "আরে তুমি কি সেই দৃষ্টিহীন সঙ্গীত শিল্পী না? যে আবুল মনসুরের রাজ প্রাসাদে আমাদের মন কাড়া সঙ্গীত শুনিয়েছিলে?"

শিল্পীর তবলা তার ঘোড়ার জিনের সাথেই বাধা ছিল। আকসী তার ঘোড়া শিল্পীর ঘোড়ার কাছে নিয়ে তবলার বাধা পুটলাটা খুলতে শুরু করল। পরিস্থিতির আকস্মিকতায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেল শিল্পী। কারণ এতোক্ষণে পুটলা খোলে তার তবলা বেহালা আকসী বের করে ফেলেছে। এখন আর এদের কাছে বিষয়টি অস্বীকার করার কোন উপায় নেই যে, সে সেই দৃষ্টিহীন সঙ্গীত শিল্পী নয়।

আব্বু! আমার শুরু থেকেই লোকটিকে সন্দেহ হচ্ছিল সে নিশ্চয়ই গোয়েন্দা হবে। নয়তো কোন দৃষ্টিহীন লোকের পক্ষে কি হরিণকে তীর বিদ্ধ করা সম্ভব?" বললো আকসী।

কাদের খান তরবারী বের করার নির্দেশের কণ্ঠে বললেন, 'বাঁচতে চাও তো তোমার আসল পরিচয় বলো।'

কাদের খানের নিরাপত্তারক্ষীরা সঙ্গীত শিল্পীকে চতুর্দিকে ঘেরাও করতে চাচ্ছিল ঠিক সেই সময় অগ্রপশ্চাৎ চিন্তা না করে শিল্পী তার ঘোড়ার জিন টেনে ঘোড়াকে সজোরে তাড়া করল। ঘোড়াটি ছিল প্রশিক্ষিত সেনাবাহিনীর ঘোড়া। ইঙ্গিত পেতেই ঘোড়া উর্ধশ্বাসে ছুটতে শুরু করল। তাদের সন্দেহভাজন এক শিকারীকে পালাতে দেখে কাদের খান তার নিরাপত্তা রক্ষীদের বলল 'ওকে পাকড়াও করো।'

কাদের খানের নিরাপত্তা রক্ষীরা ঘোড়ার বাগ শামলিয়ে শিল্পীর পিছু ধাওয়া করতে করতে সে অনেক দূর চলে গেল। প্রাণপণ চেষ্টা করেও কাদের খানের নিরাপত্তারক্ষীরা আর শিল্পীর নাগাল পেল না।

শিল্পী আসলে ছিল একজন দক্ষ অশ্বারোহী। সে তার ঘোড়ার গতি শিথিল হতে দিলো না। ঘোড়া উর্ধশ্বাসে লাফিয়ে লাফিয়ে উড়ে চললো। অনেক দূর গিয়ে শিল্পী পেছনের দিকে তাকিয়ে দেখলো তাকে ধাওয়াকারীরা অনেক পেছনে। ধাওয়াকারীরা এক পর্যায়ে হতাশ হয়ে পিছু ধাওয়া ত্যাগ করে ফিরে যেতে শুরু করল।

* * *

দিনের শেষ প্রহরে আবুল মনসুর খবর পেলেন যে, কাদের খান সকালে তার দলবল সহ বিদায় নিয়ে ছিল সে একটি হরিণ শিকার করে আবার ফেরত এসেছেন। কাদের খানের ফেরত আসার খবর শুনে সে দৌড়ে প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে এলেন। দেখা মাত্রই কাদের খান অভিযোগ করলেন, তোমার দরবারে যে অন্ধ সঙ্গীত শিল্পী ছিল সে আসলে অন্ধ ছিল না, সে পূর্ণ দৃষ্টিশক্তির অধিকারী। আজ সকালেই সে এখান থেকে পালিয়ে গেছে।

'সে নিশ্চয়ই সুলতান মাহমূদের গোয়েন্দা হবে। সে হয়তো আমাদের গত রাতের কথাবার্তা শুনে থাকবে।

আমরা যে ঘরে কথা বলেছি এর ধারে কাছেও ছিল না। আমাদের কথা কিভাবে শুনবে। যাই হোক, কিভাবে এ খবর তার কাছে গেল সেটি জানার চেষ্টা করবো। সে গত রাতে কোথায় ছিল সেটিও খুঁজে বের করবো।

"বেশী খোঁজার দরকার নেই চাচা! আমার দৃঢ় বিশ্বাস আপনার মেয়ে সিমনতাশই তাকে সব বলেছে। বললো কাদের খানের মেয়ে আকসী। কারণ, তার সাথে আমি কথা বলে দেখেছি সে সুলতান মাহমূদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল। তাছাড়া আপনার বুড়ো গৃহ শিক্ষকের প্রতিও আমার সন্দেহ হয়। লোকটি নিশ্চয়ই নিমকহারাম।

ঘটনার আকস্মিকতায় আবুল মনসুর বিব্রতকর অবস্থার মধ্যে পড়ে গেলেন। তিনি জানেন, তার কন্যা সিমনতাশ সুলতান মাহমূদকে খুবই ভালোবাসে, সে সুলতান মাহমূদের বিরুদ্ধে তার পিতা ও সহযোগীদের যুদ্ধ প্রস্তুতির ঘোর বিরোধী! অবশ্য গৃহ শিক্ষকের ব্যাপারে তার এমন কোন ধারনা ছিল না।

কিন্তু কাদের খান ও কাদের খানের মেয়ে আকসী আবুল মনসুরের উপর চাপ সৃষ্টি করল যে, সে যেন তাদের উপস্থিতিতেই তার মেয়ে ও গৃহ শিক্ষকের বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়। কিন্তু আবুল মনসুর তার মেয়েকে প্রাণাধিক ভালোবাসতেন। তিনি মেয়ের বিরুদ্ধে কোন প্রকার শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে মোটেও প্রস্তুত ছিলেন না। তবুও তাদের উভয়কেই ডেকে পাঠানো হলো। সিমনতাশকে যখন জানানো হলো, তার প্রিয় সঙ্গীত শিল্পী প্রকৃতপক্ষে অন্ধ ছিল না। একথা শুনে সিমনতাশের বিস্ময়ের অবধি রইল না। সে একথা কিছুতেই বিশ্বাস করছিল না।

আমি একথা বিশ্বাস করি না। আমি বিশ্বাস করি না শিল্পী অন্ধ নয় চক্ষুষ্মান।

এ ক্ষেত্রে আর বেশী কিছু করার নেই ভেবে কাদের খান বৃদ্ধ গৃহ শিক্ষককে বললেন, শোন গুরুজী- "তুমি যার নিমক খাচ্ছো, আড়ালে আবডালে তার গাদ্দারী করছো। তুমি যদি বলো, ওই বেহালা বাদক এখান

থেকে কি খবর নিয়ে পালিয়েছে, তা হলে আমরা তোমাকে ক্ষমা করে দেবো। নয়তো তোমাকে খুবই কঠিন মৃত্যুর মুখোমুখি হতে হবে।"

কাদের খানের এই হুমকিমূলক বাক্য শুনে সিমনতাশ তার সামনে দাঁড়িয়ে বললো–

"খবরদার! আমার গুরুজী সম্পর্কে এখানে যদি আর একটি অবমাননাকর শব্দ উচ্চারিত হয় তবে আমি বলতে পারি না এখানে কি পরিস্থিতির উদ্ভব হবে। আপনারা জেনে রাখুন, আমরা কাশগড়ের কেনা গোলাম নই।"

"গুরুজী হাতে সিমনতাশকে সরিয়ে দিয়ে কাদের খানের উদ্দেশ্যে বললেন–

"সামান্য এক টুকরো এলাকার রাজত্ব তোমাকে খোদায় পরিণত করেনি কাদের খান! আমি সুলতান মাহমূদের সহযোগী নই, আমি সত্যের পূজারী। আমি সঙ্গীত শিল্পীকে শুরু থেকে অন্ধ ভেবেই আসছি, এখনো অন্ধই মনে করি। সেই সাথে তোমাদেরকেও আমি দৃষ্টি প্রতিবন্ধী মনে করি। ওই দৃষ্টিহীন লোকটি যদি গযনী সুলতানের গোয়েন্দা হয়ে থাকে তবে সে দৃষ্টি অন্ধ ছিল কিন্তু তার অন্তর অন্ধ ছিল না। তার হৃদয়-অন্তর ছিল আলোকিত। আমি ওর সম্পর্কে কিছুই জানি না। কি খবর নিয়ে সে এখান থেকে চলে গেছে তাও আমি জানি না, তবে এটা বলতে পারি যদি সে কোন খবর নিয়েই গিয়ে থাকে তবে সে একজন পাক্কা মুসলমান।

কাদের খান আবুল মনসুরের কানের কাছে মুখ নিয়ে উচ্চ আওয়াজে বললো, 'এই বুড়োটাকে জেলখানায় পাঠিয়ে দিন। এই বুড়ো ভেতরে ভেতরে আমাদের শিকড় কাটছে।'

কাদের খানের কথা শুনে আবুল মনসুর গুরুজীর দিকে তাকালেন। পারিবারিক শিক্ষক গুরুজীর দিকে তাকালে তার মনের আয়নায় ভেসে উঠলো, এই বয়স্ক লোকটি আমার পিতার শিক্ষক ছিলেন। আমাকে পড়িয়েছেন তিনি। আর এখন তিনি আমার মেয়ে সিমনতাশের গৃহ শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করছেন।

আবুল মনসুরের দিকে তাকিয়ে তার কানে কানে সিমনতাশ বললো–

আপনি কাদের খানের কথা মানবেন? না আল্লাহর হুকুম মানবেন? আপনি যদি দুনিয়াকে প্রাধান্য দেন, তাহলে আমি বলে দিতে পারি পরাজয় আপনার

বিধিলিপি হয়ে গেছে। আপনি যদি গণ বিদ্রোহের আশংকাকে আমল না দেন তাহলে এই বুড়োকে কয়েদখানায় বন্দি করতে পারেন। একথা বলে সিমনতাশ রাজ দরবার থেকে বেরিয়ে এলো।

এবার আবুল মনসুর স্বমূর্তি ধারণ করে কাদের খানের উদ্দেশে বললেন, কাদের খান! আমি আপনার সাথে সামরিক চুক্তি করেছি এবং যৌথ যুদ্ধ পরিচালনার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। কিন্তু আপনার সব হুকুম আমি মানতে বাধ্য নই। আমাকে এতোটা দুর্বল ভাবার কারণ নেই যে আপনার প্রতিটি নির্দেশ মানতে আমি বাধ্য।

"ওহ্! বোঝা যাচ্ছে, আপনি সুলতান মাহমূদকে ভয় করেন।" বললেন কাদের খান। আপনার কি বিশ্বাস হয় না, আমি আর তোগাখান যে কোন মূল্যে আপনার সঙ্গ দেবো?

"আমি সুলতান মাহমূদকে ভয় করছি না। আমার হৃদয়ে এখনো আল্লাহর ভয় কিছুটা রয়েছে। ক্ষমতার মোহ্ আমাকে এতোটা অন্ধ করেনি, যার হাতে আমার তিন পুরুষ শিক্ষা নিয়েছে, আমি নিজে যার কাছ থেকে জীবনের দীক্ষা পেয়েছি, এই বৃদ্ধ বয়সে শুধু সন্দেহের কারণে তাকে জেলখানায় বন্দী করবে। আপনি এখন চলে যেতে পারেন, যাওয়ার সময় আপনি বিশ্বাস রাখতে পারেন, যুদ্ধের প্রশ্নে আমি আপনাদের সাথেই রয়েছি এবং থাকবো।" এই বলে আবুল মনসুর গুরুজীকে চলে যাওয়ার ইঙ্গিত দিলে গুরুজী দৃঢ়পদে গর্বিত ভঙ্গিতে দরবার কক্ষ ত্যাগ করলেন।

সুলতান মাহমূদকে তার গোয়েন্দা কি খবর দেবে? জিজ্ঞাসু কণ্ঠে আবুল মনসুর একথা বলে নিজেই নিজের প্রশ্নের জবাবে বললেন, বড়জোর এ খবর দেবে, আমরা তার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছি। এটা তার কাছে গোপন কোন খবর নয়, সে জানে আমরা তার শত্রু। তাই সে খোরাসানের নিরাপত্তা রক্ষার পাকাপোক্ত ব্যবস্থা আগেই করে রেখেছে। এতে আপনার ঘাবড়ে যাওয়ার কিছু নেই, আমাদের প্রস্তুতিতে বেশী সময় ব্যয় করা যাবে না।

আবুল মনসুরে একথা ও সার্বিক অবস্থা দেখে কাল বিলম্ব না করে কাদের খান তখনই সেখান থেকে রওয়ানা হয়ে গেলেন।

গুরুজী রাজদরবার থেকে বের হয়ে সোজা সিমনতাশের কাছে চলে এলেন। তিনি সিমনতাশকে জিজ্ঞেস করলেন, সত্যিই কি শিল্পী দৃষ্টিহীন নয়?

সিমনতাশ গুরুজীকে জানালো–

আমিতো তাকে দৃষ্টিহীনই মনে করতাম। সুলতান মাহমূদকে একটি পয়গাম পাঠানোর কথা সিমনতাশ স্বীকার করে বললো, শিল্পী আমাকে জানিয়ে ছিল, সে না গিয়ে অপর কোন ব্যক্তিকে পাঠাবে।"

"সামনে ঘোরতর বিপদের আশংকা দেখতে পাচ্ছি। আল্লাহর মেহেরবানী ছাড়া এ মহাবিপদ থেকে আর কেউ রক্ষা করতে পারবে না সিমনতাশ।' বললেন গুরুজী।

"এজন্যই তো আমি খবর পাঠিয়ে দিয়েছি, যাতে ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞ প্রতিরোধ করা যায়। বললো সিমনতাশ। প্রয়োজনে আমি নিজেও গযনী যেতে প্রস্তুত। তাতে যদি আমার কঠিন শাস্তিও ভোগ করতে হয় তাও আমি পরওয়া করব না।

এতোদিন অভিজ্ঞ গুরু সিমনতাশকে বাস্তবতার নিরিখে ইতিহাসের আয়নার যে বাস্তবতা উপলব্ধি করার দূরদর্শীতা শিক্ষা দিয়ে ছিলেন, এখন সেই শিক্ষার বহিঃপ্রকাশ ঘটছে সিমনতাশের দৃঢ় প্রত্যয়ীও তার প্রতিটি প্রদক্ষেপে।

* * *

যে আলাভোলা সাদাসিধে যুবকটি আবুল মনসুরের দরবারে তবলা বেহালা নিয়ে মাথা নুইয়ে অন্ধ দৃষ্টিহীনের মতো আনা গোনা করতো আর বেহালা ও তবলার বাজনার সাথে মনোহরী কণ্ঠের গান গেয়ে সবার প্রিয় পাত্রে পরিণত হয়েছিল। বিশেষ করে শাসক আবুল মনসুরের কিশোরী কন্যা সিমনতাশের একান্ত বন্ধুতে পরিণত হয়েছিল, সংকটময় মুহূর্তে সেই যুবকই মারাত্মক এক সংবাদ নিয়ে খোরাসানের পাহাড় জঙ্গল উঁচু-নীচু পাহাড়ী পথে বীরের মতো তেজোদীপ্ত ভঙ্গিতে অশ্বারোহী হয়ে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। এ সময় তার মাথা উঁচু বুকটা যেন ফুলে প্রশস্ত হয়ে গেছে। কারণ, সে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ খবর সুলতানের কাছে নিয়ে যাচ্ছে।

মাঝে মাঝে সে তার ঘোড়াটিকে বিশ্রাম দিচ্ছিল এবং পানি ঘাস খাইয়ে নিচ্ছিল।

ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে মনের আনন্দে এমন মনোহারী কণ্ঠে গান গাইতো তার ঘোড়াটিও গানের সুরে মুগ্ধ হয়ে আরো দ্রুত দৌড়াতো। কারণ তার আরপাকড়াও হওয়ার আশংকা নেই। সে গযনীর সীমানায় প্রবেশ করেছে। অবশ্য গযনী তখনো বহু দূর।

গযনীর সীমানায় পৌছে শিল্পী প্রতিটি সেনা চৌকিতে ঘোড়া বদল করে নিচ্ছিল। কিন্তু নিজের বিশ্রামের প্রতি তার কোন খেয়াল ছিল না। কখন সে গাযনী পৌছাবে সেটিই ছিল তার একমাত্র লক্ষ্য।

দিন রাত এক নাগাড়ে ঘোড়া হাঁকিয়ে সে গযনীর দিকে এগুচ্ছিল। তার খেয়াল ছিল না আজ কোন দিনের সূর্য ডুবে কোন দিনের সূর্য অস্ত গেল কিংবা সূর্য উঠে কোন দিনের সূচনা হলো। তার একমাত্র দৃষ্টি কখন গযনী পৌছাবেঁ। এভাবে দৌড়াতে দৌড়াতে একদিন তার চোখে পড়ল গযনীর সবচেয়ে উঁচু মিনারটি।

গযনী পৌছে শিল্পী যখন সেনাপ্রধানের কাছে হাজির হল তখন অনেক রাত। প্রথমেই জানাল সে কি খবর নিয়ে খোরাসান থেকে বিরতিহীন সফর করেছে।

সুলতান মাহমূদ আগেই এ নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন বাইরে থেকে কোন গোয়েন্দা যদি মধ্য রাতেও আসে সাথে সাথে আমাকে খবর দিবে।

শিল্পীরূপী এই গোয়েন্দার চেহারা দেখে এবং তার মুখে দু'চারটি কথা শুনেই সেনাপতি সুলতান মাহমূদকে খবর দিলেন। শিল্পীরূপী গোয়েন্দা আবু জাফর সুলতানকে মূল খবর বলার আগেই জানাল, সে একজন অন্ধ হিসেবে আবুল মনসুর আরসালান খানের দরবারে জায়গা করে নিতে সক্ষম হয়েছিল। এ কারণে শুধু রাজ দরবার নয় তার ঘরের ভেতরে পর্যন্ত অবাধ যাতায়াত ছিল।

জাফর সুলতান মাহমূদকে জানালো, কাশগরের শাসক কাদের খান এবং বলখের শাসক তোগা খান এবং আবুল মনসুর আরসালান খানের সৈন্যরা যৌথভাবে খোরাসানের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ করে খোরাসান কব্জায় নেয়ার চক্রান্ত করেছে। সেই সাথে যে কোন ভাবে সুলতানকে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছে।

"আবুল মনসুর আরসালানখান গযনীর সাথে বংশগত শত্রুতা দূর করে ফেলতে চাচ্ছিল। কিন্তু কাদের খান ও তোগাখান তাকে এতোটাই আতংকিত করে ফেলেছে যে, সে ইচ্ছা অনিচ্ছায় ওদের চক্রান্তে শামিল হয়েছে। আবু জাফর বললো, আমার মনে হয়, আপনি যদি আবুল মনসুরকে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেন, তাহলে হয়তো সে এই চক্রান্ত থেকে পিছিয়ে আসতে পারে।

"আবুল মনসুরের সেনাধ্যক্ষদের ব্যাপারে কিছু বলতে পারো?" আবু জাফরকে জিজ্ঞেস করলেন সুলতান।

সেনারা তুর্কি মেয়েদের মোহে মোহগ্রস্ত। কাদের খান আবুল মনসুরের সেনাকর্মকর্তাদেরকে সুন্দরী মেয়েদের জালে আটকে রেখেছে। কাদেরখান বারবার আবুল মনসুরের কানে একথাই বলছে এখনই যদি সুলতান মাহমূদের উপর যৌথ আক্রমণ করে থামিয়ে দেয়া না হয় তাহলে আমাদের মতো ছোট ছোট রাজ্যগুলোকে সে গিলে ফেলবে। কাদের খান আবুল মনসুরকে বুঝিয়েছে, সুলতান মাহমূদ হিন্দুস্তান থেকে বিজয়ী হয়ে এসেছে বটে কিন্তু তার সমর শক্তি মারাত্মক ভাবে দুর্বল হয়ে গেছে। এই সুযোগে অতি সংগোপনে খোরাসান আক্রমণ করে সেখানে মজবুত কেন্দ্র বানিয়ে নিয়ে ছোট ছোট আক্রমণ অব্যাহত রাখতে হবে।

"আবুল মনসুরের সেনা বাহিনীর মধ্যে কখন থেকে পরিবর্তন এসেছে? নাকি এলিখ খানের সময় সেনা বাহিনীর অবস্থা যেমন ছিল তেমনই আছে? আবু জাফরকে জিজ্ঞেস করলেন সুলতান।

মাননীয় সুলতান! এলিখ খান আমাদের সেনাদের হাতে যে সব সৈন্যদের হত্যা করিয়েছিল, সেই সৈন্য ঘাটতি আবুল মনসুর পুরো করেছে। সম্মানীত সুলতান! এ প্রসঙ্গে আমি আবুল মনসুরের একমাত্র কন্যা সিমনতাশের উল্লেখ করা জরুরী মনে করছি। আবুল মনসুরের একমাত্র কন্যা সিমনতাশ যেমন তার বয়োজ্যেষ্ঠ গৃহশিক্ষকের ভক্ত অনুরূপ তার পিতা মাতার প্রতিও শ্রদ্ধাশীল। স্ত্রী কন্যা এক হয়ে আবুল মনসুরের উপর প্রচন্ড চাপ সৃষ্টি করেছে যাতে আপনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তিনি উদ্যোগী না হন।

সিমনতাশ খুব সুন্দরী ফুটফুটে চনমনে একটি মেয়ে। আমি তার নিজের কণ্ঠে একথা বলতে শুনেছি– আমি সুলতান মাহমূদের কাছে তাঁর বাদী হয়ে থাকাটাকেও জীবনের সৌভাগ্য বলে মনে করবো।

“মেয়েটির কি বিয়ে হয়নি?” জিজ্ঞেস করলেন সুলতান।

“জী না, এখনো বিয়ে হয়নি।” বললো আবু জাফর। সেই সাথে সিমনতাশ তার কাছে যে পয়গাম দিয়েছিলো তাও জানিয়ে দিলো। এ কথা শুনে সুলতান মাহমূদ গভীর চিন্তায় ডুবে গেলেন।

সুলতান মাহমূদ আবু জাফরকে বিপুল পুরস্কার ও সম্মান দিয়ে বিদায় করলেন। সাথে সাথে তিনি ডেকে পাঠালেন, তার যুবক ছেলে মাসউদ আলমকে। মাসউদকে ডেকে তিনি বললেন–

তোমাকে আবুল মনসুর আরসালান খানের কাছে যেতে হবে এবং আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করার জন্যে তাকে রাজী করাতে হবে। তাকে বলতে হবে, আমাদের সাথে যুদ্ধ করলে তারা সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যাবে। তাকে একথাও বুঝাতে হবে, সে যদি গযনীর সাথে মৈত্রী চুক্তি করে তাহলে গযনী তাদেরকে সামরিক নিরাপত্তা দেবে। সুলতান মাহমূদ মাসউদ বিন মাহমূদকে আরো প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দিলেন এবং জানিয়ে দিলেন তার সাথে আর কে কে যাচ্ছে।

পরদিনই মাসউদ রওয়ানা হয়ে গেল। দু'জন সামরিক বিশেষজ্ঞ উপদেষ্টা তার সঙ্গী হিসেবে ছিল, আর নিরাপত্তার জন্য তার সঙ্গী হিসেবে রওয়ানা হলো বিশজন নির্বাচিত অশ্বারোহী। তাদের এই সফর ছিল স্বাভাবিকভাবে বারো তেরো দিনের। আবুল মনসুরের সম্মানে তুহফা উপঢৌকন বহন করার জন্যে কয়েকটি উট ও বোঝাই করে তাদের কাফেলার সাথে দেয়া হলো।

আবুল মনসুরের শাসনাধীন রাজ্যের সীমানায় পৌছে মাসউদ শহর থেকে কিছুটা দূরে তাবু ফেললেন এবং আবুল মনুসরের কাছে তাদের আগমনি সংবাদ দিয়ে একজন দূত পাঠালেন,

সুলতান মাহমূদের ছেলে মাসউদ বিন মাহমূদ আপনার সাথে সাক্ষাত করতে চায় এবং কিছু জরুরী বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চায়।'

পরদিন রাজকীয় বেশ ভূষা নিয়ে আবুল মনসুর মাসউদ বিন মাহমূদকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য এলেন। আবুল মনসুর এলে উপহার-উপঢৌকনের হাতবদল হলো। এই সুযোগে মাসউদ তার বাবার পয়গাম আবুল মনসুরের হাতে তুলে দিলেন।

“আমি আপনার পিতার প্রশংসা না করে পারি না, তার গোয়েন্দা ব্যবস্থা খুবই সুন্দর। গযনীর অন্ধ লোকেরাও প্রয়োজনের সময় চক্ষুষ্মান হয়ে ওঠে। ‘কোন বধির যদি আমাদের সাথে চুক্তি করে তবে অন্ধ যেমন চক্ষুষ্মান হয়ে যায় তেমনি বধির ও শুনতে শুরু করে। বধির হওয়ার কারণে আবুল মনসুরের কানে উচ্চ আওয়াজে একথা বলা হলো। মাসউদের এ কথাকে আবুল মনসুর ভালোভাবে নিতে পারেননি। তিনি ক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্টি মাখা কণ্ঠে বললেন;

শাহ্জাদা! তোমার বাবা তোমাকে অশ্বারোহণ ও তরবারী চালানো শিখিয়েছে বটে কিন্তু সম্মানিত লোকদের সাথে কিভাবে কথা বলতে হয় সেই শিক্ষা দেয়নি। আমি সেই অন্ধ ব্যক্তির কথা বলছিলাম, যে অন্ধ হিসেবে আমার রাজ দরবারে দীর্ঘ দিন কাটিয়েছে, অথচ সে তোমার বাবার একজন বিশ্বস্ত চক্ষুষ্মান গোয়েন্দা। সেই অন্ধরূপী শিল্পীই হয়তো তোমার বাবাকে খবর দিয়েছে, এখানে গযনী সালতানাতের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি চলছে। যার ফলে তোমাকে মৈত্রী চুক্তির পায়গাম দিয়ে পাঠানো হয়েছে।”

“মুহতারাম! আমি পয়গাম নিয়ে এসেছি, কোন দরখাস্ত নিয়ে আসিনি.....।

আমি বুঝতে পারিনি আপনি যে দৃষ্টিহীনের কথা বলছেন সে আমাদের সংবাদদাতা ছিল। দেখুন, আমি আপনার সাথে সাদামাটা কথা বলতে এসেছি, আপনি যদি আপনার রাজ্যকে শান্তিপূর্ণ নিরাপদ রাখতে চান তাহলে কাদের খান ও তোগা খানের মৈত্রী ত্যাগ করুন। আপনাদের তিনজনের সম্মিলিত বাহিনীও আমাদের ছয়শত হাতির মোকাবেলা করতে পারবে না। আপনার বড় ভাই এলিক খানের পরিণতির কথা নিশ্চয়ই আপনি ভুলে যাননি।

“আমাদের কি তাদের ভয় দেখাতে এসেছেন? উষ্মামাখা কণ্ঠে বললো আরসালান খানের সঙ্গে আসা এক সেনাধ্যক্ষ। আপনি কি আমাদের এতোটাই দুর্বল ভাবছেন যে, আমরা আতংকিত হয়ে আপনাদের বশ্যতা স্বীকার করে নেবো?”

আবুল মনসুর যেহেতু বধির ছিলেন এজন্য তার সেনাধ্যক্ষ আর মাসউদের মধ্যে কি কথাবার্তা হচ্ছিল, তা তিনি শুনতে পাচ্ছিলেন না। তিনি উভয়কেই বড় বড় চোখ করে দেখছিল আর তার সঙ্গীদের অনুরোধ করছিলেন এরা কি কথা বলছে তা তার কানে বলার জন্য।এক পর্যায়ে উচ্চ আওয়াজে আবুল

মনসুর তার সেনাপতিকে বললেন, তোমরা কি কথাবার্তা বলছো আমাকেও শোনাও।

"গযনীর প্রতিনিধি বলছে, আপনি যদি কাশগড় ও বলখের সাথে বন্ধুত্ব ত্যাগ না করেন, তাহলে তারা আমাদের উপর আক্রমণ করে সব কিছু ধ্বংস করে দেবে।

একথা শুনে আবুল মনসুর ক্ষুদ্ধ দৃষ্টিতে মাসউদের দিকে তাকালেন এবং বললেন, শাহজাদা শোন! তুমি যদি আমাদের হুমকি ধমকি দিয়ে তোমাদের সাথে মৈত্রী করতে এসে থাকো, তাহলে চলে যাও। গিয়ে সেনাবাহিনী নিয়ে এসো।

"একথা শুনে মাসউদ আবুল মনসুরের কানে মুখ লাগিয়ে উচ্চ আওয়াজে বললো, যে রাজ্যের শাসক বধির আর তার সেনাপতি মিথ্যাবাদী হয় আর সেই রাজ্যের প্রজাদের দুর্ভাগ্যের সীমা থাকে না। সম্মানিত আমীর! আপনার সেনাপতি আপনাকে মিথ্যা কথা বলছে। আমি একথা বলিনি। সেনাপতিরা যদি এভাবে আপনার শাসন কাজে হস্তক্ষেপ করতে থাকে তাহলে তো আপনার রাজ্যের অবস্থা খারাপ হতে বাধ্য। এভাবে আপনার রাজত্ব বেশিদিন টিকে থাকবে না। মাসউদ উচ্চ আওয়াজে কিছুক্ষণ কথা বলার পর আবুল মনসুরকে অনেকটা আশ্বস্ত করতে সক্ষম হলো যে, সে কোন শক্তি বা ক্ষমতা দেখাতে আসেনি, সত্যিকার অর্থেই তার সাথে মৈত্রী ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনের জন্যেই এসেছে।

একপর্যায়ে আবুল মনসুর মাসউদকে বললেন, ঠিক আছে, যেহেতু তুমি একটি গুরুত্বপূর্ণ পয়গাম নিয়ে এসেছো, এনিয়ে আমরা একটু চিন্তা করি, আর তুমি ক'দিন মেহমান হিসেবে আমাদের এখানে থাকো। আমরা তোমাকে রাজকীয় মেহমানদারীর ব্যবস্থা করবো। তুমি ইচ্ছা করলে শিকারও করতে পারো।

* * *

আবুল মনসুরের সাথে মাসউদ বিন মাহমূদের কথাবার্তা শেষ হলো। আবুল মনসুর তার প্রাসাদে চলে যাওয়ার কিছুক্ষণ পরই শাহী লোকজন রান্নাবান্না ও থাকা খাওয়ার রাজকীয় সাজসরঞ্জাম নিয়ে মাসউদের তাবুতে উপস্থিত হলো। রাজকর্মচারীরা এসে নতুন করে মেহমানের জন্যে বিশাল এক শাহী তাঁবু তৈরী করল এবং রাজকীয় বাবুর্চী উন্নত মানের খাবার দাবারের ব্যবস্থা করল।

একদিন পায়চারী করতে করতে মাসউদ তাঁবু থেকে কিছুটা দূরে চলে এলে একজন রাজ কর্মচারী পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে মাসউদকে সালাম দিয়ে বিনয়ের সাথে বললো,

"সম্মানিত শাহজাদা! আপনাকে আমি একটি গোপন কথা বলতে এসেছি। আগামী কাল আপনি শাহী মহলের সংরক্ষিত বনে শিকারের জন্যে যাবেন, সেখানে শাহজাদী আবুল মনসুর আপনার সাথে সাক্ষাতের জন্যে অপেক্ষা করবেন।"

আমাকে কি বনের মধ্যে হত্যা করা হবে, না তাঁবুতে হত্যা করা হবে? একথাটা পরিষ্কার বলে দিলেই হয়।

মুহতারাম শাহজাদা! এমনটি কেন ভাবছেন? আপনার দেহরক্ষীরা তো আপনার সাথেই থাকবে। এখানে আপনাকে হত্যা করার দুঃসাহস কারো নেই।'

দৃষ্টিহীনতার কৌশলী অভিনেতা গোয়েন্দা আবু জাফর সুলতানকে বলেছিলো। আবুল মনসুরের একমাত্র কন্যা সিমনতাশ তার বাবার কার্যক্রমের বিরোধী। সুলতান মাহমূদ মাসউদকে বিদায় করার আগে একথাটিও বলে দিতে ভুল করেননি। সুলতান বলেছিলেন, আবুল মনসুরের যুবতী কন্যা সিমনতাশ গযনী সালতানাতের অত্যন্ত হিতাকাঙ্ক্ষী এক নারী। সে তার পিতার কর্মকাণ্ডের ঘোরতর বিরোধী। কিন্তু একজন শাহজাদী পিতার বিরুদ্ধে গিয়ে কিছুই করতে পারে না। শাসন কার্যে সেনাবাহিনীর কর্তা ব্যক্তিদের উপর শাহজাদীর কোন প্রভাব খাটে না। সুলতানের এই ধারণার কারণে মাসউদ সিমনতাশকে তেমন গুরুত্ব দেননি। আবুল মনসুরের এক কর্মচারী যখন মাসউদকে জানাল, তাদের সংরক্ষিত বনে শাহজাদী তার সাথে সাক্ষাত করতে আসবে, এটিকে তিনি কোন চক্রান্ত কিংবা সংশয়ের দৃষ্টিতে দেখেননি।

পরদিন সকালের 'নাশ্‌তার পর বেলা যখন অনেকটা উপরে উঠে গেলো তখন শাহ্‌জাদা মাসঊদ পাঁচ ছয়জন নিরাপত্তারক্ষী সাথে নিয়ে শিকারের উদ্দেশ্যে বের হলেন। অন্যান্য নিরাপত্তাকর্মী ও উপদেষ্টাদের তিনি সাথে নেননি। তার নিরাপত্তা রক্ষীদেরকে তিনি তার চতুর্দিকে এভাবে ছড়িয়ে দিলেন, যাতে কেউ তার উপর মারণাঘাত না করতে পারে। মাসঊদ বিন মাহ্‌মূদ ঘোড়ার উপর সওয়ার হয়ে ধনুকে তীর ভরে চতুর্দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে বনের ভেতরের দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন। মাসঊদ যতই বনের ভেতরে প্রবেশ করলেন, বন ততই ঘন এবং সবুজ লতাগুল্ম ভরা উচু-নীচু টিলা ঝোপঝাড় দেখতে পেলেন। তিনি এভাবে অগ্রসর হতে লাগলেন যে, তার চতুর্পাশে তার দেহ রক্ষীদের ঘোড়ার পায়ের আওয়াজ তিনি শুনতে পাচ্ছিলেন।

চলতে চলতে তিনি এমন একটি জায়গায় এলেন, জায়গাটি একটি সমতল ভূমি, অনতি দূরে উচু একটি টিলা। সমতল জায়গাটিতে মনোমুগ্ধকর লতানো ফুলগাছ বড় বড় গাছগুলোকে জড়িয়ে রেখেছে। সেখানে একটি খোলা জায়গায় মাসঊদ একটি মেয়েকে দাঁড়ানো দেখতে পেলেন। মেয়েটির পাশে একটি ঘোড়া দাঁড়ানো। একটি একহারা ছোট গাছে ঘোড়াটিকে বেধে রাখা হয়েছে। মেয়েটির কাঁধে ধনুক ঝোলানো। কোমরের বন্ধনীতে তরবারী আটকানো। এমন মনোহর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সাথে সুন্দরী মেয়েটিকে অসম্ভব সুন্দর লাগছে। প্রকৃতির রূপ আর তরুণীর রূপলাবণ্যে যেন একাকার হয়ে গেছে। মনে হচ্ছে তরুণীটি যেন এই বনের সৌন্দর্যেরই অংশ! তরুণীর মুখটি অনিন্দ্য সুন্দর বটে কিন্তু তার চাহনী ও দাঁড়ানোর ভঙ্গি অত্যন্ত গম্ভীর। স্থির দাঁড়িয়ে সে আগন্তুক যুবকের দিকে ভাবলেশহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। মাসঊদ তরুণীকে দেখে পনেরো বিশ হাত দূরে ঘোড়া থেকে নেমে পড়লেন এবং চতুর্দিকটি ভালোভাবে দেখে নেয়ার চেষ্টা করলেন।

"আপনি যদি মাসঊদ বিন মাহমূদ হয়ে থাকেন তাহলে নিঃসংকোচে এগিয়ে আসুন। এখানে আপনার কোন বিপদ হবে না, কোন ঝুকি বা আশংকা নেই। আমি সিমনতাশ। আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছি।'

মাসঊদ ঘোড়ার বাগ ধরে দৃঢ় পায়ে সিমনতাশের দিকে এগিয়ে গেলেন। সিমনতাশ কাল বিলম্ব না করে তাকে নিয়ে ঘাসের উপর মুখোমুখি হয়ে বসে পড়ল।

"কোন তরুণীর আহ্বানে এখানে আসাটা আমার জন্যে শোভনীয় ছিল না। কিন্তু আমি জানি আপনি গযনী সালতানাতের একজন হিতাকাঙ্ক্ষী। "আপনাকে ভুল ধারনা দেয়া হয়েছে। আসলে আমি গযনী সালতানাতকে ভক্তি করি না, আমি উভয় দুনিয়ার যিনি সুলতান তার পূজা করি। আমি সেই রসূল স.-এর অনুসারী গযনীর সুলতান যার অনুসারী। আমি এই নীতিতে বিশ্বাস করি যে, একই কালেমায় বিশ্বাসী মুসলমান আরেক মুসলমানকে হত্যা করতে পারে না।"

"এক ভাই যদি শুধু ক্ষমতা ও রাজত্বের মোহে আরেক ভাইকে খুন করতে চায়, এ ব্যাপারে তোমার কি বক্তব্য?"

"এমন খুনীর বেঁচে থাকার কোন অধিকার নেই। এমন খুনীর বিরুদ্ধে জিহাদ করা সক্ষমের জন্যে ফরয।" বললো সিমনতাশ।

"তাই যদি মনে কর, তাহলে তোমার বাবাও তো এদের মধ্যেই পড়েন। আমি এজন্যেই তার কাছে মৈত্রী চুক্তির পয়গাম নিয়ে এসেছি। আমি এসেছি এ জন্য যাতে তার বিরুদ্ধে জিহাদে অবতীর্ণ হওয়া আমাদের জন্যে ফরয কর্তব্যে পরিণত না হয়। তুমি যা বিশ্বাস করো এবং যা বললে এই নীতি ও আদর্শের উপর তোমার বাবাকে কি আনতে পারো না?"

"না, আমার পক্ষে তা সম্ভব নয়। বললো সিমনতাশ। এজন্যই আমি আপনাকে এখানে আসতে বলেছি। আমার বাবাও সেইসব ঈমান বিক্রেতাদের একজন যাদের বিরুদ্ধে গযনী সুলতানের জিহাদে অবতীর্ণ হওয়া ফরয হয়ে গেছে। আপনি হয়তো আমার কথায় আশ্চর্যান্বিত হচ্ছেন এই ভেবে যে, কোন মেয়ে কি বাবার বিরুদ্ধে এমন কঠোর মনোভাব পোষণ করতে পারে? কিন্তু যে আবেগের বশীভূত হয়ে আমি আমার জন্মদাতার বিরুদ্ধাচরণ করছি তা যদি আপনি এতটুকু গভীরভাবে চিন্তা করেন তাহলে ঠিকই রহস্যটা বুঝতে পারবেন। আমি আপনার কাছে এই নিবেদন করতে এসেছি, কাদের খান ও তোগা খানের সৈন্যরা আমাদের সৈন্যদের সাথে একত্রিত হয়ে একটি সামরিক শক্তিতে পরিণত হওয়ার আগেই আপনারা আমাদের রাজধানী অবরোধ করে কব্জা করে নিন। তাতে অন্তত অহেতুক অনেকগুলো মানুষের মরণ ঠেকানো যাবে।.........

আমাদের সেনাবাহিনী আপনাদের সেনাবাহিনীর তুলনায় খুবই নগণ্য ও দুর্বল। তা না করে যদি আপনাদেরকে তিনটি বাহিনীর মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হয় তাহলে এর আগে গৃহযুদ্ধে যেমন উভয় পক্ষের বিপুল জনবল ক্ষয় হয়েছে এবং বহু লোকের প্রাণহানি ঘটেছে এক্ষেত্রেও তাই হবে।"

"শোন সিমন! হিন্দুস্তানে সুলতান যেভাবে আক্রমনাত্মক ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন, এভাবে কোন মুসলিম রাজ্যের উপর আক্রমণ করবেন না। আমাদের উদ্দেশ্য রাজ্য দখল নয়, কাফেরদের মোকাবেলায় একটি শক্তিশালী ইসলামী সামরিক শক্তি গড়ে তোলা। তোমাদরে রাজ্য দখলের ইচ্ছা থাকলে সুলতান আমাকে মৈত্রীর পয়গাম দিয়ে পাঠাতেন না।

"আমার আব্বা কখনো মৈত্রী চুক্তি করবেন না। তিনি যদিও আপনাকে মৈত্রীর কথা বলে আশ্বস্ত করেছেন, কিন্তু কাদের খানের প্ররোচনা ও নানাবিধ সুবিধা ভোগী সেনা কর্মকর্তারা আব্বাকে মৈত্রীচুক্তি করতে দেবে না। আব্বা এখন এইসব বেইমান সেনাদের মানসিকভাবে হাতে বন্দী। কারণ, আব্বা কানে শুনেন না। তাকে যা শোনানো হয় তাই তিনি শুনেন। এর বাইরে নিজ থেকে তিনি কিছুই শুনতে পান না। অনেক ব্যাপারেই ভালো মন্দ বিচার করা তার পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে না।

হঠাৎ সিমনতাশ নীরব হয়ে গেল। কোন পাকা শিকারী যেমন গভীর বনের ভেতরে শিকারের দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকায় সিমনতাশও একদিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে মাসউদের একটি হাত ধরে টেনে একটি গাছের আড়ালে ঠেলে দিল। লতাগুল্ম গাছটিকে পেচিয়ে দেয়ালের মতো তৈরী করেছে।

সিমনতাশ মাসউদকে বলল, দয়া করে আপনি এখান থেকে এক চুলও নড়বেন না। চতুর্দিকে কড়া নজর রাখবেন। একথা বলে লতাগুল্মোর মধ্যে সিমন আড়াল হয়ে গেল। মাসউদ আকস্মিক এই ঘটনায় অবাক বিস্ময়ে ঠায় দাঁড়িয়ে রইল। একটু পরে নিজের কানেই ধনুক থেকে তীর ছোড়ার শব্দ পেল। সে কান খাড়া করে তার উৎস বুঝতে চেষ্টা করল। ইত্যবসরে বিকট আর্তচিৎকার তার কানে ভেসে এলো। এমন সময় মাসউদ মুখে আঙ্গুল দিয়ে সিটি বাজাল। সিটির আওয়াজ শুনে তার তিনচার নিরাপত্তা রক্ষী তরবারী কোষমুক্ত করে তার কাছে চলে এলো। মাসউদ তার সামনের সবুজ সমতল

ভূমিতে এক ব্যক্তিকে তীর বিদ্ধ অবস্থায় দেখতে পেল। ঠিক এ সময় সিমনতাশ মাসউদের সামনে এসে বলল, 'আমার সাথে আসুন।'

মাসউদ তার নিরাপত্তা রক্ষীদের সঙ্গে নিয়ে তীর বিদ্ধ লোকটির দিকে অগ্রসর হলো। ততোক্ষণে তীর বিদ্ধ লোকটি মাটিতে বসে পড়েছে এবং ব্যথা যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে।

সিমনতাশ তার কোমর থেকে একটি খঞ্জর বের করে আহত লোকটির ঘাড়ে তাক করে বলল,

"যদি সত্য বলো, তাহলে তোমাকে ঘোড়ায় উঠিয়ে বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে তীর বের করে চিকিৎসা করাবো। আর যদি মিথ্যা বলো তাহলে এই গাছের সাথে তোমাকে ঝুলিয়ে দেয়া হবে। চিন্তা করো তুমি কোনটি করবে? দৃঢ় কণ্ঠে আহত লোকটির উদ্দেশ্যে বললো সিমনতাশ।

আহত লোকটি করুণ চাহনী দিয়ে সিমনতাশ ও মাসউদকে দেখে বললো–

"আমি সুলতান মাহমূদের ছেলেকে হত্যা করতে এসেছিলাম।"

"কে তোমাকে বলেলে সুলতান মাহমূদের ছেলেকে এই জঙ্গলের ভেতরে পাওয়া যাবে?" প্রশ্ন করল সিমনতাশ।

"আমাকে দেখিয়ে দেয়া হয়েছে। আমার সাথে আরো এক লোক ছিল সে পালিয়ে গেছে।" বললো তীরবিদ্ধ লোকটি।

কার পরিকল্পনা এটি?

এটি কাশগড়ের শাসক কাদের খানের পরিকল্পনা। এ ব্যাপারে তিনি সম্মানিত আমীর আবুল মনসুরের সাথে কথাবার্তা বলে নিয়েছিলেন।

"আব্বা কি বলেছিলেন?"

"তিনি বলেছিলেন, আমি সুলতান মাহমূদের ছেলেকে ভেবেচিন্তে জবাব দেয়ার জন্যে কয়েক দিন এখানে থাকতে বলেছি। সে হয়তো কোন না কোন দিন শিকারের জন্যে বের হবে, তখন তোমরা তোমাদের কাজ সারতে পারবে। তার সঙ্গে এমন দু'জন কর্মচারী পাঠাবে, যারা তার শিকারে যাওয়ার আগেই তোমাদের খবর দিতে পারে।"

"ওকে ঘোড়ার পিঠে ফেলে নিয়ে চলো" মাসউদের এক নিরাপত্তা রক্ষীকে নির্দেশের সুরে বললো সিমনতাশ। সে মাসউদকে বললো, এই বিষয়টিই আমি আপনাকে বুঝানোর জন্যই এখানে আসতে বলেছিলাম। আমি বলতে চাই, আপনি আর এক মুহূর্তও এখানে অবস্থান করবেন না। আপনার নিরাপত্তা কর্মীদেরকে সতর্ক রাখবেন। ঘটনাক্রমে আমি টিলার নীচের সমতল ভূমিতে এই লোকটিকে উঁকি ঝুকি মারতে দেখে ফেলেছিলাম। তার ধনুকটিও আমার দৃষ্টিতে পড়ে গিয়েছিল। এই জায়গাটি শাহী খান্দানের শিকারের জন্যে নির্দিষ্ট। এখানে শাহী খান্দান ছাড়া আর কেউ আসতে পারে না। আমি একটি ঝোপের ভেতরে লুকিয়ে থেকে ওর উপর তীর চালিয়ে ছিলাম বলে কোন দুর্ঘটনা ঘটেনি। নয়তো অস্বাভাবিক কিছু ঘটে যেতে পারতো, যা শুধু আমার নয় গোটা রাজ্যের জন্যে স্মরণীয় কলংক হতো।"

এখন আমাকে তুমি কি করতে বলো?" জানতে চাইল মাসউদ বিন মাহমূদ।

আপনি আমার আব্বার আশ্বাসের অপেক্ষা না করে আজই গযনী ফিরে চলুন। আমার মনে হচ্ছে আমাদের মোলাকাত হবে রণাঙ্গনে।"

তুমি কি রণাঙ্গনে আমার সাথে সাক্ষাত করবে?"

হয়তো বা তাই।" কথা শেষ করতে না করতেই সিমনতাশের দু'চোখ গড়িয়ে পড়লো অশ্রুধারা।

"আরে তুমি কাঁদছো সিমন? তোমার মতো সাহসী মেয়ের কান্না শোভা পায় না সিমন।"

'দুঃখিত? আমি একটা পাগল। চোখের অশ্রু মুছতে মুছতে ধরা গলায় বললো সিমন। কিছুক্ষণ নীবর থেকে মাসউদের দু'হাত ধরে ঝাকুনী দিয়ে সিমনতাশ বললো, বলুন? আমি কি পাগল নই? আমার গৃহশিক্ষকও হয়তো পাগল? ধোকা ও প্রতারণার রাজ্যে সত্যের পথিকরা পাগলই তো হবো। এমন এক যুবরাজের সাথে আমার বিয়ের কথা পাকাপাকি করে রাখা হয়েছে, যার একহাতে শরাবের বোতল আর এক হাত সুন্দরী তরুণীদের পেলব দেহ বল্লরীর উত্তাপের স্বাদ নিতে ব্যস্ত থাকে। সে এমন এক ব্যক্তি, জাতি ও ধর্মীয় দায়িত্ববোধ সম্পর্কে যার কোনই চিন্তা-ভাবনা নেই। একজন পুরুষ ও শাহজাদা

হিসেবে তার যে একটা কর্তব্য আছে তার দিল দেমাগে এর কোন ছাপ নেই।.....

সিমনতাশের একহাতে ছিল ধনুক আর অপর হাতে ছিল খঞ্জর। সে উভয়টি মাসউদের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললো, আমার বিয়ে এগুলোর সাথে হয়ে গেছে মাসউদ। এদুটো জিনিসই আমার ভালোবাসার নমুনা। নারী শুধু পুরুষের বিনোদন আর প্রদর্শনীর জিনিস নয়। এই ধনুক আর খঞ্জর একজন নারীরও অলংকার হতে পারে।"

"আরে! তুমি এমন সব কথা বলছো কেন সিমন? সিমনতাশের হতাশা ও দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে সাহস ও আশার সঞ্চার করতে মাসউদ বললো,

যে নারীর হাতে ধনুক আর কাঁধে তীরদান থাকে তার চোখে হতাশার অশ্রু মানায় না সিমন! সেতো তার জাতি ও কওমের জন্যে অনুকরণীয়ও সৌভাগ্যের প্রতীক।...সিমন। এখানে এভাবে কি আমাদের দাড়িয়ে থাকা ঠিক হবে?

ওহ! আমি ভুলে গিয়েছিলাম কোথায় দাঁড়িয়ে আছি আমি। আমি আবারো আপনাকে বলছি, আপনি যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব এখান থেকে চলে যান। দ্রুত আপনার গযনী পৌছা দরকার।

আপনাকে হয়তো সেই অন্ধ বেহালাবাদক গোয়েন্দা অনেক কিছুই বলেছে! সে আমার পয়গামও হয়তো গযনী সুলতানের কাছে পৌছিয়েছে।"

"সে কতটুকু কি করেছে, তা তুমি নিজেই তাকে জিজ্ঞেস করে জেনে নিতে পারো।"

মাসউদ একজন নিরাপত্তাকর্মীকে বললো, আবুজাফরকে ডেকে আনো।" ইঙ্গিত পাওয়া মাত্রই এক অশ্বারোহী যুবক ঘোড়া হাঁকিয়ে তাদের কাছে চলে এলো। সে ঘোড়া থেকে নেমে যখন মাসউদের কাছে এলো, তার আসার চালে মনে হচ্ছিল গোটা এলাকাটা দুলছে।

"ওকে কি চিনো জাফর? সিমনতাশের প্রতি ইঙ্গিত করে জাফরকে জিজ্ঞেস করলো মাসউদ।

"আবু জাফর সিমনতাশের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলো, সিমনতাশও তার দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে নি:শব্দে জানিয়ে দিলো তাদের মধ্যকার জানা শোনার বিষয়টি।

"তোমাকে চিনতে কিন্তু আমার বেশ কষ্ট হয়েছে।' জাফরের দিকে ইঙ্গিত করে বললো সিমনতাশ। তুমি কি আমার পয়গাম সুলতানের কাছে পৌঁছিয়েছো?"

"অক্ষরে অক্ষরে হুবহু তোমার প্রতিটি কথা আমি সুলতানকে বলেছি।' জবাব দিলো আবু জাফর।

"জাফর একজন বড় মাপের গোয়েন্দা। সে নিরাপত্তা বাহিনীর লোক নয়। এই সফরে তাকে আমার উপদেষ্টা হিসেবে পাঠানো হয়েছে।......সিমন, ওই আহত লোকটিকে কোথায় পাঠিয়েছো?"

"ওর ব্যাপারে আমি সিদ্ধান্ত নিতে পারছি না, আমার বাবার কাছে নিয়ে যাবো, না চিকিৎসকের কাছে পাঠাবো। ও হ্যাঁ, আমার এখন যাওয়া দরকার। ওরা হয়তো অনেক দূরে এগিয়ে গেছে। জানি না জীবনে আর কোন দিন তোমার সাথে দেখা হবে কিনা। হলেও কোথায় হবে। মৈত্রী প্রস্তাবের জবাব তুমি ইতোমধ্যে পেয়ে গেছো, তাই আজই তোমার গযনীর পথে রওয়ানা হওয়া উচিত।

"সিমনতাশ মাসউদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এক লাফে অশ্বারোহণ করে এমনভাবে ঘোড়াকে তাড়া করলো যে, ঘোড়াটি হরিণের মতো উর্ধশ্বাসে লাফিয়ে লাফিয়ে উড়ে চললো। মাসউদ এক পলকে তার দিকে তাকিয়ে থাকলো। মুহূর্তের মধ্যেই সিমনতাশ বনের মধ্যে হারিয়ে গেল। যতক্ষণ পর্যন্ত তার অশ্বখুড়ের আওয়াজ কানে ভেসে এলো মন্ত্রমুগ্ধের মতো মাসউদ সে দিকে তাকিয়ে রইল।

"মুহতারাম শাহজাদা! আপনি কি অনুমান করতে পারছেন এই মেয়েটি মুসলিম ঐক্যের প্রশ্নে কি পরিমাণ আবেগপ্রবণ।" বললো গোয়েন্দা ও মাসউদের উপদেষ্টা আবু জাফর। আবু জাফর আরো বললো, আমি সিমনতাশের সংশ্রবে অনেক দিন সময় থেকেছি, ঘন্টার পর ঘন্টা পার করে দিয়েছি। আমি তাকে যতটা জানি আর কেউ তাকে এতটা জানে না। আমি নিশ্চিত বলে দিতে পারি, গযনী সালতানাতের কল্যাণে এই মেয়ে বিস্ময়কর কিছু ঘটিয়ে দেবে।'

"অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মাসউদের মানসিক অবস্থা স᾿পূর্ণ বদলে গেল। তিনি তার নিরপত্তাকর্মীদের বললেন, চলো।

সাথীদের নিয়ে পাহাড়ী উপত্যকা থেকে সমতল ভূমিতে নেমে এলেন মাসউদ। তার সকল নিরাপত্তারক্ষী তার কাছে ফিরে আসার পর তিনি শহরের দিকে রওয়ানা হলেন। মাসউদ তীব্র বেগে শহরে দিকে ঘোড়া হাঁকালেন।

তীরবিদ্ধ লোকটিকে ঘোড়ার পিঠে রেখে এক সৈনিক শহরের প্রবেশদ্বারে প্রবেশ করতে যাচ্ছিল, এসময় সিমনতাশের ঘোড়া আহত লোকটিকে বহনকারী ঘোড়াকে অতিক্রম করে সামনে চলে গেল। আহত লোকটির ক্ষতস্থান থেকে তখনো রক্ত ঝরছে।

"আবুল মনসুর আরসালান খান তার রাজ দরবারে উপবিষ্ট। মাসউদ বিন মাহমূদ কোন আগমন সংবাদ না দিয়েই আবুল মনসুরের রাজ দরবারে হাজির হলেন। তার পেছনে তার এক নিরাপত্তারক্ষী আহত লোকটিকে কাধে করে বয়ে নিয়ে এল এবং মাসউদের ইঙ্গিতে আহত লোকটিকে রাজ দরবারের মেঝেতে শুইয়ে দিলো। আহতের ক্ষতস্থান থেকে রক্ত ঝরে রাজদরবার রঞ্জিত হয়ে উঠল।

" আরে! একি মাসউদ বিন মাহমূদ?

জিজ্ঞেস করলেন আবুল মনসুর।

"এটাই হলো আমার মৈত্রীর পয়গামে আপনার দেয়া জবাব? আমি আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানাতে এসেছি, আপনার জবাবের জন্য আমাকে বেশী দিন আপেক্ষা করতে হয়নি।

"আবুল মনসুর রাগে ক্ষোভে দাঁড়িয়ে গেলেন। তিনি ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললেন, এ সবের রহস্য কি? সুলতান মাহমূদ কি তার ছেলেকে রাজ দরবারের আদব শেখায়নি?"

"না, আমার বাবা আমাকে রাজ দরবারের আদব শেখানোর অবকাশই পাননি।" মাসউদ তার পাশে দাড়ানো আবুল মনসুরের সেনাপাতিকে উদ্দেশ্য করে বললেন, তোমার মুনীবকে জানিয়ে দাও! আমার বাবাকে কাফের বেঈমান গাদ্দার ও স্বজাতির ঈমান বিক্রেতারা ছেলেকে আদব-কায়দা শেখানের সুযোগ

দেয়নি। আমরাতো যুদ্ধে যুদ্ধে লড়াই করে করে তীর-তরবারীর সংঘাতের মধ্যেই বড় হয়েছি।"

আবুল মনসুর তার সেনাপতির দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালেন। সেনাপতি তার কানের কাছে মুখ নিয়ে উচ্চ আওয়াজে মাসউদ এর কথাই পুনরাবৃত্তি করল। আবুল মনসুর ক্রোধান্বিত দৃষ্টিতে মাসউদের প্রতি তাকিয়ে বললেন; "হিন্দুস্তানের মণিমুক্তা আর সোনা-দানা এই যুবকের দেমাগ খারাপ করে দিয়েছে। সে আমাদেরকে তার বাবার জঙ্গী হাতির ভয় দেখাতে এসেছে।

"মাসউদ আবুল মনসুরের সেনাপতির উদ্দেশ্যে বললেন, আপনার মুনীবকে বলুন, জঙ্গি হাতির কোনই শক্তি নেই। ঈমানের শক্তিই প্রধান শক্তি। আমরা যদি আমাদের সবগুলো জঙ্গি হাতি আপনাদেরকে দিয়েও দেই তবুও আমাদেরকে আপনারা পরাজিত করতে পারবেন না।

অতিথিকে যারা ধোকা দিয়ে হত্যা করতে চায়, তাদের সঙ্গে রণাঙ্গনেও মোকাবেলা করা সম্ভব নয়।

আবুল মনসুরের সেনাপতি যখন মাসউদের একথা তার কানের কাছে উচ্চ আওয়াজে শোনাল, তখন বিড়বিড় করতে করতে আবুল মনসুর তার আসনে বসে পড়লেন।

মাসউদ কাল বিলম্ব না করে আর কোন কথা না বলে আবুল মনসুরের দরবার থেকে বেরিয়ে গযনীর পথ ধরলেন।

* * *

সঙ্গীদের নিয়ে যথাসম্ভব দ্রুত মাসউদ গযনী ফিরে এলেন। সফরের ইতিবৃত্ত এবং মাসউদকে আবুল মনসুরের চক্রান্তমূলক হত্যা চেষ্টার কথা শুনে সুলতান মাহমূদ মাসউদকে বললেন,

"ক্ষমতার নেশা মানুষের মস্তিষ্ক ও বিবেকের উপর পর্দা ফেলে দিয়েছে। আমি মৈত্রীর পয়গাম পাঠিয়ে আমার নৈতিক কর্তব্য পালন করেছি, এখন আর আমার মনের মধ্যে কোন নৈতিক চাপ থাকবে না।

অবশ্য একটা মানসিক উদ্বেগ আমাকে পেয়েই বসছে, সেটা রীতিমতো আমাকে বিচলিত করছে। আমাদের আক্রমণের ভয়ে কন্নৌজ রাজা পালিয়ে গিয়েছিল। সে তার সহায় সম্পদ আগেই লুকিয়ে ফেলেছিল। তখন আমার সম্পদের প্রয়োজন ছিল না। কন্নৌজের নিয়ন্ত্রণ কব্জা করাই ছিল আমার কাছে মুখ্য। সেটি আমি সহজেই করতে পেয়েছিলাম। কিন্তু হিন্দুস্তান থেকে খবর আসছে রাজ্যপাল কন্নৌজে কর্মরত আমাদের কর্মকর্তাদের কাছে তার জীবন ভিক্ষা দেয়ার আবেদন জানিয়েছে এবং আজীবন গযনীর বশ্যতা স্বীকার করে অনুগত থাকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। কিন্তু লাহোরের মহারাজা ভীমপাল অন্যান্য রাজা মহারাজাদের নিয়ে রাজপালকে ভয়ভীতি দেখাচ্ছে এবং আমাদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত মোকাবেলার আয়োজন করছে। এ অবস্থায় আমার উচিত দ্রুত সেখানে যাওয়া; কিন্তু কাশগড়ও বুখারার কেউটে সাপগুলোর মাথা থেতলে দেয়াটাও জরুরী হয়ে পড়েছে।

তুমি বলছো আবুল মনসুরের কন্যা তোমাকে অনুরোধ করেছে আমরা যাতে দ্রুত তার বাবার রাজ্য দখল করে নেই। আমার স্বজাতির এই পুণ্যবতী কন্যার আকাঙ্ক্ষা ইনশাআল্লাহ আমি পূরণ করবো। দুই কারণে আমাদেরকে এখন বুখারা ও কাশগড়ের বিরুদ্ধে অভিযান চালাতে হচ্ছে। প্রথমত এরা যৌথভাবে আমাদের ক্ষতি করার অপেচেষ্টায় লিপ্ত হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ এদের আড়ালে খ্রিস্টশক্তি এখানে শক্তি সঞ্চয় করছে। কাশগড় ও বুখারার শাসকরা এখন খ্রিস্টান কুচক্রীদের পুতুলে পরিণত হয়েছে। মূলতঃ আমার আশংকা সেটাই। কাশগড় ও বুখারার শাসকদের আমি চিনি, এরা আমাদের জন্য কোন আতংকের বিষয় ছিল না। কিন্তু আমরা এখন এদের দমন না করলে এদের কাধে সওয়ার হয়ে খ্রিস্টশক্তি এই আঞ্চলকে তাদের কলোনীতে পরিণত করবে। তারা এখানে সামরিক আখড়া গড়ে তুলবে। আমাদের মূল যুদ্ধ তো ইসলামের বৈরী শক্তির সাথে। আমার ধারনা আবুল মনসুর ও কাদের খান খোরাসানের উপর আক্রমণের পরিকল্পনা করতে পারে বটে; কিন্তু আক্রমণের দুঃসাহস করবে না। তবে ওরা হামলা করুক আর নাই করুক আমাদের প্রস্তুত থাকা দরকার।"

সুলতান মাহমূদের এ ধারণা ভুল প্রমাণিত হলো। দুই মাস পর তার কাছে খবর এলো, কাশগড় বুখারা ও বেলাসাগুণের সৈন্যরা একত্রিত হয়ে বলখের

দিকে অগ্রসর হচ্ছে। বেলাসাগুন ছিল আবুল মনসুরের রাজধানী। সুলতান মাহমূদ আগে এই তিন রাজশক্তির মৈত্রীকে বেশী গুরুত্ব দেননি। কিন্তু যখন এদের অগ্রাভিযানের খবর এলো তখন তার মধ্যে পেরেশানী দেখা দিল। কাশগড়, বুখারা ও বেলাসাগুন ছিল খোরাসান থেকে অনেক দূরে। বুখারা থেকে খোরাসানের পথ খুলল ভালো ছিল না। তাছাড়া পথিমধ্যে একটি বড় নদী ছিল।

"তাদের অগ্রাভিযান প্রমাণ করে এই তিন বাহিনী বহু দিন আগে থেকেই যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে।" সুলতান মাহমূদ তার একান্ত উপদেষ্টা ও সামরিক কমান্ডারদের বললেন। এমন দুর্গম অভিযান কঠিন প্রস্তুতি ছাড়া হতে পারে না।

সুলতান মাহমূদ মোটেও খেয়াল করেননি কাশগড় থেকে খোরাসানের পথের যতো উপজাতীয় জনগোষ্ঠী ছিল কাদের খান তাদেরকে সম্পদের লোভ ও ইসলাম সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর প্রচারণা চালিয়ে নিজের পক্ষে নিয়ে এসেছিল! এসব পাহাড়ী উপজাতীয় জনগোষ্ঠী ছিল খুবই হিংস্র লড়াকু ও যুদ্ধবাজ। এরা ইসলামের কিছুই জানতো না। নিজেদের মনগড়া ধর্মকর্ম পালন করতো; যা ছিল ইসলামের একত্ববাদের ধারণার পরিপন্থী পৌত্তলিকদের অনুরূপ।

"এদের সম্পর্কে আমার জানা আছে। আমি এদেরকে বলখ থেকে দূরের ময়দান এলাকায় লড়াইয়ে প্রবৃত্ত করবো। এদের সহযোগী উপজাতীদের ব্যাপারেও আমার জানা আছে। ওরা লড়াকু হওয়ার কারণ হলো, সবসময় পরস্পর লড়াইয়ে লিপ্ত থাকে। তবে এদের দুর্বলতা হলো, পাহাড়ী এলাকা ছাড়া এরা লড়াইয়ে বেশী সুবিধা করতে পারে না। তাদের ঘোড়াগুলোও পাহাড়ী অঞ্চলেই দৌড়ঝাপ করতে অভ্যস্থ।

গযনী থেকে বলখের দূরত্বও কম ছিল না। আবু জাফরের কাছে সংবাদ শুনেই সুলতান খোরসানের সৈন্যদেরকে বলখ থেকে কিছুটা দূরে একত্রিত হয়ে যুদ্ধ প্রস্তুতিতে থাকার নির্দেশ দিয়েছিলেন! খোরাসানে বেশী হাতি ছিল না। সম্ভাব্য যুদ্ধের আশংকায় তিনি গযনী থেকে তিনশ জঙ্গীহাতি খুব দ্রুত খোরাসান নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন।

সুলতান মাহমূদের এসব প্রস্তুতির কথা মাত্র দু'জন ঐতিহাসিক লিখেছেন। একজন উলবী আর অপরজন ইবনুল আছীর। তারা লিখেছেন,এ যুদ্ধে সুলতান

মাহমূদ তার সমর শক্তির প্রদর্শনের একটি পরিকল্পনা করেছিলেন। যাতে পাহাড়ী উপজাতিরা এবং স্বজাতির গাদ্দার শাসকেরা আর কোন দিন তার দিকে মাথা তুলে দাঁড়ানোর দুঃসাহস না করে।

* * *

কাদের খান, তোগা খান ও আবুল মনসুরের সৈন্যরা দ্রুত অগ্রসর হচ্ছিল। তারা রসদ ও প্রচুর যুদ্ধসামগ্রী নিয়ে এসেছিল। পাহাড়ী উপজাতির লোকেরা তাদেরকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করছিল।

ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, পাহাড়ী উপজাতির লোকেরা ঘোড়ার পিঠে দাঁড়িয়ে ঘোড়া দৌড়াতে পারতো এবং দৌড়ঝাপ করে লড়াই করতে অভ্যস্থ ছিল। সুলতান মাহমূদের শত্রুরা উপজাতিদের এই বিশেষ বৈশিষ্টের জন্যে গর্ব করতো। তাছাড়া তিন বাহিনী মিলে তাদের সেনাশক্তিও ছিল প্রবল।

ঐতিহাসিকদের মতে সুলতান মাহমূদের সৈন্য সংখ্যা তিন বাহিনীর সমানই ছিল। অবশ্য সুলতান মাহমূদের প্রতিপক্ষের কাছে কোন হাতি ছিল না। তাছাড়া সুলতান মাহমূদের কাছে অন্তত চারশ রথ ছিল, এই রথগুলো তিনি হিন্দুস্তানের পরাজিত সৈন্যদের কাছ থেকে কব্জা করে ছিলেন। সুলতান মাহমূদ এগুলো ব্যবহারের পক্ষে ছিলেন না, কিন্তু পাহাড়ী উপজাতিদের কথা চিন্তা করে রথগুলো সাথে নিয়েছিলেন। যাতে পাহাড়ী লড়াকুদের বিরুদ্ধে এগুলো ব্যবহার করে ফায়দা উঠানো যায়।

এগুলো ছিল খুবই হালকা ধরনের এক প্রকার বাহন। সামনে একটি ঘোড়ার কাধে রথ জুড়ে দেয়া হতো। রথের মধ্যে দু'জন সৈন্য থাকতো, একজন ঘোড়া হাঁকাতো আর অপরজনের হাতে থাকতো বর্শা-তরবারী তীর ধনুক। সুলতান মাহমূদ ছোট দু'টি রথ ইউনিট তৈরী করেছিলেন। এবার উভয় রথ ইউনিটকে খোরাসানের দিকে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দিলেন।

ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন সুলতান মাহমূদের সৈন্যরা ছিল উচ্চমানের সামরিক প্রশিক্ষণে শিক্ষিত। তাদের মধ্যে নিয়মতান্ত্রিকতা এবং রণাঙ্গনের

কঠিন সময়েও এক দল অপর দলের সাথে সম্পর্ক রেখে চলতো। যুদ্ধের কঠিন অবস্থাতেও সুলতান মাহমূদের কোন সামরিক ইউনিট অপর ইউনিট থেকে বিচ্ছিন্ন হতো না। ফলে সুলতান মাহমূদের সৈন্যদেরকে কখনো বিশৃঙ্খল হতে দেখা যেতো না।

এসব রণাঙ্গনীয় বৈশিষ্ট্যে সমৃদ্ধ হওয়ার পরও এই যুদ্ধ প্রস্তুতি সুলতান মাহমূদকে পেরেশান করছিল। কারণ, হিন্দুস্তানে তার প্রচুর সংখ্যক অভিজ্ঞ সৈন্য শাহাদাত বরণ করে। ধরে আনা হিন্দুদেরকে সামরিক বাহিনীতে সুযোগ দিয়ে তিনি জনবলের ঘাটতি অনেকটা পূর্ণ করেছিলেন। হিন্দু ইউনিটের সৈন্যদেরকে প্রচুর সুযোগ সুবিধা দিয়ে রেখেছিলেন তিনি। এরা ধীরে ধীরে ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান হয়ে ঈমানের দীক্ষা নিচ্ছিল। কিন্তু এরপরও এদেরকে কখনো তিনি হিন্দুস্তানের কোন অভিযানে নিয়ে যেতেন না।

সুলতান মাহমূদ বলখ পৌছে বিশ্রাম পরিহার করে সৈন্যদেরকে যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত করতে শুরু করলেন। কোন ইউনিট কোন দায়িত্বে কি কাজ করবে তিনি তা বুঝিয়ে দিতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। কিন্তু বেশী সময় নিয়ে খুব মনোযোগ ও চিন্তা-ভাবনা করে সৈন্যদের দায়িত্ব বন্টনের সময় তিনি পেলেন না। তার কাছে খবর পৌছে গেল, শত্রু বাহিনী ককেসাস নদী পেরিয়ে আসছে। ককেসাস নদীর অবস্থান ছিল বলখ থেকে মাইল পঞ্চাশেক দূরে। সুলতান মাহমূদকে তার সেনা কর্মকর্তারা পরামর্শ দিলেন, শত্রুরা নদী পাড় হওয়া অবস্থাতেই ওদের উপর হামলে পড়া উচিত। কিন্তু সুলতান মাহমূদ বললেন, ওদেরকে নিরাপদে নদী পেরিয়ে আসতে দাও। এরপর নদী আমাদের সহযোগী বিবেচিত হবে। নদী থেকে আমরা সুবিধা নিতে পারবো। নদী পাড় হওয়ার খবরে সুলতান মাহমূদের নিশ্চিত ধারনা হলো, শত্রুবাহিনী বলখেই আসবে।

সুলতান মাহমূদ গযনী বাহিনীকে দু'ভাগ করলেন। বলখ থেকে ডানে পাঁচ মাইল দূরে এক অংশকে রেখে অপর অংশটিকে বলখের পাচ মাইল বামে রেখে নদীর দিকে অগ্রসর হতে বললেন। হস্তি বাহিনীর সাথে তিনি একশ রথ ও একটি পদাতিক ইউনিটকেও পাঠালেন। তাদের প্রতি নির্দেশ ছিল; তারা সুলতানের নির্দেশের অপেক্ষা করবে এবং যে কোন মূল্যে শত্রু বাহিনীর দৃষ্টি থেকে নিজেদের আড়াল রাখবে।

এই সেনা বিন্যাসের চতুর্থ দিন শত্রু বাহিনীর অগ্রবর্তী দলের দেখা পাওয়া গেল। সুলতান মাহমূদকে যখন এই খবর দেয়া হলো, তিনি খবর শুনেই কিবলা মুখী হয়ে নামাযে দাঁড়িয়ে গেলেন। দু'রাকাত নফল নামায আদায় করে প্রথমেই নির্দেশ দিলেন শত্রু বাহিনীর অগ্রবর্তী দলের উপর কেউ একটি তীরও চালাবে না। তিনি যখন এই নির্দেশ দিচ্ছিলেন, ঠিক তখনই তাকে জানানো হলো, শত্রু বাহিনীর এক গোয়েন্দাকে পাকড়াও করে আনা হয়েছে। সুলতানের নির্দেশে গোয়েন্দাকে তার সামনে হাজির করা হলো।

"হ্যা সুলতান আমি বেলাসাগুনের গোয়েন্দা বটে; কিন্তু একটি সংবাদ আপনাদেরকে দিতে এসেছি, আপনাদের কোন তথ্য নিতে আসিনি।'

"কি খবর নিয়ে এসেছো?"

"খবরটি আপনার ছেলে মাসঊদের জন্য। আপনি জলদী তাকে এখানে ডেকে নিয়ে আসুন।'

"মাসঊদকে যখন ডেকে আনা হলো, তখন গোয়েন্দা সুলতানের উপস্থিতিতেই বললো, তাকে আবুল মনসুরের মেয়ে সিমনতাশ এই মৌখিক সংবাদ দিয়ে পাঠিয়েছে যে,

আমি আপনাকে বলেছিলাম যুদ্ধক্ষেত্রেই হয়তো আমাদের সাক্ষাত হবে। আমার আব্বার সেনাকর্মকর্তাদের স্ত্রী এবং রক্ষিতাদের সাথে আমিও রণাঙ্গনে এসেছি। আমাদের অবস্থান হলো, আমার আব্বার সৈন্যরা ডান পাশে এবং বুখারার সৈন্যরা আছে বাম পাশে আর কাদের খানের সৈন্যরা মাঝে। আমাদের সৈন্যদের কমান্ড আমার পিতা নিজে দিচ্ছেন। উপজাতিদেরকে তিন বাহিনীর মধ্যে ভাগ করে নেয়া হয়েছে। আপনার আব্বা আমাদের সৈন্যদের অবস্থা জানার পর তিনি তার বাহিনীকে কিভাবে সাজাবেন তা ভালো বুঝবেন। আমি আপনাকে অনুরোধ করবো; আমাদের বাহিনীর দিকে অগ্রসর হতে। আমি জীবিত আপনার কাছে পৌছার চেষ্টা করবো। আর যদি জীবিত না থাকি তবে দু'আ করবেন। আল্লাহ হাফেয!"

গোয়েন্দা আরো বললো, শাহজাদী আমাকে ফিরে না গিয়ে আপনাদের সাথে থাকতে বলেছেন।

"শোন মাসউদ! গোয়েন্দাকে কক্ষের বাইরে পাঠিয়ে দিয়ে মাসউদের উদ্দেশ্যে সুলতান বললেন, "এটা কি প্রেম ঘটিত ব্যাপার? যদি এমন কিছু হয়ে থাকে তাহলে আমি তোমাকে ও দিকে পাঠাবো না।"

"ব্যাপারটা অনেকটাই আবেগাশ্রিত। কিন্তু এতে কোন ব্যক্তিগত আবেগ কিংবা ছেলেমানসিকতা নেই আব্বা হুজুর।" জবাব দিলেন মাসউদ। "আপনি আমাকে নিঃসংকোচে ওদিকে পাঠাতে পারেন। আমি সিমনতাশের পরিবর্তে তার বাবার সাথে সাক্ষাতেব চেষ্টা করবো। সিমনের এই পয়গাম প্রতারণা নয়। আবু জাফরের কাছে আপনি এই মেয়ে সম্পর্কে অনেক কিছুই শুনেছেন। আমিওতো সিমনতাশের সম্পর্কে আপনাকে পরিষ্কার একটা ধারণা দিয়েছি।'

* * *

এই যুদ্ধ প্রস্তুতির পঞ্চম দিনে টকটকে লাল সূর্যটা পৃথিবীর বুকে আলো বিকিরণ করছিল মাত্র। ঠিক সেই সময় উভয় শিবিরের সৈন্যরা আল্লাহু আকবার তাকবীর ধ্বনী দিয়ে নিজেদেরকে তরতাজা করে তুলছিল। উভয় পক্ষ ছিল প্রতিপক্ষের রক্তপিপাসু।

সিমনতাশ শত্রুপক্ষের সেনা বিন্যাসের যে প্রক্রিয়ার কথা বলেছিল শত্রু বাহিনী ঠিক সেভাবেই অগ্রসর হচ্ছিল। যুদ্ধের সূচনাস্বরূপ অশ্বারোহী সংবাদবাহী দূতেরা জরুরী খবর পৌছানোর জন্য উর্ধ্বশ্বাসে ঘোড়া হাঁকাচ্ছিল। সুলতান মাহমূদ যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে এসব দূতের মাধ্যমে জরুরী পয়গাম পাঠিয়ে যুদ্ধ পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করতেন। দূতদের বহন করা সংবাদে শত্রু পক্ষের অবস্থানও তাদের যুদ্ধ পরিকল্পনা বুঝা যাচ্ছিল। কাদের খানের সৈন্যরা ছিল মাঝে এবং অনেকটা দূরে। দৃশ্যত শত্রুপক্ষের অগ্রাভিযানের অবস্থা দেখে মনে হচ্ছিল, তারা সুলতান মাহমূদের সৈন্যদেরকে ঘেরাও করতে চায়।

আবুল মনসুরে সৈন্যরা যে দিকে ছিল সুলতান মাহমূদ তার ছেলে মাসউদকে ভ্রাম্যমান কমান্ডার হিসেবে সেদিকে পাঠিয়ে দিলেন। তোগাখানের সৈন্যদের দিকে আরেকজন তেজস্বী সেনাপতিকে কমান্ডারের দায়িত্ব দিয়ে পাঠালেন! শত্রু বাহিনীর একটি দলের সাথে অপর দলটির দূরত্ব ছিল প্রায় দেড়

দুই মাইল। এই শূন্য জায়গা দিয়ে সুলতান মাহমূদের সৈন্যরা সামনে অগ্রসর হচ্ছিল। সুলতান অশ্বরথ এবং হস্তি ইউনিটকে অনেক আগেই ডানে বামে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। ফলে তোগাখান ও আবুল মনসুরের সৈন্যরা সুলতানের হস্তিবাহিনীর ঘেরাওয়ের মধ্যে ছিল।

সুলতান মাহমূদ শেষ নির্দেশ দিয়ে তার দূতদের পাঠিয়ে দিলেন। ততোক্ষণে সূর্য অনেক উপরে উঠে গেছে; কিন্তু দুইপক্ষের সৈন্যদের দৌড় রণাঙ্গনে যে ধুলি উড়ালো তাতে সূর্যের আলো ধুলির আস্তরণের মধ্যে ঢাকা পড়ে গিয়েছিল। হঠাৎ যেন আসমান যমীন কাঁপতে শুরু করল। সুলতান মাহমূদ ডানে বামে-আক্রমণের নির্দেশ দিয়ে দিলেন। উভয় বাহুতে উভয় দিক থেকে প্রচণ্ড আক্রমণ শুরু হলো। সুলতানের আক্রমণকারীরা ছিল হাতি, রথ ও পদাতিক সৈন্যের সমন্বয়ে গঠিত বাহিনী। গযনী বাহিনীর আক্রমণ প্রতিহত করতে উপজাতির দুর্ধর্ষ লড়াকুরা তাদের মতো করে প্রতিরোধ গড়ে তুললো। তারা ঘোড়ার পিঠে চড়ে বল্লম ও তীরের সাহায্যে আক্রমণ প্রতিহত করতে চাইলো; কিন্তু এমন চতুর্মুখী আক্রমণে তারা তাদের প্রতিপক্ষ চিহ্নিত করতেই হিমশিম খাচ্ছিল।

এদিকে কাদেরখানের কাছে কোন তথ্য পৌছল না, তাদের দু'পাশে কি ঘটছে। দুই বাহু থেকে তার কাছে কোন বার্তা পৌছাচ্ছিল না। তাকে একথা বলার কোন ব্যবস্থা ছিল না যে, তার সহযোগী দুই প্রান্তের যোদ্ধারা ঘোড়ার গাড়ি ও হাতির পায়ে পিষ্ট হচ্ছে।

ডান পাশের আবুল মনসুরের অবস্থা ভালো ছিল না। তার সৈন্যদের উপর এক দিক থেকে মাসউদের নেতৃত্বে আক্রমণ হলো। আবুল মনসুরের সৈন্যরা যখন এ দিকে মনোযোগী হলো তখন তাদের পেছেন দিক থেকে উন্মত্ত জঙ্গি হাতি আকাশ বাতাশ কাঁপিয়ে বিকট চিৎকার করে হামলে পড়ল। এক সাথে হস্তিবাহিনী ও রথ ইউনিট এবং পদাতিক সৈন্যরা পেছন দিক থেকে আক্রমণ করল। রথ ইউনিটের মনোযোগ ছিল উপজাতিদের উপর। যখনই কোন উপজাতি তাদের মতো করে মোকাবেলা করতে সারি থেকে বের হতো তখন তার দু'দিকে দুই রথ আরোহী সৈন্য দৌড়ে যেতো এবং রথগাড়ীর উপর থেকে বর্শা বা তীর চালিয়ে সেই উপজাতিকে ধরাশায়ী করে ফেলতো।

সন্ধ্যার আগে একটি উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে মাসউদ রণাঙ্গনের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করছিল। তার পেছন দিক থেকে তিনটি ঘোড়া উর্ধশ্বাসে ছুটে আসছিল। একজনের হাতে ছিল সাদা পতাকা। মাসউদের নিরাপত্তা রক্ষীরা ওদের দিকে ঘোড়া হাঁকাল। কারণও এমন লড়াইয়ে সাদা পতাকাও প্রতারণা হতে পারে। মাসউদের নিরাপত্তারক্ষীরা তিন অশ্বারোহীকে ঘেরাও করে মাসউদের কাছে নিয়ে এলো। তিনজনের মধ্যে একজন ছিল সিমনতাশ। সে তার মাথা মোটা কাপড় দিয়ে ঢেকে রেখে ছিল। আর গায়ে পুরুষ সৈন্যের পোশাক পরে ছিল। মাসউদের কাছাকাছি এসেই এক লাফে সিমনতাশ ঘোড়া থেকে নেমে মাসউদের কাছে গিয়ে তাকে সালাম করল। তার অপর দুই সঙ্গী ছিল সেনাবাহিনীর লোক।

বহু কষ্টে আপনার অবস্থান জানতে হয়েছে। হাঁপাতে হাঁপাতে বললো সিমনতাশ। আমার আব্বা পালানোর চেষ্টা করছেন, কিন্তু তার এক সেনাপতি তাকে মিথ্যা আশ্বাস দিচ্ছে। আব্বা সৈন্যদের মধ্য ভাগ অনেক পেছনে নিয়ে গেছে। তার দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে গেছে সে পরাজিত হয়েছে। কাদের খানের এক দুত তার কাছে সংবাদ নিয়ে এসেছে বলখের দিকে অগ্রাভিযান সে বন্ধ করে দিয়েছে এবং সহযোগিতার জন্যে সে তার সৈন্যদেরকে ডানে বামে ভাগ করে পাঠাচ্ছে। সে বলে পাঠিয়েছে, হতাশ হবেন না, মাহমূদের বাহিনীকে আমরা ঘেরাও এর মধ্যে ফেলে দিচ্ছি।. ...

জানেন মাসউদ? কিভাবে আমি তোমার অবস্থান জেনেছি এবং এখানে পৌঁছতে সক্ষম হয়েছি? সে কথা অন্য দিন বলা যাবে। এখন একথা বলতে চাই, একটু সাহস করলেই আমাদের মধ্যভাগের রিজার্ভ সৈন্যদের আপনারা পাকড়াও করতে পারেন। অপর পাশের সৈন্যদের অবস্থা কি আমি বলতে পারবো না। আমি শুধু আমাদের সৈন্যদের কথা বলছি।"

গভীর চিন্তার পড়ে গেলেন মাসউদ।

"কি চিন্তা করছেন? আমাব ঘোড়া বহু লাশ মাড়িয়ে এসেছে। মৃতদের মধ্যে যেমন গযনীর সৈন্য আছে, বুখারা ও তুর্কিস্তানীও আছে। সবাইকে দেখলে তো মুসলমানই মনে হয়। ওরা সবাই মুসলমান।

স্বজাতির এই রক্তক্ষরণ এবং জীবনহানি বন্ধ করুন মাসউদ! আমি যা বলছি তা করুন। কাদের খানের পাঠানো সৈন্যরা এসে পড়লে এই নির্মম হত্যা যজ্ঞ বন্ধ করা যাবে না। কাদের খানের সৈন্যরা আসার আগেই আমাদের রিজার্ভ বাহিনীকে আপনার মুঠোতে নিয়ে নিন।" উত্তেজিত ও উচ্চকণ্ঠে কথাগুলো বললো সিমনতাশ।

"তুমি কি আমার সাথেই থাকবে? জিজ্ঞেস করলেন মাসউদ। "না। আমি এখনই চলে যাচ্ছি। আপনি আসুন........ বলে সিমনতাশ এক লাফে ঘোড়ার পিঠে আরোহণ করে তার দুই সঙ্গীকে নিয়ে ধুলোবালির অন্ধকারে হারিয়ে গেল। সে মাসউদকে তার বাবার অবস্থানের কথা বলে গেল।

* * *

এদিকে কাদের খানের অগ্রাভিযান থেমে গেল। সে তার সৈন্যদেরকে দু'ভাগে ভাগ করে তোগাখান ও আবুল মনসুরের সহযোগিতার জন্যে পাঠাচ্ছিল। কাদের খান এ কাজ করছে বলে সুলতান মাহমূদের কাছে এ খবর যখন পৌঁছলো তখন রাত অন্ধকার হয়ে গেছে। তখন আর আক্রমণ করা সম্ভব ছিল না। সুলতান তার যুদ্ধ পরিকল্পনা পরিবর্তন করলেন। অন্ধকারের মধ্যেই মাসউদ ও অন্যান্য সেনাপতিদের কাছে পয়গাম পাঠালেন,

"যুদ্ধের সর্বশেষ অবস্থা কি আমাকে দ্রুত জানাও।"

মাসউদ তার অবস্থানে ছিল না। মাসউদের পরিবর্তে তার একজন ডেপুটি পয়গাম গ্রহণ করল! মাসউদ একশ বাছাই করা সৈনিক ও কিছু সংখ্যক কমান্ডারকে নিয়ে রাতের অন্ধকারে আবুল মনসুরের হেডকোয়ার্টারে গেরিলা আক্রমণের জন্যে চলে গিয়েছিলেন। এটা ছিল মারাত্মক একটি গুপ্ত হামলার পরিকল্পনা। দিনের বেলার যুদ্ধেই আবুল মনসুর যুদ্ধ জেতার ব্যাপারে হতাশ হয়ে পড়েছিলেন। কারণ, তার অধিকাংশ যোদ্ধাই নিহত নয়তো মারাত্মকভাবে আহত হয়েছিল। সুলতান মাহমূদ এভাবেই তাদের উপর আক্রমণ করিয়ে ছিলেন যে, তাদের পক্ষে টিকে থাকা সম্ভব ছিলো না। আবুল মনসুর তার কন্যার নির্দেশনা মতো নদীর তীরবর্তী এলাকায় চলে গিয়েছিল। আবুল মনসুরের সাথে তার একজন বিশ্বস্ত সেনাপতি, কয়েকজন উপদেষ্টা তিন স্ত্রী

এবং কিছু সংখ্যক নিরাপত্তা রক্ষী ছিল এবং কয়েকজন দূত ছিল। আবুল মনসুর যেখানে অবস্থান করছিলেন সেখানে তার উপর আক্রমণের সুযোগ ছিল না।

মাসউদ অনেক দূরের ঘোর পথ অতিক্রম করে আবুল মনসুরের অবস্থানে পৌছলেন। কাছাকাছি গিয়ে তিনি দু'তিনটি মশাল জ্বলতে দেখলেন। তিনি তার সঙ্গীদের দিক নির্দেশনা দিয়ে তাদেরকে ছড়িয়ে দিয়ে সামনে অগ্রসর হলেন। আবুল মনসুরের দু'জন মাত্র নিরাপত্তা রক্ষী পাহারা দিচ্ছিল। তারা একে অন্যকে বললো উভয়েই ঘোড়া দৌড়ের আওয়াজ শুনেছে! অপরজন বললো, তুমি ঠিকই বলেছো, আমারও তো তাই মনে হলো। এদের একজন একটি মশাল উঁচু করে দুবার ডানে-বামে ঘুরিয়ে আবার দুইবার উপরে নীচে করে একটি তাবুর কাছে গিয়ে নীচু স্বরে কি যেন বললো, সেই তাঁবুতে সিমনতাশ শুয়েছিল। সিমনতাশ ডাক শুনেই বাইরে বেরিয়ে এলো এবং পাহারাদারকে বললো, "তুমি সামনে চলে যাও।"

যেহেতু গোটা ব্যাপারটিই ছিল পরিকল্পিত এবং সিমনতাশের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে তাই রাতের গুপ্ত হামলা তেমন ঝুকিপূর্ণ ছিল না। আবুল মনসুরের সেনাপতি এবং সৈন্যরা নিজ নিজ তাবুতে শুয়ে ছিল। দিনের বেলার যুদ্ধে আহতদের গগনবিদারী আর্তচিৎকার তাদের কানে পৌছাচ্ছিল না। রক্ত ও লাশের গন্ধ থেকেও তারা ছিল অনেকটা দূরে। তারা এই আত্মতৃপ্তিতে নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছিল যে, তাদের সৈন্যদের মাড়িয়ে কেউ তাদের পর্যন্ত পৌছতে সক্ষম হবে না। কিন্তু ঈমান বিক্রেতা পিতার ঈমানদীপ্ত কন্যাই তার জন্যে মারাত্মক এক ঝুকি হিসেবে অবস্থান করছিল।

মাসউদ তাঁবুতে প্রবেশ করে একটি মশাল উঠিয়ে আবুল মনসুরের তাঁবুতে প্রবেশ করে তাকে ঘুম থেকে জাগালো। ঘুম থেকে জেগে মাসউদকে দেখে আবুল মনসুর হতবিহ্বল হয়ে পড়লেন। এদিকে মাসউদের নিরাপত্তা রক্ষীরা আবুল মনসুরের নিরাপত্তারক্ষীদের জাগিয়ে এক জায়গা জড়ো করলো এবং তার সেনাপতিকেও পাকড়াও করল। আবুল মনসুর মাসউদকে বললেন, আমি পরাজয় মেনে নিলাম; কিন্তু আমার মেয়েকে তোমরা বন্দী করো না। মাসউদ তার কথার কোন জবাব দিল না।

* * *

তখন রাত প্রায় অর্ধেক পেরিয়ে গেছে। সুলতান মাহমূদ গোটা রণাঙ্গণ চক্কর দিয়ে মাত্রই তার তাঁবুতে ফিরেছেন। ঠিক সেই সময় তাকে জানানো হলো, মাসঊদ আবুল মনসুরকে গ্রেফতার করে নিয়ে এসেছে।

একথা শুনে সুলতান দৌড়ে তাবুর বাইরে চলে এলেন। কারণ, তার জন্যে এ খবর কোন সাধারণ খবর ছিল না। আবুল মনসুরের সাথে তার কন্যা সিমনতাশও ছিল। তিনি তাদেরকে তার তাঁবুতে নিয়ে গেলেন।

"সুলতান কি আমার বন্ধুত্ব গ্রহণ করবেন?" মাথা নত করে আরয করলেন আবুল মনসুর।

"আমি তো তোমার কাছে বন্ধুত্বের পয়গামই পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু তুমি দোস্তী কবুল না করে বরং আমার ছেলেকে হত্যা করার অপচেষ্টা করেছিলে? এর পরও কি তোমার উপর আমার আস্থা রাখা সম্ভব? উল্টো প্রশ্ন করলেন সুলতান। তুমি যে আবারো ধোঁকা দিবে না, এটি আমি কিভাবে বিশ্বাস করবো? এখন আর তোমার বলার কিছু নেই, তুমি এখন আমার বন্দী।

"আপনি ঠিকই বলেছেন, 'এখন আর আমার কিছু বলার নেই। তবুও আমি আপনার বন্ধু হতে চাই; আপনার অনুগ্রহ প্রত্যাশা করি। আমি কখনো আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চাইনি। কিন্তু...... আমি এক প্রকার বাধ্য ও অক্ষম হয়ে আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছি সুলতান!

আব্ল মনসুর অপরাধ স্বীকার করে নেয়ার ভঙ্গিতে বললেন, চতুর্মুখী চাপে পড়ে আমি আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধে শরীক হয়েছি।

সিমনতাশ পাশেই দাঁড়িয়ে সুলতান ও তার বাবার কথোপকথন শুনছিল। সে সামনে অগ্রসর হয়ে সুলতানের সামনে হাটু গেড়ে বসে সুলতানের হাতে চুমু খেয়ে বললো, "আপনার হৃদয়ে আমার জন্যে কি একটুও দয়ার জায়গা নেই সুলতান? সে একবার মাসউদের দিকে তাকিয়ে এবং আরেকবার সুলতানের দিকে তাকিয়ে বললো,আমি আমার পিতার প্রতিশ্রুত মৈত্রী পাকাপাকি করতে পারি।"

"সুলতান মাহমূদ সিমনতাশের ইঙ্গিত বুঝে আর কোন কথা বললেন না।'

সিমনতাশের কথা শুনে আবুল মনসুরও বললেন, হ্যাঁ, সুলতান! আমার কাছে এখন এই একমাত্র জামিন আছে। এই আমার একমাত্র সন্তান। সে আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আমাকে নিষেধ করেছিল। আপনি একে আপনার মেয়ে হিসেবে গ্রহণ করুন।'

কথা না বাড়িয়ে সুলতান মাহমূদ সেই সময়েই আবুল মনসুরের প্রস্তাব গ্রহণ করলেন এবং মাসউদের সম্মতিতে সিমনতাশকে তার সাথে বিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। যুদ্ধের ডামাডোলের মধ্যেই সিমনও মাসউদের বিয়ে সম্পন্ন হলো! তখন ছিল ১০২০ সাল।

আবুল মনুসর রাতেই তার সৈন্যদেরকে লড়াই থেকে বিরত থাকার নির্দেশ পাঠিয়ে দিলেন। সুলতান মাহমূদ আবুল মনসুরকে বন্দীত্বের অবস্থান থেকে মেহমানের মর্যাদা দিয়ে দিলেন। আবুল মনসুরের বন্দীর খবর পেয়ে কাদের খান ও তোগা খান ময়দান থেকে পালিয়ে গেল।

দু'বছর পর এরা দু'জন এসে সুলতানের কাছে আত্মসমর্পন করে বশ্যতা স্বীকার করে নিল।

দেবতা পুরোহিতকে গিলে ফেললো

কালাঞ্জর, কন্নৌজ ও গোয়ালিয়র একই পরম্পরার তিনটি শহর। এই তিন শহরের মাঝ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছিল হিন্দুদের কাছে মহাপবিত্র গঙ্গা ও যমুনা নদী। গঙ্গা যমুনা ছাড়াও আরো ছোট ছোট কয়েকটি নদী এগুলোর বুক চিড়ে বিভিন্ন দিকে প্রবাহমান ছিল।

সুলতান মাহমূদের শাসনামলে এসব এলাকা ছিল ঘন বনজঙ্গলে আকীর্ণ। তাছাড়া পাহাড় টিলা ও গিরিখাদের অন্ত ছিল না। এই তিনটি শহর একই সারিতে প্রায় শ দেড়শ মাইল দূরে দূরে ছিল। সুলতান মাহমূদ যখন ভারতের অধিকাংশ এলাকায় জীবন্ত আতংক হয়ে ওঠেছিলেন তখন এই তিনটি শহর ছিল তিনটি বিশাল বিশাল রাজধানী।

কন্নৌজ সম্পর্কে আগেই বলা হয়েছে মথুরা, বুলন্দশহর মুনাজসহ ছোট বড় কয়েকটি রাজ্য দখল করে নেয়ার পর কন্নৌজকেও সুলতান মাহমূদ জয় করে নিয়েছিলেন। কন্নৌজের খ্যাতিমান প্রতাপশালী মহারাজা রাজ্যপাল পরাজয় ও ধরা পড়ার আশংকায় গযনী বাহিনী কন্নৌজ অবরোধ করার আগেই পালিয়ে গিয়েছিলেন।

কালাঞ্জর সম্পর্কে এতটুকু বলে নেয়া উচিত, কোটলী কাশ্মীরের আলোচন কালে কালাঞ্জরের নামও এসেছে। তখন জায়গাটির নাম ছিল কালাঞ্জার। বর্তমানে এটিকে কোশী বলেই ডাকা হয়। এখন আমরা যে জায়গাটির আলোচনা করবো তা আসলে কালাঞ্জর।

১০১৮ সালের শেষ দিকে কন্নৌজের মহারাজা রাজ্যপাল সুলতান মাহমূদের মোকাবেলার আগেই রাজধানী ত্যাগ করে নিরাপদ স্থানে চলে গিয়েছিলেন। তিনি কন্নৌজ ত্যাগ করে কালাঞ্জর কন্নৌজ ও গোয়ালিয়রের সীমানা ছাড়িয়ে আরো নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান নিয়েছিলেন। রাজধানী ত্যাগ করার আগে রাজার সকল ধন-সম্পদ সোনাদানা এমন জঙ্গলাকীর্ণ দুর্গম জায়গায় লুকিয়ে রেখে ছিলেন যেখানে সাধারণত লোকজনের আনাগোনা নেই। রাজার এই গুপ্ত ধনের খবর জানতো শুধু কন্নৌজের প্রধান পুরোহিত।

সুলতান মাহমূদের এক গোয়েন্দার প্রস্তাবে এই পুরোহিতকেই ধরে এনে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল। কন্নৌজ পৌঁছে রাজার ধন-সম্পদ সম্পর্কে আর কারো কাছে কোন তথ্য পাচ্ছিলেন না সুলতান মাহমূদ।

"আমরা জানতে পেরেছি তুমিই একমাত্র ব্যক্তি যে মহারাজার ধন-সম্পদ সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলে। তাই যদি হবে তাহলে মহারাজা তোমাকে না জানিয়েই চলে গেছেন এটা কি করে সম্ভব?" পুরোহিতকে প্রশ্ন করলেন গযনী বাহিনীর এক সেনাপতি।

"ধন-সম্পদের প্রতি যাদের বেশী ভালোবাসা থাকে সে মানুষের ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হয়। জবাব দিল পুরোহিত। যে রাজা নিজের দেবদেবী ও মন্দির অবমাননা, ধ্বংস ও অমর্যাদার জন্যে ফেলে রেখে নিজের প্রাণ ও ধন-সম্পদ নিয়ে পালিয়ে যেতে পারে তার কাছে একজন পুরোহিত কোন বিশেষ বৈশিষ্ট্য রাখে না। তার ধন রত্নের প্রতি যদি আমার আগ্রহ থাকতো তাহলে তো সকল ধন সম্পদ আজ আমার কজায় থাকতে পারতো। কিন্তু আমি সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করিনি আপনি ইচ্ছা করলে আমার সাথে যেতে পারেন। আমি আপনাকে সেই জায়গা দেখিয়ে দিতে পারবো। মন্দিরে অবশিষ্ট যা কিছু ছিল তা তো আপনার হাতে তুলে দেয়া হয়েছে।"

"তুমি কি এখন ইসলাম গ্রহণ করবে? জিজ্ঞেস করলেন সুলতান।"

"না, যেভাবে আপনার লোকেরা পাথরের মূর্তি মনে করে আমাদের দেবদেবীদের ভেঙ্গে মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়েছে আমাকেও সেভাবে টুকুরো টুকরো করে ধুলার সাথে মিশিয়ে দিন। আমি কোন অবস্থাতেই আমার ধর্ম ত্যাগ করবো না। আপনি যদি আপনার ধর্মের প্রতি সত্যনিষ্ঠ হয়ে থাকেন তবে অপর ধর্মের পণ্ডিতদের সাথে নিশ্চয়ই ভালো আচরণ করবেন। আমার বিশ্বাস আপনার ধর্মের মর্মবাণীও তাই বলে।"

"আমি তোমাদের ধর্মের পুরোহিতদেরকে আমার পায়ে পড়ে মাথা ঠেকাতে দেখেছি। কিন্তু আমি তোমার সাহস ও ধর্ম নিষ্ঠাকে সম্মান করি। গাদ্দার যে ধর্ম বা জাতিরই হোকনা কেন সে নিন্দার পাত্র।...ঠিক আছে পণ্ডিত? বলো, তুমি আমার কাছে কি প্রত্যাশা করো।"

"আমার প্রতি যদি অনুগ্রহের ইচ্ছা হয় তাহলে আমাকে আমার অবস্থার উপরে ছেড়ে দিন। আমি নিজের চোখে নিজ ধর্মের অমর্যাদা দেখে সহ্য করতে পারবো না। হয় আমি নিজেকে গঙ্গা মায়ের হাতে সপে দেবো, নয়তো জঙ্গলে গিয়ে বাকীটা জীবন জঙ্গলেই কাটিয়ে দেবো।"

"ঠিক আছে, যাও পণ্ডিত! জ্বলন্ত ফটকের মাঝ দিয়ে তুমি চলে যেতে পারো। তবে কখনো যদি তোমার রাজার সাথে দেখা হয় বলবে, "লড়াকু কোন শাসক তার প্রজা ও জাতির সাথে কখনো বেঈমানী করে না।"

পুরোহিত মাথা নীচু করে সুলতানকে কুর্ণিশ করে আর কোন কথা না বলে চলে গেল।

১০১৮ সালের ২ ডিসেম্বর সুলতান মাহমূদ কন্নৌজ অবরোধ করেন। কন্নৌজ রাজা রাজ্যপাল কখন রাজধানী ত্যাগ করে চলে গেলেন তা কেউই বলতে পারেনি। কন্নৌজ রাজার পিছু ধাওয়া করার কোন প্রয়োজন অনুভূত হয়নি। কন্নৌজ জয় করার কয়েক দিন পরই সেনাপতি আবুল কাদের সালজুকীকে কন্নৌজের শাসক নিযুক্ত করে সুলতান মাহমূদ গযনী ফিরে গেলেন।

যে পুরোহিত গঙ্গাজলে আত্মবিসর্জন দেবে নয় তো জঙ্গলবাসী হয়ে দিন কাটাবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, সে শহর থেকে বের হয়ে ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে বহু দূরে চলে গেল। সে অনেক দূরে এসে ঘোড়াকে নদীর মধ্যে নামিয়ে দিল। নদী গভীর ছিল বটে কিন্তু কোন স্রোত বা তরঙ্গ ছিল না। ঘোড়া তাকে সামনে থেকে সামনেই এগিয়ে নিয়ে যেতে লাগল কিন্তু পুরোহিত গঙ্গা জলে আত্মবিসর্জন করলো না। এক সময় ঘোড়া নদী সাঁতরে তাকে গঙ্গার অপর তীরে নিয়ে গেল। এপাড়টি ছিল ঘন জঙ্গল। পুরোহিত ঘোড়াকে বিশ্রাম এবং ঘাস খাওয়ার জন্যে ছেড়ে দিল। অনেকক্ষণ পর সে আবারো ঘোড়ার উপর আরোহণ করে গভীর জঙ্গলের দিকে অগ্রসর হলো। জঙ্গলের ভেতরে কোথাও ছিল ঘন ঝোপ-ঝাড় আর কোন জায়গা খালি ময়দান। পথিমধ্যে পুরোহিত আরো দু'তিনটি ছোট নদীও পাড় হয়ে এলো। কয়েকটি পাহাড়ী ঢালও সে অতিক্রম করল।

এক সময় সূর্য ডবে গেল। নেমে এলো রাতের অন্ধকার। কিন্তু পুরোহিতের ঘোড়া তখনও চলতেই থাকল। এক পর্যায়ে পুরোহিত আর এগুতো পারল না। বনছিল ঘন। সে ঘোড়া থেকে নেমে শুকনো গাছের লতাপাতা, মরা ডাল মরা গাছ টেনে-হেচড়ে জমা করে তাতে আগুন ধরিয়ে দিল। সময়টা ছিল প্রচণ্ড শীতের। শীতের প্রকোপ এবং রাতের বেলায় হিংস্র জীব-জন্তুর আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্যে চতুর্দিকে ডালাপালা জমা করে তাতে আগুন ধরিয়ে দিয়ে এর মাঝে পুরোহি বসে থাকল। তাতে সে শীত থেকেও বাঁচলো এবং আগুনের ভয়ে হিংস্র জীব-জন্তুও তার ধারে কাছে আসার সাহস করলো না।

সকাল বেলায় আবার সে ঘোড়য় সওয়ার হয়ে রওয়ানা হলো। এক পর্যায়ে পুরোহিত এমন এক জায়গায় পৌঁছাল যেখানে লতাগুল্ম সকল গাছ গাছালীকে পেচিয়ে দুর্ভেদ্য দেয়াল তৈরী করেছে। তাছাড়া এই লতাগুল্মের নীচেই গভীর খাদ। আর উঁচু গাছগুলোর ডালপালা এভাবে নীচে ঝুকে রয়েছে যে এগুলোর ভেতর দিয়ে সামনে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব।

এই অসম্ভবকে সম্ভব করেও ধীরে ধীরে ঘোড়া অগ্রসর হলো। কঠিন জায়গাটি বহু কষ্টে পারি দেয়ার পর আবারো জঙ্গলের ঘনত্ব কমে এলো। সামনে দু'টি পাহাড়ের ঢালে ময়দানের মতো একটা জায়গা দেখা গেল। দুই পাহাড়ের ঢালে পৌঁছে পুরোহিত একটি পথের সন্ধান পেল। এই পথটি দুই পাহাড়ের মাঝ দিয়ে পাহাড় দুটিকে পৃথক করেছে। এই জায়গাটি অতিক্রম করার পর আরো একটি পাহাড়ী পথ এলো। যেটি কখনো খাড়া দেয়ালের মতো উপরে চলে গেছে আবার কোথাও খাড়া পাহাড়ের ঢালের মতো নীচে নেমে এসেছে। পাহাড়ী এলাকাটি পাড় হওয়ার পর বহু দূরে তার চোখে পড়ল কিছু তাঁবুর উপর। অনেকগুলো তাবু থেকে একটু দূরে দুটি বাহারী সুন্দর তাঁবু তার নজরে পড়ল। তাঁবুর অদূরে কিছু সংখ্যক ঘোড়াও খচ্চর বাধা। পুরোহিত ঘোড়ার বাগ টেনে ঘোড়াকে চাবুক মারল, ঘোড়া উর্ধশ্বাসে ছুটে চললো, কিন্তু ততক্ষণে কয়েকজন লোক তীর ধনুক নিয়ে তার পথ আগলে দাঁড়াল।

"আরে এতো দেখছি পণ্ডিতজী মহারাজ! পিছন থেকে একজন চিৎকার দিয়ে বলল। আসুন! আসুন! আপনি কিভাবে এলেন? বাইরে কিছুটা শোরগোল

কথাবার্তা শুনে রাজ্যপাল তার তাবু থেকে বেরিয়ে এলেন। তার সাথে তার রানী ও ছেলে লক্ষণপালও বেরিয়ে এলো। এই জায়গাতেই মহারাজা রাজ্যপাল কন্নৌজ ত্যাগ করে আশ্রয় নিয়েছিলেন। রানী ও লক্ষণপাল ছাড়া রাজা তিনজন নর্তকীকেও সাথে নিয়ে এসেছিলেন। প্রায় পঞ্চাশজন একান্ত বিশ্বস্ত সৈন্য তিনি সাথে নিয়েছিলেন তার নিরাপত্তার প্রয়োজনে। এ ছাড়াও ছিল কয়েকজন কাজের লোক।

মহারাজা যে এ জায়গায় এসেছেন সে খবর পুরোহিতের জানা ছিল। জানা না থাকলে এখানে কারো পক্ষেই পৌঁছা সম্ভব ছিল না।

পুরোহিত ঘোড়া থেকে নামলে রাজ্যপাল তাকে হাত ধরে তার তাবুতে নিয়ে গেলেন। রানী ও লক্ষণপাল অবস্থা দৃষ্টে একজন অপরজনের চোখের দিকে তাকাল। তাদের চেহারায় উদ্বেগ আর হতাশা। হতাশ মনেই তারা নিজ নিজ তাঁবুতে চলে গেল।

"আপনি কি আমাকে জিজ্ঞেস করার সাহস রাখেন, আপনার রাজধানী এখন কোন অবস্থায় আছে? রাজাকে প্রশ্ন করলো পুরোহিত। আপনি কি একথা শোনার শক্তি রাখেন, মুসলমানরা কন্নৌজের মন্দিরগুলোকে কিভাবে ধ্বংস করেছে?

পুরোহিতের এসব কথা শুনে মহারাজা কন্নৌজ তার প্রতি ক্ষুব্ধ দৃষ্টিতে তাকালেন। রাজার মধ্যে কোন ধরনের পরাজয়ের গ্লানি কিংবা অসহায়ত্বের চিহ্ন ছিল না।

"আমি যখন কন্নৌজ ছেড়েছি তখন গোটা কন্নৌজই জ্বলছিল' বললো পুরোহিত। মন্দিরগুলো থেকে মুসলিম সৈন্যরা হরিকৃষ্ণের মূর্তি টেনে হেচড়ে বাইরে নিক্ষেপ করছিল এবং অন্য সৈন্যরা উল্লা... গুলোকে টুকরো টুকরো করে ভেঙে চুরমার করে দিচ্ছিল। আর আপনার রাজমহলে.........।

"থাক থাক, আপনি আমার জন্যে নতুন কোন খবর নিয়ে আসেননি পণ্ডিত মহাশয়! পুরোহিতকে থামিয়ে দিয়ে বললেন রাজা রাজ্যপাল। এ ব্যাপারে আমি আপনার সাথে অনেক কথা বলেছি। আমি আগেই জানতাম গযনীর সুলতান মাহমূদ লড়াইয়ে একজন পাকা লোক। আমি এ জানতাম কন্নৌজে যখন তার

সাথে লড়াই করার মতো কেউ থাকবে না, এবং আমাকেও সে তল্লাসী করে কোথাও পাবে না, তখন তার ক্ষোভ আরো বেড়ে যাবে; আর এই ক্ষোভ প্রশমিত করতে সে কন্নৌজে ধ্বংসযজ্ঞ চালাবে। সহজ জয়ে খুশী হওয়ার মতো ব্যক্তি সে নয়। আমি সুদূর প্রসারী চিন্তায় আমার শাহী মান-মর্যাদা আর কন্নৌজ শহরকে ধ্বংস হতে দিয়েছি। তদ্রূপ মন্দিরগুলোর ধ্বংসযজ্ঞের মধ্যেও আমার বিশেষ পরিকল্পনা আছে।"

"তা হয়তো ঠিক, কিন্তু আপনি আপনার ধনরাজি ধ্বংস হতে দেননি।" শ্লেষমাখা কণ্ঠে বললো পুরোহিত।

"পণ্ডিতজী! আপনার বিগড়ে যাওয়া দেমাগ ঠিক করার কোন চিকিৎসা আমার কাছে নেই। প্রত্যেক ব্যাপারে আপনি ধর্মকে টেনে আনেন। আমি জানি আপনি বলবেন, প্রজা সাধারণও রাজধানীর চেয়েও ধনসম্পদ আমার কাছে বেশী প্রিয়। কিছুক্ষণের জন্যে দেমাগ থেকে ধর্মের ভূত নামিয়ে ফেলুন। আমার সেই প্রশ্নের জবাব দিন; যে জন্যে আমি আপনাকে কন্নৌজ রেখে এসেছিলাম। আপনি সেই কাজ কতটুকু করতে পেরেছেন? আমার উদ্দেশ্য কি সফল হয়েছে?

"না, যে জন্যে আপনি বারোজন বিশেষ লোককে আমার কাছে রেখে এসেছিলেন সে কাজের কিছুই আমি করতে পারিনি। আপনি যে বারোজন লোক আমাকে দিয়ে এসেছিলেন; আপনি বলেছিলেন এরা সিংহের চেয়েও হিংস্র, এরা কোন মানুষকে ভয় করে না। ভগবান এদেরকে তৈরীই করেছে মানুষ হত্যার জন্যে। আপনি বলেছিলেন, এরা খুবই দূরদর্শী, যে কাউকে ধোকায় ফেলার জন্যে এদের জুড়ি নেই। এরা অনায়াসে মানুষ হত্যা করে গায়েব করে ফেলতে পারে, কেউ কোন নাম চিহ্নও খুঁজে পায় না। আপনি বলেছিলেন, এদেরকে দিয়ে আমি যেনো সুলতান মাহমূদকে হত্যা করাতে চেষ্টা করি। যদি তা সম্ভব না হয় তাহলে তার বড় বড় সেনা কর্মকর্তাদেরকে খুন করাতে বলেছিলেন, এও বলেছিলেন এদের দ্বারা কোন কোন ব্যক্তিকে খুন করতে হবে।"

"হ্যাঁ বলেছিলাম। আমি অধীর আগ্রহে শোনার জন্যে অপেক্ষা করছি, আপনি কোন কোন ব্যক্তিকে হত্যা করিয়েছেন?

“একজনকেও খুন করাতে পারিনি।’ জবাব দিলো পুরোহিত। আমি আপনার দেয়া বারোজন দুঃসাহসী লড়াকুকে গরীব শ্রমজীবীর বেশে আমার কাছেই রেখেছিলাম। মুসলমান সৈন্যরা শহরে প্রবেশ করার সাথে সাথেই লুটতরাজ শুরু হয়ে গেল। চারদিকে শুরু হলো খুনোখুনি আর অগ্নি সংযোগ। আমি দেখলাম, সেই বারো জনের মধ্যে দশজনই হাওয়া হয়ে গেছে। আমি মনে করেছিলাম এরা হয়তো তাদের কর্তব্য পালনে বেরিয়ে গেছে। কিছুক্ষণ পর আমি অবশিষ্ট দু'জনকে চলে যাওয়া দশজনের খোজ খবর নেয়ার জন্যে পাঠালাম। এরা এসে খবর দিলো, কর্তব্য পালনতো দূরের কথা ওরা অন্যান্যদের সাথে লুটতরাজে লিপ্ত হয়ে পড়েছে। এবং তাদের কয়েক জন শহর থেকেই চলে গেছে। আমি থেকে যাওয়া দু'জনকে জিজ্ঞেস করলাম, ‘তোমরা কি কাউকে হত্যা করতে পারবে?”

তারা জবাব দিলো, মহারাজা নিজে ধনসম্পদ নিয়ে শহর ত্যাগ করে চলে গেছেন। এই অবস্থায় আমরা কার জন্যে কাকে খুন করে নিজেদের জীবন ঝুকিতে ফেলবো? এক পর্যায়ে এরা দু'জনও আমার সঙ্গ ত্যাগ করে চলে গেল।’

একথা শোনার পর মহারাজা রাজ্যপালের মাথা নীচু হয়ে গেল।

“মহারাজ! আমি এদেরকে নিমক হারাম বলতে চাই না।’ বললো পুরোহিত। কারণ, তারা যার নিমক খেয়েছিল তিনি সেখানে ছিলেন না, কাজেই তারা জীবনের ঝুকি নেয়াটাকে সংগত মনে করেনি।

তাছাড়া আরেকটি ব্যাপার আছে মহারাজ! কোন বাদশাকে হত্যা করলেই তো তার সৈন্যদের পরাজিত করা যায় না, যদি সেই সৈন্যরা কোন আদর্শের পূজারী হয় এবং তাদেরও যদি আত্মমর্যাদাবোধ থাকে। আমি এখনও আপনাকে অনুরোধ করবো, যেসব সৈন্যদেরকে আপনি কন্নৌজ ছেড়ে বাড়ীতে চলে যাওয়ার হুকুম দিয়েছিলেন, এদেরকে এক জায়গায় জড়ো করে প্রস্তুত করুন। বারীকে আপনার রাজধানী ঘোষণা করুন, তাহলে সুলতান মাহমূদকে দেশছাড়া করা আপনার পক্ষে অসম্ভব হবে না। কারণ, যুদ্ধে যুদ্ধে কমতে কমতে গযনীর সৈন্য সংখ্যা এখন আর বেশী নেই। এ দিকে মহারাজা ভীমপাল গোয়ালিয়রের রাজা অর্জুন, কালাঞ্জরের রাজা গুন্ডা আপনার সহযোগী হবে। এদের

সহযোগিতায় সামান্য সংখ্যক মুসলিম সৈন্যকে আপনি ইচ্ছা করলে পিষে ফেলতে পারেন। আপনি জানেন, লোকেরা আপনার ক্ষমতা ও সিংহাসনকে খুবই মর্যাদার চোখে দেখে।"

"সবার আগে আমার দরকার লুকানো ধন-সম্পদ সেখান থেকে বের করে আনা। এরপর আমি চিন্তা করবো কি করা যায়। সারা জীবন এভাবে চুপ করে বসে থাকা তো আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

* * *

এরপর একদিন এক রাতের সফর শেষে কন্নৌজ রাজ রাজ্যপালের কাফেলা সেখানে পৌছালো পুরোহিত রাজার ধন-সম্পদ যেখানে লুকিয়ে রেখে ছিল। জায়গাটি ছিল পাহাড়ী কিন্তু উপর থেকে নীচের দিকে একটা ফাকা জায়গা ছিল। ফাকা জায়গাটা ছিল দেখতে অনেকটা কুয়ার মতো। পাহাড়ী গাছ গাছালি হেলে পড়ে শূন্য জায়গাটিতে ছায়া বিস্তার করে রেখেছিল। গুহার পাড়েও ছিল লতাগুল্ম জাতীয় গাছগাছালী। এগুলো গুহার উপর হেলে পড়ে দেয়ালের মতো তৈরী করেছে। গুহার ভেতরে কিছুটা পানির মতো ছিল। অবশ্য পানির চেয়ে কাদামাটিই ছিল বেশী। গুহার পাড় দিয়ে উপর থেকে যাওয়ার একটি ছোট্ট-রাস্তার মতো ছিল। রাস্তার দু'পাশে ছিল খাড়া পাহাড়। মূলত রাস্তাটি অনেকটাই ছিল বৃক্ষ লতাগুল্মে ঢাকা। গর্তের শুরুতেই একটি সুড়ং পথের মতো ছিল। আর সুড়ং পথের মুখটি ছিল খোলা। সুড়ং পথটি কিছু অগ্রসর হয়ে অরেকটি গর্তের মুখে গিয়ে শেষ হয়েছে। ওখানেই লুকানো ছিল কন্নৌজ রাজের ধন সম্পদ। কিন্তু ধনসম্পদের গর্তে যাওয়ার পথে একটি গভীর গর্ত খোড়া হয়েছিল, যে গর্তের ভেতরে রাখা হয়েছিল বিষাক্ত সাপ বিচ্ছু। সাপ বিচ্ছুর গর্তের উপর হালকা পাটাতন দিয়ে ঘাসের ধারা ঢেকে দেয়া হয়েছিল। যাতে কেউ গুপ্ত ধনের দিকে অগ্রসর হলে সাপের গর্তের উপরে পা রাখলেই পাটাতন ভেঙে সাপের গভীর গর্তে পড়ে যায়য়।

কন্নৌজ রাজ্যের একান্ত অনুগত নিরাপত্তারক্ষী এবং তার পরিবারবর্গ ও পণ্ডিত মিলে একটি ছোট্ট কাফেলা বিজন এই পাহাড়ী জঙ্গলাকীর্ণ জায়গায়

উপস্থিত হলো। তাদের কাফেলায় অনেকগুলো খচ্ছর গাধা এবং ঘোড়া ছিল। পুরোহিত যখন এই জায়গায় রাজার ধন-সম্পদ লুকাতে এসেছিল তখন রাতের অন্ধকারে কিছু সংখ্যক লোককে চোখ বেধে খচ্চর ও ঘোড়ার পিঠে করে লোকগুলোকে একটি রশি দিয়ে বেধে এনেছিল। কিন্তু এখন আর কারো চোখ বাধা ছিল না এবং গুপ্ত ধনের গুহায় যাওয়ার আগে সাপের গভীর গর্তে যাতে কেউ পড়ে না যায় তাই একটি লম্বা চওড়া কাঠের তক্তা সেটির উপর রেখে দেয়া হলো। আগে পুরোহিত গুপ্তধনের গুহায় প্রবেশ করল এবং পরে অন্যান্য রাজকর্মচারীদেরকে ডেকে নিল। কর্মচারীরা বাক্স ভর্তি ধনভাণ্ডার গুহা থেকে বাইরে এনে গাধা ও খচ্চরের পিঠে বোঝাই করছিল। কন্নৌজের রাজা মহারাজারা বংশানুক্রমে যে ধনরত্ন সোনাদানা জমা করেছিল মহারাজা রাজ্যপাল সেগুলোকেই গণ মানুষের চক্ষুর আড়ালে একমাত্র প্রধান পুরোহিতের জ্ঞাতসারে তার মাধ্যমে এ জায়গায় লুকিয়ে রেখেছিলেন।

বাপ দাদাদের সঞ্চিত সম্পদের সাথে মহারাজা রাজ্যপালের আমলে আরো বিপুল বিত্ত যুক্ত হয়েছিল। মনের পর মন সোনা রুপা, সোনার মোহর এবং মণিমুক্তা ছিল। বাক্সের ভেতরে ভরা এসব ধনরাজি গুহা থেকে বের করে আনতে বিশ গুণের মত লোককে কয়েকবার গুহার ভেতরে প্রবেশ করে বাক্স বাইরে এনে গাধা খচ্চর বা ঘোড়ার পিঠে উঠাতে হয়েছে। শেষ বাক্সটি যখন গর্ত থেকে বের করে এনে বহনকারী জন্তুর পিঠে বেধে দেযা হলো, তখন পুরোহিত বাক্স বহণকারীদেরকে পুনরায় গর্তের ভেতরে নিয়ে গিয়ে নিজে বাইরে চলে এলো এবং সাপের গর্তের উপর রাখা তিনটি তক্তা খুব দ্রুততার সাথে টেনে এ পাশে নিয়ে এসে এগুলোকে শক্তির জোড়ে গর্তের বাইরে নিয়ে এলো। বাইরে এসে বললো−

"চলুন মহারাজ!"

রাজা রাজ্যপাল বললেন। "ওরা কোথায়?"

"ওরা আর কখনো বাইরে আসতে পারবে না।" বললো পণ্ডিত। ওদেরকে গর্তের ভেতরে ঢুকিয়ে তক্তা বের করে ফেলেছি। এরা যদি বাইরে বের হতে চায় তাহলে সাপের গর্তের ভেতরে পড়বে। এক দু'জন গর্তে পড়লে আর কেউ বাইরে বের হওয়ার দুঃসাহস করবে না। ক্ষুধা পিপাসায় গুহার ভেতরেই মারা যাবে।

এদেরকে এভাবে হত্যা না করে মোটা অংকের পুরস্কার দিয়ে কি খুশী করা যায় না? যেন তারা আর আমার ধনরত্নের প্রতি লোভ না করে। বললেন মহারাজা রাজ্যপাল। ওদের অসহায় অভিপাশ না নিলে হয় না?"

"মহারাজ! এই সম্পদের জন্য আপনি আপনার রাজত্ব আত্মমর্যাদা সবই বিসর্জন দিয়েছেন, অনুরূপ এই বিত্ত বৈভব দেখে ওরা আমাকে আপনাকে এবং রানী ও রাজকুমারকে হত্যা করার চিন্তা করতেই পারে। এতো বিশাল সম্পদ থেকে সামান্য কিছু নিয়ে সন্তুষ্ট হতে পারে না। দেখুন না, সম্পদ জড়ো করতে আপনি কি আপনার প্রজাদের প্রতি কখনো দয়া পরবশ হয়েছেন? মানুষ যখন ক্ষমতার মসনদে বসে এবং মাথায় রাজমুকুট রাখে তখন প্রজাদের দুঃখ ও অভাবের কথা সম্পূর্ণ ভুলে যায়। তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে আরো বেশী ধনরত্ন এবং ক্ষমতা কুক্ষিগত করার প্রতি। তখন সেই ক্ষমতাবান লোকেরা বুঝে ঠিকই কিন্তু বিবেক দিয়ে চিন্তা করে না। আজ আপনি এই পর্যায়ে এসে পৌঁছেছেন। আপনি ভীতু শিয়ালের মতো লুকিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন, আপনার জন্য জীবন দিতে প্রস্তুত স্বগোত্রীয় এবং স্বধর্মীয় প্রজাদেরকে শত্রুদের দয়ার উপর ছেড়ে এসেছেন।

"পণ্ডিত মহাশয়! বারবার আপনি আমাকে অপমান করছেন। দেখবেন আমি আপনাকে একটা কিছু করেই আমার সিদ্ধান্তের যথার্থতা প্রমাণ করবো। বললেন মহারাজা রাজ্যপাল।

"হ্যাঁ, এজন্য তো আমি এখনো আপনার সাথে রয়েছি যে, আপনি একটা কিছু করে দেখাবেন।" বললো পুরোহিত।

আপনি কি ভুলে গেছেন, কন্নৌজে সিংহাসন হিন্দু জাতির গর্ব, অহংকার আত্মমর্যাদা, রণাঙ্গনের বীরত্ব, জ্ঞান বিজ্ঞান ও হিন্দুস্তানের মর্যাদার প্রতীক। হিন্দুস্তানের সকল রাজা মহরাজা আপনাকে তাদের নেতা মনে করে। আপনি নিজেও তা উপলব্ধি করেন। তাই আমি চাই আপনি এই জঙ্গল থেকে বের হোন।

ঠিক আছে পণ্ডিত মশাই! আপনি যা চান তাই হইবে। বললেন রাজ্যপাল।

এখন চলুন মহারাজ। এখানে থাকা নিরাপদ নয়।

মহারাজের জয় হোক। রাজাকে উদ্দেশ্য করে পুরোহিত বললো।

পুরোহিত যখন তক্তা টেনে গর্তে প্রবেশকারীদের বের হওয়ার পথ বন্ধ করে দিয়ে চলে এলো, তখন গর্তের ভেতরে আটকেপড়া লোকগুলো কাতর কণ্ঠে পুরোহিতকে ডাকছিল। কিন্তু পুরোহিত ও রাজা রাজ্যপাল তখন ধন-রত্ন বোঝাই করা ঘোড়া ও খচ্চরগুলোকে সারি করে বেঁধে সেখান থেকে চলে যাচ্ছিলো। ক্রমশ বাড়ছিলো তাদের মধ্যে ও গর্তে আটকে পড়াদের মধ্যে দূরত্ব। ক্ষীণ হয়ে আসছিল তাদের করুণ আর্তনাদ।

এরপর রাজা ও পুরোহিতের দুর্গম কঠিন জঙ্গলাকীর্ণ পথ অতিক্রম করতে হচ্ছিল যেখানে সাধারণ মানুষের যাতায়াত দুঃসাধ্য, শুধু বনের হিংস্র জীব জন্তুরাই যেখানে অবাধে বিচরণ করে।

পণ্ডিতজী! আপনার মহানুভবতায় আমার মাথা আপনার কাছে ঝুঁকে আসছে। আমি আপনাকে এমন বিরল পুরস্কারে ভূষিত করতে চাই যা কেউ কোনদিন আমার কাছ থেকে পায়নি এবং পাবার কল্পনাও করতে পারে না। পুরোহিতে উদ্দেশে বললেন রাজ্যপাল। আপনি নিজেই বলুন। আমি আপনাকে কি পুরস্কার দিতে পারি?"

"একটা পুরস্কার অবশ্য আছে, যে পুরস্কার আজ পর্যন্ত কোন রাজা বাদশা কোন সুহৃদ বন্ধু কিংবা আস্থাভাজনকে দেননি। এবার আপনি ইচ্ছা করলে তা দিতে পারেন।"

বলুন পণ্ডিত মশাই! কি সেই পুরস্কার? অবশ্যই তা আমি আপনাকে দেবো বলুন! অবশ্যই বলুন!

"সেই পুরস্কার হলো গযনী সুলতানের দ্বিখণ্ডিত মস্তক।" বললো পুরোহিত।

"পুরোহিতের কথা শুনে মহারাজা রাজ্যপালের হাসি পেল। এ মাথা যদি শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তাহলে হিন্দুস্তান ভবিষ্যত আক্রমণের শিকার হওয়া থেকে শুধু নিরাপদ হবে না, হিন্দুস্তানে ইসলামের প্রচার প্রসারও চিরদিনের জন্যে রুদ্ধ হয়ে যাবে, বললো পুরোহিত। সুলতান মাহমূদের মৃত্যুতে আমাদের এই ভারতমাতা চিরদিনের জন্যে পবিত্র হতে পারে। অবশ্য আমার আশঙ্কা হয় আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মকেও আমাদের মতো মুসলমানদের

প্রতিরোধে লড়াই করতে হবে। যুদ্ধ বিগ্রহ হবে, ভারতমাতার সুপুত্রদের রক্ত ঝরবে, তবুও ইসলাম এই মাটি থেকে চিরবিদায় হবে না। আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে যদি ভগবান সত্যিকারের বুদ্ধিমত্তা দান করেন, তাহলে তারা এভাবে যুদ্ধ করে মরবে না বরং মুসলমানদের নিশ্চিহ্ন করতে অন্য কোন পদ্ধতি অবলম্বন করবে। আমরা যদি ভারতমাতার উপর থেকে মুসলমানদের বিতাড়িত করতে নাও পারি; কিন্তু এদের বিরুদ্ধে যদি হিন্দুদের মধ্যে ঘৃণা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করতে পারি তবুও আমাদের কর্তব্য কিছুটা পালিত হবে। যাতে কোন হিন্দু ইসলাম গ্রহণ করা তো দূরে থাক কোন মুসলমানের সংস্পর্শে যাওয়াটাকেও এতটুকু ঘৃণা করবে যেন সে অপবিত্র হয়ে গেছে।"

"পণ্ডিত মহারাজ! আপনি সবসময় সব কথাতেই ধর্মের কথা টেনে আনেন। কিন্তু আমি নিজেই এখন ধর্মের প্রতি বিতৃষ্ণ হয়ে গেছি। হরিহরি মহাদেব আর হরিকৃষ্ণ আমাদের কি উপকারটা করতে পারলো, বলুন তো? আপনি আমাদের সব সময় দেব-দেবীদের ক্ষোভের ভয় দেখান, তাদের কি শুধু ক্ষোভ ক্রোধই আছে? তাদের মধ্যে কি দয়া মায়া নেই? প্রতিটি যুদ্ধে শুধু মুসলমানরাই জয়ী হচ্ছে। আমাদের লোকেরা জীবন বাজি রেখে যুদ্ধ করেও একটি ক্ষেত্রেও বিজয় অর্জন করতে পারছে না। আপনার সেই মহাদেবের ক্রোধ কি একবারও ওই মুসলমানদের উপর গিয়ে পড়তে পারে না?"

"মহারাজ! এটা হলো দেব-দেবীদের রহস্য। মানুষ যখন দেবদেবীদের নির্দেশ পালন করে না, তখন তাদের মনের মধ্যে দ্বিধা সংশয় সৃষ্টি করে দেয়। ফলে তারা আপনার মতো ভগবানের বিরুদ্ধে দেবতাদের বিরুদ্ধে কথা বলতে শুরু করে।

ধনরত্ন বোঝাই ঘোড়া ও অন্যান্য ভারবাহী জন্তুগুলো ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছিল। গভীর অরণ্য দিয়ে পথ চলার কারণে দূর থেকে তাদের কানে ভেসে আসছিল সিংহের গর্জন এবং হায়েনার চিৎকার। মাঝে মাঝে বাঘের হুংকারও শোনা যাচ্ছিল। ঘোড়া ও ভারবাহী খচ্চরগুলো ঘন বনজঙ্গলের দুর্গম পথ মাড়াতে মাড়াতে ভীত বিহ্বলতার মধ্য দিয়েই অগ্রসর হচ্ছিল। পথ চলতে চলতে মহারাজা রাজ্যপাল বললেন,

"আমি আমার রাজ্যের মন্দিরগুলো হিরা মণিমুক্তা দিয়ে সাজিয়েছি, ঋষী, পণ্ডিত সাধু সন্ন্যাসীদের আমি দুহাতে উপহার উপঢৌকনও দিয়েছ এবং সেবা

করেছি। তাদের সকল নির্দেশ ও চাহিদা পূরণ করেছি। আপনার মন্দিরের সকল মূর্তিগুলোকে আমি মণিমুক্তা-সোনা দিয়ে কারুকার্য করে তুলেছি এবং সবচেয়ে দামী সুগন্ধি দিয়ে গোসল করিয়েছি....

কিন্তু কোথায় আজ আমার সেইসব সেবার পুরস্কার? কোথায় আজ আমার সিংহাসন? কোথায় আমার রাজমুকুট, রাজত্ব? যে কন্নৌজ রাজের জয়গান গাইতো সারা হিন্দুস্তান, সেই রাজসিংহাসনের জাকজমকপূর্ণ দাপট এখন কোথায়? আমার মাথায় কেন এমন বুদ্ধি এলো যে, আমি কন্নৌজে মুসলিম বাহিনী প্রবেশের আগেই রাজত্ব ত্যাগ করে পালিয়ে এলাম? পালাতে আমাকে কে প্ররোচিত করলো?

"ধনরত্নের প্রতি অত্যধিক ভালোবাসাই আপনাকে রাজধানী ও সিংহাসন ত্যাগে প্ররোচিত করেছে মহারাজ? বললো পুরোহিত। তাছাড়া আপনি মানসিক শক্তি হারিয়ে ফেলেছেন। মুসলমানদের সাথে মোকাবেলা করার মানসিক শক্তি ওদের সাথে মোকাবেলা না করার আগেই নিঃশেষ হয়ে গেছে।

"ওসব কথা রাখেন পণ্ডিতজী! আমার প্রশ্নের সত্যিকার জবাব আপনি দিতে পারবেন না। আমিও জানি না আমার প্রশ্নের জবাব কি হবে? বললেন রাজা রাজ্যপাল।

"পণ্ডিতজী! আজো পর্যন্ত আপনি আমাকে বুঝাতে পারেননি, সনাতন ধর্মটা আসলে কি? ধর্ম বলতে আমি শুধু এতটুকু বুঝেছি, কোন রাজা যদি কোন মন্দিরে যাতায়াত করে তাহলে প্রজারা তাকে ভালো জানে, তাকে ধর্মানুরাগী ভাবে। এই বয়সে আমি বুঝতে পেরেছি, ধর্মের নামে প্রজা সাধারণকে ধোঁকা দেয়া খুব সহজ। ক্ষমতাসীনদের হৃদয়ে ধর্মপ্রীতি থাক আর না থাক কিন্তু ধর্মানুরাগী ভাব দেখালেই প্রজারা বিগলিত হয়ে যায়। সারা হিন্দুস্তান জুড়ে কন্নৌজ রাজের প্রশংসা করার প্রধান কারণ হলো, আমার বাপদাদার আমল থেকে কন্নৌজের প্রধান মন্দিরের মূর্তিগুলোকে জাফরান মিশানো মেশকে আম্বর দিয়ে গোসল করানো হতো। বাপদাদার আমল থেকে চলে আসা এই ধর্মীয় রীতিকে আমিও চালু রেখেছিলাম। এজন্যই লোকেরা আমাকে কন্নৌজের যোগ্য উত্তরসূরী মনে করে প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিল। আমি রীতি অনুযায়ী বছরে কয়েকবার বিশেষ অনুষ্ঠানে মন্দিরে পূজা দিতাম বটে কিন্তু এগুলো করতাম

নিছক প্রথা পালনের জন্যে। এই ধর্মের প্রতি কখনোই আমার কোন অনুরাগ ছিল না। সনাতন ধর্ম কখনো আমার অন্তরে প্রশান্তি দিতে পারেনি।"

"আপনি পথভ্রষ্ট হয়ে গেছেন মহারাজ?"

'হ্যাঁ আমি পথভ্রষ্ট হয়ে গেছি পণ্ডিত। পথভ্রষ্ট আমি আজ হইনি। আপনার কি স্মরণ নেই মথুরার প্রধান মন্দিরের প্রধান মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে আপনাকে আমি বলেছিলাম, আমার সাথে আপনি কখনো ধর্ম নিয়ে কথাবার্তা বলবেন না। এসব দেবদেবীর নাম আমার সামনে উচ্চারণ করবেন না। হ্যাঁ, হিন্দু রাজা মহারাজাদের মধ্যে ঐক্য গড়ে তোল এবং গযনীর সুলতান মাহমূদের বিরুদ্ধে লড়াই করো, এ ধরনের কাজের কথা বেশী করে বলুন। এতে কিছু ফায়দা হলেও হতে পারে। কিন্তু ওসব কথায় তো কাজ হলো না। সম্মিলিত বাহিনী গঠন করেও তো শোচনীয়ভাবে পরাজিত হতে হলো। শুনেছি, লাহোরের মহারাজা জীবন্ত মানুষ জবাই করে দেবদেবীদের নামে উৎসর্গ করেছে। একটি যুবতী মেয়েকে বলি দিয়ে তার তাজা রক্ত দিয়ে দেবদেবীদের পা ধুইয়ে দিয়েছে কিন্তু তার পরও তো তারা মারাত্মকভাবে পরাজিত হয়েছে।"

"আপনি যাই মনে করুন না কেন, আমাদের ধর্মের যাদুকরী প্রভাব আমি আপনাকে দেখিয়ে দেবো" বললো পুরোহিত।

"অনেক হয়েছে পণ্ডিতজী! আমাকে আর আপনার ধর্মের কারিশমা দেখাতে হবে না। আমি আপনার ধর্মের কারিশমা দেখে ফেলেছি। বললেন মহারাজা রাজ্যপাল।

"আমাকে একথাটি বুঝান তো, মুসলমানরা এতো দূর থেকে সামান্য কিছুসংখ্যক সৈন্য নিয়ে এসেছে, তাদের না আছে প্রয়োজনীয় রসদসামগ্রী, না আছে কোন সাহায্যের ব্যবস্থা। তারপরও কীভাবে একেরপর এক রাজ্য দখল করে নিচ্ছে। প্রতিটি যুদ্ধে তারাই বিজয়ী হচ্ছে? হিন্দুরা কেন প্রতিটি ক্ষেত্রেই পরাজিত হচ্ছে? আমি জানি, আপনার কাছে এর কোন সদুত্তর নেই।"

কিন্তু আমি আপনাকে এর জবাব বলে দিতে পারি। আপনার হয়তো মনে আছে, একবার আমার লোকেরা একজন মুসলমান গোয়েন্দাকে ধরে এনেছিল। তখন আপনি আমার কাছেই ছিলেন। আমি সেই গোয়েন্দাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তোমাদের সেনাবাহিনী এবং তোমার সঙ্গীরা কোথায় আছে? এবং

তোমার সুলতানের পরবর্তী টার্গেট কি? আপনার হয়তো মনে আছে, সে কি জবাব দিয়েছিলো।

"জী হ্যাঁ, আমার স্মরণ আছে। বললো পুরোহিত। সে বলেছিল, আমার শরীরকে যদি টুকরো টুকরোও করে ফেলো, তবুও আমি তোমাদের কোন প্রশ্নের জবাব দিতে পারবো না। জবাব দেবো না।"

"এছাড়া সে কি আর কিছু বলেনি?" জিজ্ঞাসু কণ্ঠে বললেন রাজা।

আমি তাকে সোনার বড় একটি টুকরো দেখিয়েছিলাম, সেটি তাকে দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, রাজমহলের সবচেয়ে সুন্দরী মেয়েটাকে তার সাথে বিয়ে দেয়ার লোভ দেখিয়েছিলাম। এমনকি সুন্দরী এক মেয়েকে তার কাছে পাঠিয়েও দিয়েছিলাম, কিন্তু কিছুতেই সে প্রলুব্ধ হচ্ছিল না। বরং সে বিদ্রূপের হাসি হেসে বলেছিল, "মহারাজা! এসব সোনাদানা দিয়ে আমার ঈমান খরিদ করতে পারবেন না। এমন নোংরা বহুগামী নর্তকী দিয়ে আমাকে বিভ্রান্ত করতেও পারবেন না। ঈমানকে এসব দিয়ে কেনা যায় না। আমার প্রভুর কাছে আমি এসবের চেয়ে অনেক বেশী পুরস্কার পাবো, ন্যূনতম সত্তরজন কুমারী সুন্দরী নারী আল্লাহ আমাকে দেবেন। তাছাড়া মণিমুক্তা হীরা জহরাত দিয়ে সাজানো একটি প্রাসাদ আমাকে দেয়া হবে। আপনার এক টুকরো সোনা দিয়ে আমি এত বড় পুরস্কার থেকে বঞ্চিত হতে পারি না। এটাই আমার ঈমান ও বিশ্বাস।

এরপর আপনি একটি বাক্স নিয়ে এলেন। এটির মধ্যে ছিল একটি বিষাক্ত সাপ। আপনি বিষাক্ত সাপটি দেখিয়ে বলেছিলেন, তুমি যদি কথা না বলো, তাহলে আগামীকাল একটি বদ্ধ ঘরে আবদ্ধ করে এই সাপটি ছেড়ে দেয়া হবে। বিষাক্ত সাপটি তোমাকে ছোবল দেবে, বিষাক্ত সাপের একের পর এক দংশনে তোমাকে ধুকে ধুকে মরতে হবে। কিন্তু তাতেও সেই গোয়েন্দার মধ্যে সামান্যতম ভাবান্তর দেখা গেলো না। সে বরং আপনার হুমকির জবাবে বলেছিলো, "দুনিয়ার কোন সাপ বিচ্ছু ঈমানকে ছোবল দিতে পারে না।"

তখন আমি রেগে গিয়ে বলেছিলাম, ঠিক আছে আগামীকালই দেখা যাবে ঈমানকে বিষাক্ত সাপ ছোবল দিতে পারে কি-না।.......

এর পরদিন আপনি একটি ছোট্ট কক্ষে তাকে আটকে বিষাক্ত সাপটি কক্ষে ছুঁড়ে দিয়েছিলেন। লোকটি বিষাক্ত সাপের দংশনে ছটফট করতে করতে মারা

গেল কিন্তু একটিবারও বাঁচার জন্য উহ্ শব্দটা পর্যন্ত করলো না। তার সেনাবাহিনী সম্পর্কে কোন কথা বললো না।

"হ্যাঁ মহারাজা! আমার মনে আছে আমিই তাকে একটি কক্ষে ভরে বিষাক্ত সাপ দিয়ে হত্যা করেছিলাম।"

"এটাই তো মুসলমান! আর এমনই হলো তাদের ঈমান। আছে হিন্দুদের মধ্যে এমন কেউ? পণ্ডিতজী! ঈমান জিনিসটা কি?"

"আমরা যেটাকে ধর্ম বলি, এটাই হচ্ছে ঈমান", বললো পুরোহিত। এমন ঈমান আমাদের মধ্যেও সৃষ্টি হতে পারে।

"সবই কথার কথা পণ্ডিত মশাই, সবই ফাঁকা বুলি" বললেন, মহারাজা রাজ্যপাল। "আপনি শুধুই কথায় কথায় ধর্মের দোহাই দেন। সারাক্ষণ ধর্ম ধর্ম জপেন। আর সাপ নিয়ে খেলা করেন। আপনি সাপ ধরে সাপকে বশ মানাতে এবং সাপকে পালতে পারেন। মূলত এগুলো সাধারণ মানুষকে চমক দেখানোর খেলা মাত্র। এসবের মধ্যে ধর্মের কিছু নেই।

মহারাজা রাজ্যপাল সর্বপ্রথম যখন তার ধনভাণ্ডার গুপ্ত স্থানে লুকানোর চেষ্টা করছিলেন তখন সুলতান মাহমূদ খুবই সতর্কতার সাথে তার সৈন্যদের নিয়ে কন্নৌজের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন। সুলতানকে বলা হয়েছিল, কন্নৌজে তাকে সবচেয়ে কঠিন মোকাবেলার সম্মুখীন হতে হবে। কোন গোয়েন্দা তাকে বলতে পারেনি, প্রকৃতপক্ষে কন্নৌজে কোন মোকাবেলা হবে না। মহারাজা রাজ্যপাল মাত্র কয়েকজন সৈন্য রাজধানীতে রেখে নিজে রাজ্য ত্যাগ করবেন এটা কেউ স্বপ্নেও ভাবেনি। এটা কেউ চিন্তাও করেনি যে, সাধু বেশধারী এই পুরোহিত চক্রান্ত করে সুলতান বা তার সেনাবাহিনীর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের হত্যার নীল নক্সা করেছিল।

পাঠকদের নিশ্চয়ই মনে আছে, প্রথম যখন এই পুরোহিত রাজার সম্পদ লুকাতে যায় তখন গযনীর দুই গোয়েন্দা তা দেখেছিল। লোভে পড়ে একজন মারা গিয়েছিল কিন্তু অপরজনের সাথে পুরোহিতের অনেক কথা হয়। সেই সূত্রেই পুরোহিত গোয়েন্দাকে বিভ্রান্তিকর তথ্য দেয় যে, কন্নৌজে কয়েক মহারাজার সৈন্য একত্রিত হয়েছে, এখানে তোমাদের বাহিনী এলে সবাইকে হিন্দু সৈন্যরা পিষে ফেলবে।

গোয়েন্দা সালেহ্ সেই সংবাদকে সত্য মনে করে সুলতানকে এই খবর দিয়ে আরো বেশী সতর্ক হতে পরামর্শ দিয়েছিলো। ফলে সুলতান অত্যন্ত সতর্কতার সাথে চতুর্দিক বিবেচনা করে গুণে গুণে প্রতিটি কদম ফেলেছিলেন। এই ফাঁকে মহারাজা রাজ্যপাল কন্নৌজ থেকে পালানোর সুযোগ পেয়েছিলেন। পুরোহিত চেয়েছিলো, একটা সময়ে সে রাজ্যপালকে যুদ্ধে প্ররোচিত করতে পারবে। কিন্তু রাজ্যপাল যুদ্ধ থেকে সম্পূর্ণ মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন। সুলতান মাহমূদ যদি তার স্বভাবসুলভ দ্রুতগতিতে কন্নৌজের দিকে অগ্রসর হতেন, তাহলে রাজ্যপাল ফেরার হওয়ার আগেই তিনি কন্নৌজ পৌছে যেতে পারতেন। কিন্তু পুরোহিতের বিভ্রান্তিকর তথ্য সুলতান মাহমূদকেও প্রভাবিত করতে সমর্থ হয়। তিনি সম্ভাব্য কঠিন মোকাবেলার প্রস্তুতিস্বরূপ খুব সতর্ক ও সচেতনভাবে ধীর-স্থিরভাবে অগ্রসর হচ্ছিলেন। যাতে দ্রুততার কারণে শত্রুপক্ষ মুসলিম বাহিনীর কোন ক্ষতি করতে না পারে।

অবশেষে রাজা রাজ্যপাল ও পুরোহিত তাদের লুকানো ধনরাজী তাদের কাঙ্ক্ষিত ঠিকানা পর্যন্ত নিয়ে যেতে সক্ষম হলো। রাজ্যপাল যেখানে অবস্থান করছিলেন সেখানে প্রাকৃতিক ভাবেই একটি গর্তের মতো জায়গা ছিলো। সেটিকে আরো খনন করে এবং আরো গভীর করে রাতের বেলায় রাজ্যপালের নিরাপত্তারক্ষীদের মধ্যে অতি বিশ্বস্ত চার পাঁচজনকে দিয়ে সেই গর্তে ধনরত্ন রাখা হলো।

এর পরবর্তী রাতে রাজ্যপালের তাঁবুতে জমজমাট নাচগানের আসর বসলো। শরাবের আয়োজন রাজার সাথেই ছিলো। রাতের অন্ধকারে প্রচুর মশাল জ্বালিয়ে বিজন জঙ্গল ভূমিকে রাজপুরী বানিয়ে ফেলা হলো। বাদক দলের বাজনার তালে তালে রাজার বিশেষ নর্তকীরা দেহ উজাড় করে নাচলো গাইলো। রাজার সকল নিরাপত্তারক্ষীকেই প্রচুর পরিমাণে উপহার উপঢৌকন দেয়া হলো। বিশেষ করে যারা ধন-রত্ন লুকানোর কাজে জড়িত ছিলো তাদেরকে রাজ্যপাল বিপুল পরিমাণ সোনাদানা দিয়ে খুশী রাখতে চাইলেন। কারণ, এখন রাজ্যপালের জীবন সম্পদ তাদের বিশ্বাস ও আস্থার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল।

রাতের এই আসরে দু'জন লোক অনুপস্থিত ছিলো। একজন পণ্ডিত আর দ্বিতীয়জন তার প্রথম ও প্রধান রাণী। মহারাজা রাজ্যপাল এই দুজনের

অনুপস্থিতিকে কিছুই মনে করেননি। পুরোহিত তার তাঁবুতে পূজা-অর্চনায় লিপ্ত ছিলো। সে ছোট দু'টি পুতুলের মতো মূর্তি তার সাথে নিয়ে এসেছিল। পুরোহিত যখন পূজায় মগ্ন এমন সময় রাণী তার তাঁবুতে প্রবেশ করলেন। বড় রাণীর দেহে বার্ধক্যের ছাপ পরিষ্কার হয়ে উঠেছিল। মহারাজা এই রাণীকে বেশ গুরুত্ব দিতেন, যেহেতু রাজার স্থলাভিষিক্ত রাজকুমার লক্ষণ পালের জন্মদাতা মা তিনি। রাণী এসে পুরোহিতের পাশে হাঁটু গেড়ে বসে গেলেন।

"মহারাণী! আপনি কি বুঝতে পেরেছেন মহারাজার ভবিষ্যত পরিকল্পনা কি? রাণীকে জিজ্ঞেস করলো পুরোহিত। এটা কি আনন্দ উৎসব আর শরাব পান করে নর্তকী নাচানোর সময়?"

"না আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। এখন আমি মহারাজাকে নিয়ে ভাবছি না। আমার সকল মনোযোগ এখন রাজকুমারকে কেন্দ্র করে। আমার কলিজার টুকরো রাজকুমারের ভবিষ্যত অন্ধকার। বারী এখনো আমাদের হাতে আছে। ইচ্ছা করলে আমরা একে কন্নৌজের মতো রাজধানীতে রূপান্তরিত করতে পারি। কারণ, কন্নৌজ আর আমাদের পক্ষে ফিরে পাওয়া অসম্ভব। ..... আমি তো মনে করছি মহারাজার মাথা বিগড়ে গেছে। আমি তাকে কোন কথা জিজ্ঞেস করলেই তিনি আমাকে ধমকে দেন।

"তোমার সাথে রাজনীতির কি সম্পর্ক? পণ্ডিত মহারাজ! এ সময়ে আপনি কি কিছু করতে পারেন না? আপনি যাদুটোনা করে কিছু একটা দেখান না। আপনার তো অনেক ক্ষমতা আছে।"

"হ্যাঁ, রাণী। আমিও তাই ভাবছিলাম। মহারাজার চিন্তা চেতনাকে কাবু করতে হবে। বললো পুরোহিত। আমি হিসাব করে দেখেছি, দেবীর চরণে একটি নর বলি দেয়া দরকার। একটি কুমারীর রক্ত ঝরাতে হবে।"

"কুমারী মেয়ে কোথায় পাওয়া যাবে?"

"তেমন মেয়ে আমি দেখেছি। ওই যে সবচেয়ে ছোট নর্তকীটা আছে না, যার নাম নদী।"

"আপনি তাই করুন। আপনি যখন চাইবেন তখনই ওকে বলি দিতে পারেন। ও সুন্দরী ও তরুণী। হ্যাঁ এমন মেয়েকেই নর বলি দেয়া উচিত। বললেন রাণী।

* * *

বারী কন্নৌজ থেকে দুই তিন দিনের দূরত্বে গঙ্গা নদীর তীরবর্তী একটি জনপদ। এলাকাটি ছিল কন্নৌজের অধীনস্থ। অধিকাংশ ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, কন্নৌজ ত্যাগ করে কিছুদিন দুর্গম জঙ্গলে স্বেচ্ছা নির্বাসনে কাটানোর পর মহারাজা রাজ্যপাল বারীকে তার রাজধানী করেছিলেন এবং তার ছেলে লক্ষণপালকে সেখানে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। লক্ষণপাল সেখানে গিয়ে বারীকে পরিপূর্ণ রাজধানীতে পরিণত করার জন্যে বিভিন্ন ধরনের ইমারত নির্মাণ করেছিল। মহারাজা রাজ্যপাল আগেই তার সেনাবাহিনীকে বারী পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু নির্বাসনে থাকাবস্থায় তিনি সিদ্ধান্ত নিতে পারছিলেন না আসলে তিনি কি করবেন। কারণ, সুলতান মাহমূদের আতঙ্ক তার মনে ভূতের মতোই গেড়ে বসেছিলো। ঐতিহাসিক আলজওযী তো একথাও লিখেছেন, পর্দার অন্তরালে মহারাজা রাজ্যপাল ইসলাম গ্রহণের প্রতিও আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন।

স্বেচ্ছা নির্বাসনে মহারাজার প্রায় মাস দুয়েক কেটে গেছে। এ সময় একরাতের ঘটনা। হঠাৎ করে আকাশে গর্জন শোনা গেল। সেই সাথে চতুর্দিক অন্ধকার হয়ে এলো। শুরু হলো তীব্র বাতাস। এ সময় পণ্ডিত তার তাঁবুতে পূজা অর্চনায় লিপ্ত ছিল। হঠাৎ এক সময় ধারে কাছেই কোথাও বজ্রপাত ঘটলো এবং বিদ্যুৎ চমকানোর তীব্র আলোয় সবার চোখে অন্ধকার নেমে এলো। ঘন ঘন বিদ্যুতের ঝলকে জঙ্গলকে মনে হচ্ছিলো ধবধবে সাদা আলোয় আলোকিত ময়দান। এমন প্রচণ্ড বৃষ্টিপাত শুরু হলো, মনে হচ্ছিল আকাশ থেকে শিলাবৃষ্টি শুরু হয়েছে। এ সময় মহারাজা রাজ্যপাল ছিলেন সেই গর্তে যে গুহায় তিনি তার সমস্ত সহায় সম্পদ লুকিয়ে রেখেছিলেন। তিনি যখন তার তাঁবুর দিকে রওয়ানা হলেন, তখন প্রচণ্ড বৃষ্টি আর ঝড়ো হওয়ার কারণে তার পক্ষে আর সামনে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হলো না।

এমন ঝড়ো বৃষ্টি শুরু হলো, যেন আসমান ফেটে পড়েছে। তীব্র বৃষ্টির মধ্যে ঘন ঘন বিদ্যুতের ঝলকানী আর বজ্রপাতে সবারই অন্তরাত্মা কেঁপে উঠছিল। গুহার ভেতরে একটি মশাল জ্বলছিল, আর গুহার বাইরে তার বেঁধে রাখা ঘোড়াগুলো ভয় আতঙ্কে হ্রেষারব শুরু করছিল। ঠিক এ সময় পুরোহিত গুহায় ঢুকে ভেতরে চলে গেল। পুরোহিত রাজাকে বললো–

"আমি বৃষ্টি শুরু হতেই আপনার তাঁবুতে গিয়েছিলাম। সেখানে আপনাকে না পেয়ে এখানে এসেছি। আপনার জন্যে সব সময়ই আমার মন উদ্বিগ্ন থাকে।

দেখতে দেখতে বৃষ্টির জোর আরো তীব্রতর হলো। এমন অবস্থা ঘণ্টাখানিক চলার পর গুহার বাইরের লোকজনের মধ্যে চিৎকার চেচামেচি শুরু হলো। বেঁধে রাখা ঘোড়া ও গাধাগুলো আতঙ্কে তীব্র হ্রেষারব শুরু করে দিল। গুহার বাইরে লোকজনের মধ্যে শুরু হলো দৌড়ঝাপ। ঝড়ের শনশন আওয়াজ আর বৃষ্টির ঝমঝম শব্দ আর মানুষের আর্তচিৎকার মিলে তৈরী হলো ভয়ানক এক অবস্থা। এ সময় চিৎকার চেচামেচির সঙ্গে কানে ভেসে এলো– বন্যা এসে গেছে, ঢল নেমেছে, তাঁবুর খুঁটিগুলো উপড়ে ফেলো...।

বাইরের শোরগোল শুনে গুহার মুখ থেকে রাজা ও পণ্ডিত দেখতে পেলেন, ঠিকই পানি গুহার দিকেও গড়িয়ে আসছে। সেই সাথে ভয়ানক বিদ্যুৎচমক ও বজ্রপাতের শব্দ। এর মধ্যে লোকজন দিগ্বিদিক দৌড়াচ্ছে।

এক সময় লক্ষণপাল দৌড়াতে দৌড়াতে গুহার মধ্যে এসে পড়ল। গুহাটি ছিল দুটি পাহাড়ের মাঝখানে। তাদের জানা ছিল নীচের এলাকাটিতে উপর থেকে বন্যার মতো পানি নেমে আসে। দেখতে দেখতে পানির স্রোত আরো বেড়ে গেলো। এ অবস্থায় মহারাজার নিরাপত্তা রক্ষীরা জীবন বাঁচানোর জন্যে উঁচু জায়গার দিকে দৌড়াচ্ছিল।

এক সময় গুহার ভেতরেও পানি প্রবেশ করতে শুরু করলো। কিন্তু গুহার মুখ উঁচু থাকার কারণে ভেতরে বেশী পানি প্রবেশ করলো না।

এমন সময় পুরোহিত মহারাজার উদ্দেশ্যে বললো–

"মহারাজ! এটাই হরিহরি মহাদেবের ক্রোধ। মহাদেবের কাছে আত্মসমর্পণ করুন, ক্ষমা চান, পাপের প্রায়শ্চিত্ত করুন। আপনি কি জীবনে কখনো এমন বৃষ্টি দেখেছেন?"

"মহারাজা পুরোহিতের কথা শুনে অট্টহাসিতে ভেঙ্গে পড়লেন। উন্মাদের মতো হাসি। দীর্ঘ অট্টহাসি হেসে তিনি বললেন, আরে এই বৃষ্টি আমার কি ক্ষতি করবে, এই বিদ্যুৎচমক আর বজ্রপাত আমার কি ধ্বংস করবে? নিয়ে যাও তোমার এসব ধন-সম্পদ।

রাজার কথা শুনে পুরোহিত বৃষ্টি ও তুফানের মধ্যে গলা চড়িয়ে বললো, "আপনার কি হয়েছে মহারাজ! বাইরে দৈত্য-দানব চিৎকার করছে এটাকে একটু বোঝার চেষ্টা করুন। দেবতার এই ক্রোধকে অনুভব করার চেষ্টা করুন। আমি যা বলি তা করুন, হাত জোর করে ক্ষমা ভিক্ষা চান, আমি মুখে যা আওড়াচ্ছি আপনিও তা বলতে থাকুন।

পুরোহিতের কথা শুনে মহারাজা আরো হাসলেন। অনতি দূরে দাঁড়ানো নওজোয়ান দু'সাহসী যোদ্ধা লক্ষণপাল ভয়ে আতঙ্কে কী যেন বিড়বিড় করে বলছিল আর দু'হাত লম্বা করে দেবতার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছিল। হঠাৎ সে আর্তচিৎকার করে বলে উঠলো–

"ওই যে দেখো, এটা কি আসছে...?

মহারাজা ও পুরোহিত একই সঙ্গে গুহার সম্মুখের দিকে তাকালে দেখতে পেলেন বিশাল এক অজগর যার মাথাটা একটা গরুর মাথার মতো বিশাল, গুহার ভেতরের দিকে ঢুকছে। লক্ষণপালের হাতে তরবারী ছিল সে তরবারী কোষমুক্ত করে ফেলল। অজগরটি খুব ধীরে ধীরে গড়িয়ে গড়িয়ে গুহার ভেতরের দিকে আসছিল। হয়তো পানির স্রোত সেটিকে আপন ঠিকানা থেকে ভাসিয়ে নিয়ে এসেছে। এ ধরনের অজগর সাধারণ স্যাঁতসেতে কাদাপানিতে থাকে। যদি সেখানটায় আহার না পাওয়া যায় তাহলে ডাঙ্গায় চলে আসে। এ ধরনের অজগরের স্বভাব হলো এরা জীবন্ত মানুষ কিংবা জীবন জন্তু আস্ত গিলে ফেলে। এরপর দুই তিন মাস পর্যন্ত আর কোন আহার করে না। ঠাঁয় পড়ে থাকে।

অজগরটি লম্বায় অন্তত দশ হাত হবে। লক্ষণপাল যখন সেটিকে মারার জন্যে তরবারী কোষমুক্ত করে প্রস্তুতি নিল তখন পুরোহিত তাকে আঘাত না করার নির্দেশ দিলো। মহারাজা রাজ্যপাল সাপ দেখে নিজ অবস্থান থেকে কয়েক কদম পিছনে সরে এলেন। পুরোহিত কালবিলম্ব না করে মশালটিকে হাতে নিয়ে অজগরটির সামনে তুলে ধরলো। অজগরটি তখনো পুরোপুরি গুহায় প্রবেশ করেনি।

পুরোহিত জানতো এ ধরনের অজগর বিষাক্ত নয়, এরা ছোবল মারে না। ক্ষুধা পেলেই কেবল আহার করতে কোন জীবজন্তুকে গিলে ফেলতে চেষ্টা

করে।

মহারাজা তখন পুরোহিতকে বললেন, পণ্ডিতজী মহারাজ! আপনি তো সাপ ধরতে এবং নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারদর্শী? এটিকেও কি আপনি কাবু করতে পারবেন?"

পুরোহিত তার দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছিল অজগরের দিকে। পুরোহিত অজগর ও নিজের মধ্যে মশাল দিয়ে একটি আড়াল সৃষ্টি করেছিল। এ অবস্থাতেই পুরোহিত মহারাজার দিকে না তাকিয়েই বললো, মহারাজ! এটি যদি পৃথিবীর অজগর হয়ে থাকে তবে আমি অবশ্যই এটিকে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নিতে পারবো। কিন্তু মহারাজ! এটি সাধারণ কোন অজগর সাপ নয়, এটি দেবতা। এরপর পণ্ডিত একটি মন্ত্র বলে মহারাজাকে এটি আওড়াতে বললো। সেই সাথে বললো, মহারাজ! হরি কৃষ্ণ আপনার দ্বারা বড় ধরনের কোন কাজ নিতে চান।

কিছুটা ভীতবিহ্বল অবস্থায় মহারাজা ও লক্ষণপাল পুরোহিতের মন্ত্র আওড়াতে থাকল। পণ্ডিত মশালের হাতল ধরে আগুনের শিখাকে অজগরের মুখের সামনে ধরে রাখল। এর ফলে অজগরটি সামনে অগ্রসর না হয়ে সেখানেই কুণ্ডলী পাকাতে শুরু করল। ফাঁকে ফাঁকে অজগরটি মাথা উঁচু করে এদিক ওদিক দেখতে চেষ্টা করছিল। পুরোহিত লক্ষণপালকে বললো, গুহার ভেতরে মোটা একটা রশি আছে সেটা নিয়ে এসো।

লক্ষণ দৌড়ে গুহার ভেতরে গিয়ে সেখান থেকে মোটা লম্বা একটি রশি এনে পুরোহিতের হাতে ধরিয়ে দিল। রশি আনার পর পুরোহিত লক্ষণপালকে মশালটি দিয়ে বললো, এটি সাপের সামনে ধরে রাখবে। পুরোহিত রশিটি দিয়ে ফাঁদ তৈরী করল। অজগর মশালের কারণে সামনে কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না। অজগর যখন আবার মাথা উঁচু করল পুরোহিত তখন রশির তৈরী ফাঁদ অজগরে মাথার উপর দিয়ে নিক্ষেপ করলে অজগরের মাথা ফাঁদে আটকে গেল। এবার পুরোহিত রশি টান দিল। তাতে ফাঁদ আটকে অজগরের মুখ খুলে গেল এবং অজগরের বিশাল দেহ কাঁপতে শুরু করল। পুরোহিত তখন এক লাফে অজগরের উপর উঠে পড়ল এবং রশিটি টেনে শক্ত করে সাপের কুণ্ডলী পাকানো শরীর বেধে ফেলল। এবার সাপটির আর নড়াচড়া করার ক্ষমতা থাকল না। পুরোহিত ঠিকই সাপকে নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নিল।

এক পর্যায়ে বৃষ্টির তীব্রতা কমতে শুরু করল। পুরোহিত নানা কথায় মহারাজাকে বুঝাতে চেষ্টা করল এটি সাপ নয় সাপের রূপ ধারণ করে দেবতা এসেছেন। সব শুনে মহারাজা নিশ্চুপ হয়ে গেলেন। পুরোহিত তাকে বললো, আপনার আর বাইরে বের হওয়ার দরকার নেই। বাইরের পরিস্থিতি আমরা সামলাবো। আপনি গুহার ভেতরেই শুয়ে বিশ্রাম নিন, আরামে একটু ঘুমিয়ে নিন।

* * *

পরদিন সূর্য যখন অনেক উপরে ওঠে গেছে তখন মহারাজার ঘুম ভাঙল। তিনি চোখ খুলে গুহার চতুর্পাশটা দেখলেন। সেখানে তখন পণ্ডিত ছিল না, পুরোহিতের রশিতে বাধা সাপও ছিল না। লক্ষণপালকে গুহার কোথাও দেখা গেল না।

অনেকক্ষণ পর পুবোহিত গুহায় প্রবেশ করলে মহারাজা জিজ্ঞেস করলেন, "গত রাতের অজগর সাপটি কি মেরে ফেলা হয়েছে?"

"এটি অজগর নয় মহারাজা! এটি দেবতা! বললো পুরোহিত। দেবতা আপনাকে সে কথাই বলতে এসেছিলেন যে কথা আমি দীর্ঘদিন ধরে বলে আসছি। শুরুতে আমিও অজগরটিকে সাপই মনে করেছিলাম। কিন্তু পরে ভেবে দেখলাম, এতো বড় অজগরকে বশে আনা কোন মানুষের সাধ্যের ব্যাপার নয়। আমি দেবতার ইঙ্গিত পেয়ে সেটিকে রশি দিয়ে বেধে ফেলি যাতে আপনারা আতঙ্কিত না হন।

আপনি যখন ঘুমিয়ে পড়েছিলেন, তখন রাজকুমারও চলে গেলেন। নির্জন পরিবেশ পেয়ে অজগর রূপধারণকারী দেবতা আমাকে তার আসল রূপ দেখাল। আমি তার সাথে বাইরে বেরিয়ে এলাম। দেবতা আমাকে বললেন, মন্দিরের ধ্বংস এবং আমাদের অবমাননা বন্ধ করাও এবং এর কঠিন প্রতিশোধ নাও। আমরা খুবই কষ্ট পাচ্ছি। আমরা যখন মর্তে আসি তখন বিদ্যুৎ চমকে চমকে আমাদের পথ দেখায় এবং বৃষ্টি আমাদের পথ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে দেয়। আমরা এসব বিদ্যুৎপাত ও বজ্রপাত মুসলমানদের উপরও ফেলতি পারি কিন্তু আমরা তা না করে তাদেরকে সনাতন ধর্মে ফিরে আসার অবকাশ

দেই...। দেবতা আমাকে জোর দিয়ে বলেছেন, তুমি তোমার রাজাকে বলো, রাজধানী থেকে মুসলমানদের বিতাড়িত করে আযানের ধ্বনি বন্ধ করতে। আযানের আওয়াজের কারণে আমরা খুবই অশান্তি বোধ করছি।"

"আচ্ছা! আপনার দেবতা পরে কোথায় চলে গেলেন?"

"যেখান থেকে এসেছিলেন সেখানেই চলে গেছেন।" জবাব দিলো পুরোহিত। আমি তার পায়ে পড়ে ক্ষমা ভিক্ষা করেছি। আপনার পক্ষ থেকেও ক্ষমার জন্যে আমি তার কাছে করজোড় নিবেদন করেছি। কিন্তু তিনি আপনার প্রতি খুবই নারাজ। তিনি বলেছেন, তার সৃষ্টি বিদ্যুৎপাত এখানকার পাহাড় পবর্ত পুড়ে ফেলার জন্যে এসেছিল। আমাদের সবাইকে জ্বালিয়ে ভস্ম করতে এসেছিল। দেবতা বলছিলেন, তোমাদের রাজার ধন-সম্পদ মাটি চাপা দেয়া উচিত। যাতে আর কোনভাবেই উদ্ধার করতে না পারে। কিন্তু আমি এসব শুনে তার পায়ে পড়ে নিবেদন করেছি, বহু অনুনয় বিনয় করে তাকে রাজি করিয়েছি। অবশেষে তিনি একটি নর্তকীর বলিদানের বিনিময়ে আমাদের ধ্বংস করা এবং আপনার ধন-রত্ন মাটি চাপা দেয়া থেকে বিরত রইলেন। তার ইঙ্গিতে বলিদানের জন্যে আমি নর্তকীও নির্বাচন করে ফেলেছি।

"কোন নর্তকী!' জানতে চাইলেন মহারাজা।

"নদী।"

"না। তা হবে না পণ্ডিতজী! আমি কোন অবস্থাতেই নদীকে নরবলি হতে দেব না।"

"আপনি গযনীর সুলতানের মোকাবেলা করতে পারেন নি; সেখানে আপনি দেবতাদের মোকাবেলা কি ভাবে করবেন?" উষ্মামাখা কণ্ঠে বললেন মহারাণী। দেবতাদের সন্তুষ্ট কর‍্যার জন্যে নদীকে বলি দিতেই হবে?"

"তুমি চুপ থাকো, ধমকে উঠলেন মহারাজা।"

"পতি কোন দেবতা না কিন্তু দেবতা পতি হতে পারে, আমাকে দেবতাদের নির্দেশ মানতে পতির বিরুদ্ধাচরণ হলেও তা করতে হবে।" ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললেন মহারাণী।

"পিতা মহারাজ! আমাকে আপনি তরবারী চালনা শিখিয়েছেন, ছেলের তরবারীতে পিতার মাথা দ্বিখণ্ডিত হোক আমাকে সে রকম কাজে বাধ্য করবেন

না।" কাছেই দাঁড়ানো রাজপুত্র লক্ষণপাল তার বাবার উদ্দেশ্যে দৃঢ়কণ্ঠে বললো। কোন সুপুত্র পিতার পথভ্রষ্টতার জন্যে তার দেশ জাতি ও ধর্মকে বিসর্জন দিতে পারে না। পণ্ডিতজী যা বলছেন তাই হবে।"

পিতা মহারাজ! আমি ভালো করেই জানি, আপনি আপনার ধর্মত্যাগ করেননি কিন্তু আপনি গযনী সুলতানের ভয়ে এতটাই আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন যে, আপনার মনমস্তিষ্ক থেকে এই আতঙ্ক দূর করতে পারছেন না।"

মহারাজা রাজ্যপাল যখন রাণী ও একমাত্র পুত্রের চরম সীমাহীন ঔদ্যত্য এবং তাদের কণ্ঠে জীবনের হুমকি উচ্চারিত হতে দেখলেন তখন চুপসে গেলেন। তিনি আর কোন কথাই বললেন না। তিনি পণ্ডিতের কাছে একথাও জিজ্ঞেস করার সাহস পেলেন না, দেবতাগণ শুধু তাকেই ধ্বংস করার শপথ কেন নিয়েছে? মথুরা কন্নৌজের চেয়েও পবিত্র নগরী ছিল। সেটা কৃষ্ণমহারাজের জন্মভূমি। থানেশ্বরের মন্দির ও হিন্দুদের কাছে একটি পবিত্র জায়গা ছিল। সেখানে এখন শাখা ঘণ্টার ধ্বনির বদলে আযানের ধ্বনি গুঞ্জরিত হচ্ছে, কিন্তু দেবতারা তো সেখানকার কোন রাজাকে অজগর সেজে এসে ভয় দেখাননি?"

মহারাজা প্রত্যক্ষ করলেন, তার রাণী ও রাজকুমারের উপর দেবতাদের ক্রোধের আতঙ্ক গেড়ে বসেছে। তখন আর কোন কথা না বলে তিনি যে গুহার ভেতরে তার ধনরত্ন রেখেছিলেন সেখানে চলে গেলেন।

এই তো হলো হিন্দুদের ধর্ম। কন্নৌজের প্রধান মন্দিরের সামনের বিজয়ী কণ্ঠে উচ্চারিত হচ্ছিল এই ধ্বনি। এই আওয়াজ ছিল সেই প্রধান খতীবের যিনি সুলতান মাহমূদের সাথে গযনী থেকে এসেছিলেন।

গযনীর সৈন্যদের সাথে সব সময়ই কিছুসংখ্যক ইমাম ও ধর্মীয় পণ্ডিত ব্যক্তি থাকতেন। তারা সৈন্যদের নামাযের ইমামতি করতেন এবং সৈন্যদের ধর্মীয় বিধিবিধান সম্পর্কে অবহিত করতেন।

গযনীর খতীব কন্নৌজের প্রধান মন্দিরের বেধিতে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তার চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছিল ভাঙা মূর্তির টুকরো। আর তার সামনে ছিল গযনীর বিজয়ী সৈন্যদের একটা অংশ। তার পেছনে কন্নৌজের বন্দী সৈন্যরা দাঁড়িয়ে ছিল।

খতীব জলদগম্ভীর কণ্ঠে আবারো উচ্চারণ করলেন, বন্ধুগণ! দেখে নাও, এই হলো হিন্দুদের ধর্ম। ওদের পূজনীয় মাটি পাথরের দেব-দেবী ভাঙা টুকরো এখন তোমাদের পায়ের নীচে। আল্লাহ্ এক। তাঁর কোন শরীক নেই। তোমরা কোন রাজ্য জয় করার জন্যে কিংবা লুটপাট, মারামারি করার জন্যে এখানে আসোনি। তোমরা এখানে এসেছো, এই বাতিল ধর্মের শিকড়সহ উপড়ে ফেলতে। হয়তো তোমাদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে এজন্য আমরা হিন্দুস্তানকে কেনো বাছাই করেছি? এর জবাব হলো, আরব দেশের এক ক্ষণজন্মা বীর মুজাহিদ মুহাম্মদ বিন কাসিম নির্যাতিতা একজন মুসলমান তরুণীর আহ্বানে ভারতে এসেছিলেন। তিনি নির্যাতিতা তরুণীকে উদ্ধার করতে এসে এখানকার এক জালেম অত্যাচারী রাজাকে পরাজিত করেছিলেন। কিন্তু তিনি এখানকার অধিবাসীদের জন্যে ত্রাস ও আতঙ্ক হয়ে বিরাজ করেননি। তিনি ও তার সঙ্গীরা এদেশের মানুষের কাছে এ সত্য প্রমাণ করেছিলেন, মুসলমানদের তরবারী পাহাড়ের চূড়া কেটে ফেলতে পারে কিন্তু তাদের আচার-ব্যবহার পাথরকেও মোমের মতো গলিয়ে দিতে পারে...।

মুহাম্মদ বিন কাসিম এখানকার পাথরসম কঠিন মনের অধিকারী পৌত্তলিকদের হৃদয় গলিয়ে তাদের অন্তর জয় করেছিলেন। মুহাম্মদ বিন কাসিম এখানকার পাথরদিল মানুষগুলোকে মোমে পরিণত করেন, ফলে এখানকার মূর্তিগুলো নিজ থেকেই ধ্বংস হতে শুরু করে। হিন্দুরা মুহাম্মদ বিন কাসিম ও তার সঙ্গীদের উত্তম চরিত্র, বৈষম্যহীন সাম্যের নীতি, আদর্শিক জীবন এবং উচ্চ মানসিকতার জীবন্ত দৃষ্টান্ত দেখে যুগের পর যুগ ধরে চলে আসা নিষ্পেষিত নির্যাতিত হিন্দুরা দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান হতে শুরু করে। ফলে ভারতের পশ্চিম উত্তরাংশের মানুষ ইসলামের আলোয় আলোকিত হলো। একই সাথে ইসলামের আলো গোটা ভারত জুড়ে বিকশিত হতে শুরু করে।

কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত মুসলিম কেন্দ্রীয় শাসকের মধ্যে এমন পরিবর্তন সাধিত হলো যে, ইসলামের বীর মুজাহিদ দিগ্বিজয়ী অবিস্মরণীয় বিন কাসিম কেন্দ্রীয় শাসক তাকে অপরাধী বানালো। মুহাম্মদ বিন কাসিম এক লম্পট খলিফার ব্যক্তিগত শত্রুতার শিকারে পরিণত হলেন।

বিন কাসিম হিন্দুস্তান ত্যাগ করার পর এখানকার হিন্দু শাসকরা আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো এবং হিন্দুদের ক্রমবর্ধমান প্রাবল্যে এক সময়

মসজিদগুলো পুনরায় মন্দিরে রূপান্তরিত হতে শুরু করলো। সেই সাথে হিন্দু শাসকরা এখানকার মুসলমানদের জীবন সংকীর্ণ করে তুললো। অবস্থা এমন হলো যে, মুসলমানদের জীবন ধারণই হয়ে পড়লো কঠিন। হিন্দুরা মুসলিম নিধনকে মিশন হিসেবে গ্রহণ করলো। ফলে ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ নওমুসলিমরা আবারো পৌত্তলিকতায় ফিরে গেলো। আর প্রকৃত মুসলমানরা জীবন-মরণ সমস্যার সম্মুখীন হলো.......।

গযনীর বীরযোদ্ধা ভাইয়েরা! তোমরা শুধু গযনীর পতাকা বহন করছো না, তোমরা ইসলামের পতাকা বহন করছো। যে জমিন এক সময় দারুল ইসলামে পরিণত হয়েছিল সেটি পুনরায় দারুল কুফরে পরিণত হলো। সত্যের উপর মিথ্যা বিজয়ী হতে শুরু করলো।

তোমরা পৌত্তলিকতা কী জিনিস সেটি বুঝতে চেষ্টা করো। হিন্দু জাতি সাপের মতো। বিষধর সাপের মতোই এদের স্বভাব। এরা সাপকে পূজা করে। এরা আল্লাহর একক সত্তা সম্পর্কে কোনই ধারণা রাখে না। যে গঙ্গা ও যমুনা নদীকে তোমরা কয়েকবার এপার ওপার করেছো, এই নদী দুটিকেও এরা দেবতা মনে করে। এই নদী দু'টির অপরিষ্কার পানিকেও এরা পবিত্র মনে করে পূজা করে। এরা গঙ্গা যমুনায় গোসল করে মনে করে গঙ্গা যমুনার পানি সব পাপকে ধুইয়ে ফেলেছে। আকাশের বিদ্যুৎপাত বজ্রপাতকে দেবতার ক্রোধ বলে বিশ্বাস করে এবং সে সময় হিন্দুরা মন্দিরের ঘণ্টা বাজাতে শুরু করে। কোন বড় অজগর সাপ দেখলে সেটিকে পূজা করতে থাকে। হিন্দু নামের জ্ঞানপাপীগুলো তাদের দেবদেবীদের খুশী করতে জীবন্ত তরুণী কিশোরীকে হত্যা করে দেবতার নামে উৎসর্গ করে দেবতাদের খুশী করতে চেষ্টা করে। তোমরাই বলো, মানুষের রক্তে পাথরের মূর্তির পা ধোয়াকে কি কোন সজ্ঞান মানুষ সমর্থন করতে পারে? এটাকে কি আদৌ ইবাদত বলা যায়?........

ইসলামের সৈনিকেরা! তোমরা এখানে হিন্দু পুরোহিত পণ্ডিতদের এই মূর্খতার মূলোচ্ছেদ করতে এসেছো। তোমরা যদি এই জমিন থেকে পৌত্তলিকতা সমূলে উৎখাত করতে না পারো তাহলে এই জমিনে কেয়ামত পর্যন্ত মুসলমানদের রক্ত প্রবাহিত হতে থাকবে। কিছু আচার-অনুষ্ঠান ও রীতিনীতিকে এরা ধর্মজ্ঞান করে। এ কারণে এরা সব সময়ই মুসলমানদের

শিকড় কাটতে থাকবে। সত্যিকার অর্থে হিন্দুত্ব কোন ধর্ম নয়। হিন্দু ঠাকুর পুরোহিত ও পণ্ডিতেরা সাধারণ হিন্দুদেরকে দেবদেবীর ভয় দেখিয়ে তাদের মনগড়া ভ্রান্ত ধারণাকেই ধর্ম হিসেবে চালিয়ে দিয়েছে। যুগ যুগ ধরে এখানকার মানুষ অন্ধের মতো মণি-ঋষী ঠাকুর-পণ্ডিত ও পুরোহিতদের বানানো রীতি-রুসমকেই ধর্ম বলে বিশ্বাস করছে।

এদের ধর্ম যদি সত্য হয়ে থাকে তবে এদের যে সব দেবদেবীকে তোমরা গুড়িয়ে দিয়েছো, যাদের ভগ্নাবশেষ তোমাদের পায়ের নীচে পড়ে আছে এদেরকে বলো না, তাদের উৎখাতের প্রতিশোধ নিতে। সেই ঝড়তুফানের রাতে বিদ্যুৎপাত ও বজ্রাঘাত হয়েছে, তোমরা তখন নির্বিঘ্নে ঘুমিয়েছো, আর ওরা সেটিকে দেবতার ক্রোধ ভেবে রাতভর পেরেশান হয়ে পূজা-অর্চনা করেছে। বলো, রাতের তুফান কি তোমাদেরকে সামান্যতম আতঙ্কিত করেছে? ঝড় বৃষ্টিকে কি মুসলমানরা ভয় করতে পারে? কিন্তু সেই রাতে তোমরা যদি হিন্দুদের অবস্থা দেখতে তাহলে তোমাদের হাসি পেতো, ওরা সারারাত রাম রাম হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ জপতে জপতে নির্ঘুম কাটিয়েছে...।

বন্ধুগণ! সত্য-সততা এবং ঈমান ও ইহসান তোমাদের শক্তি। ঈমানের শক্তির সামনে কোন মিথ্যার দুর্গ দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। তোমাদের যে রক্ত এ জমিনে পড়েছে তা ফুলের মতোই খুশবো ছড়াবে এবং এই জমিন আল্লাহর নূরে আলোকিত হবে।"

* * *

মুসলমানদের কন্নৌজ বিজয়ের ডংকা দেড়শো মাইল দূরের কালাঞ্জর ও একই দূরত্বের গোয়ালিয়র পর্যন্তও পৌছে। কন্নৌজ থেকে কিছু হিন্দু সেনা কালাঞ্জর পৌছে এ খবর আগ্নেয়গিরির মতো ছড়িয়ে দিলো যে, মুসলমানরা কন্নৌজ দখল করেছে এবং সেখানকার মহারাজাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

কালাঞ্জরের রাজা গুন্ডা কয়েক পক্ষকাল থেকে শুধু শুনে আসছিলেন, অমুক রাজ্য মুসলমানরা দখল করে নিয়েছে। অমুক রাজা মুসলমানদের হাতে নিহত হয়েছে। অমুক রাজা রাজধানী ছেড়ে পালিয়ে গেছে। গুন্ডা আরো শুনতে পাচ্ছিলেন, অমুক রাজ্যের রাজা হাতিয়ার ফেলে দিয়ে সুলতান মাহমূদের কাছে

আত্মসমর্পণ করেছে। অমুক রাজা সুলতান মাহমূদের সাথে মৈত্রি চুক্তি করেছে। রাজা গুন্ডা এভাবে সুলতান মাহমূদের অগ্রাভিযানের প্রতি দৃষ্টি রাখছিলেন। এখন তো সুলতান মাহমূদ বলতে গেলে তার দোরগোড়ায় এসে উপস্থিত। কারণ, সেই অমিততেজী গযনীর যোদ্ধাদের কাছে দেড়শো মাইলের দূরত্ব তেমন দূরত্ব ছিল না। রাজা গুন্ডা এ খবর পাওয়ার পরপরই গোয়ালিয়র যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন।

রাজা গুন্ডা যখন গোয়ালিয়র পৌছলেন, তখন তিনি জানতে পারলেন, তার আসার আগেই কন্নৌজ পতনের খবর গোয়ালিয়র পৌছে গেছে। গোয়ালিয়রের রাজা অর্জুন এ ব্যাপারে অবগত। রাজা গুন্ডা কন্নৌজ পতনের সংবাদে চিন্তিত হওয়ার পাশাপাশি ক্ষুব্ধও ছিলেন। তিনি কন্নৌজের মহারাজা রাজ্যপালের মোকাবেলা না করে পালিয়ে যাওয়াটাকে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। অথচ সংবাদবাহীরা তাই বলছিলো। লোকজন বলছিলো, রাজধানীতে মাত্র কিছু সংখ্যক সৈন্য অবস্থান করছিল। মুসলিম সৈন্যরা অনায়াসে কোন প্রতিরোধের মুখোমুখি না হয়েই শহরে প্রবেশ করে। রাজাকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। গযনী বাহিনী শহরে প্রবেশ করেই ধ্বংসযজ্ঞ শুরু করে।

কালাঞ্জরের রাজা গুন্ডা আর গোয়ালিয়রের রাজা অর্জুন দু'জনে মিলে একটি যৌথ পরিকল্পনা করলো যে, গোয়েন্দাদের মাধ্যমে সুলতান মাহমূদের প্রতি নজর রাখা হবে এবং গযনী সুলতানের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করা হবে তিনি কন্নৌজেই অবস্থান করেন না ফিরে যান? সুলতান মাহমূদ যদি কন্নৌজ অবস্থান করে তাহলে তার উপর সেখানেই আক্রমণ করা হবে এবং এই আক্রমণে লাহোরের রাজা ভীমপালের সৈন্যদের অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

কালাঞ্জরের মহারাজা তখনো গোয়ালিয়রে অবস্থান করছিলেন, এমন সময় কন্নৌজ রাজদরবারের এক উর্ধ্বতন অফিসার সেখানে পৌছল। এই কর্মকর্তা কালাঞ্জর হয়ে গোয়ালিয়র পৌছে। কালাঞ্জর গিয়ে এই কর্মকর্তা শুনতে পায় কালাঞ্জরের রাজা গুন্ডা গোয়ালিয়র চলে গেছেন। কর্মকর্তা সঙ্গে সঙ্গেই গোয়ালিয়র রওয়ানা হয়ে যান।

গোয়ালিয়র পৌছে কন্নৌজের সেই কর্মকর্তা রাজা গুন্ডা ও রাজা অর্জুনকে জানায়, "কন্নৌজের মহারাজা কন্নৌজ অবরোধের আগেই নিরুদ্দেশ হয়ে

গিয়েছিলেন। গযনীর সুলতান মাহমূদ কন্নৌজ পৌছে যখন খাজাঞ্চীখানা খুললেন, তখন সেখানে কিছুই পাওয়া গেল না। রাজমহলের রাণীদের অলঙ্কারগুলোও ছিল নিরুদ্দেশ। সেই সাথে রাজমহলও ছিল লোকশূন্য। দুর্গে সৈন্যও ছিল হাতে গোনা।

'এর অর্থ হলো, মহারাজা রাজ্যপাল শত্রুকে দেখার আগেই নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছিলেন, বললেন কালাঞ্জরের রাজা গুন্ডা। সেই সাথে তিনি সেনাবাহিনীর একটি অংশও সাথে নিয়ে গেছেন।'

হিন্দুজাতি কি তার এই অপরাধ ক্ষমা করতে পারবে? বললেন গোয়ালিয়রের রাজা অর্জুন।

"এটা কি জানা সম্ভব হয়নি তিনি কোথায় গিয়েছেন?" ক্ষুব্ধ কণ্ঠে সেই কর্মকর্তার কাছে জানতে চাইলেন অর্জুন।

"না, তা জানা সম্ভব হয়নি।" জবাব দিলো কর্মকর্তা। আর দ্বিতীয় খবর হচ্ছে, সুলতান মাহমূদ গযনী ফিরে গেছেন।

"তার সেনাবাহিনী কোথায়?" জানতে চাইলেন অর্জুন।

"কিছুসংখ্যক এখানে রয়েছে আর কিছুসংখ্যক তিনি সাথে নিয়ে গেছেন।

"এমন তো নয় যে, মহারাজা রাজ্যপাল গোপনে সুলতান মাহমূদের সাথে কোন প্রকার চুক্তি করে বসেছেন?" উষ্মামাখা কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন রাজা অর্জুন। আর এই চুক্তি মতে তার সাথে নেয়া সৈন্যদেরকে তিনি প্রয়োজনের সময় মাহমূদের সাহায্যের জন্য দিয়ে দেবেন?

"যেহেতু আমরা এর কিছুই এখনো জানি না, তাই আমাদেরকে ভেবে চিন্তে পদক্ষেপ নিতে হবে" বললেন রাজা গুন্ডা। রাজা রাজ্যপালকে আমরা গোটা হিন্দুস্তানের একজন অভিভাবক মনে করতাম, কিন্তু লোকটি ধারণাতীত কাপুরুষতার পরিচয় দিলো। মথুরা, মহাবন, বুলন্দশহর আর মুনাজের সৈন্যবাহিনী প্রায় ধ্বংস হয়ে গেছে। শুধু লাহোরের রাজা ভীমপালের দিকে এখনও একটু তাকানো যায়। কিন্তু তিনিও তো আবার গযনীর মাহমূদের সাথে চুক্তি করে বসে আছেন। তাই তিনি সরাসরি আমাদের সঙ্গ দেবেন না।

"তবুও আমরা এখানে বসে তো তামাশা দেখতে পারি না, বললেন, রাজা অর্জুন। দেশ ও ধর্মের জন্যে আমাদেরকে প্রয়োজনে সব কিছু ত্যাগ করতে

হবে। মুসলানদেরকে এতো সহজে আমরা হিন্দুস্তান শাসন করতে দেবো না। মুসলমানদের শাসন মানেই হলো, শুধু রাজ্য শাসনই নয় আমাদের ধর্মকর্ম সবই হারাতে হবে।

ঐতিহাসিক গারদিজী, ইবনুল আছির, স্মিথ এবং ফারিশতা লিখেছেন, কালাঞ্জর ও গোয়ালিয়রের রাজা যৌথভাবে সুলতান মাহমূদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন এবং তারা সিদ্ধান্ত নেন যেভাবেই হোক কন্নৌজের রাজা রাজ্যপাল কোথায় আছেন তাকে খুঁজে বের করতে হবে। আর রাজা ভীমপালের কাছে দূত পাঠানো হবে। তাকে বলা হবে তিনি যেনো মাহমূদের বিরুদ্ধে সম্মিলিত যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকেন, যাতে মাহমূদকে সহজেই পরাজিত করা যায়।

সুলতান মাহমূদ গযনী যাওয়ার আগে কন্নৌজের শাসনভার সেনাপতি আবুল কাদেরের কাঁধে ন্যস্ত করে যান। গযনীর ইতিহাসে দু'জন সেনাপতি বেশী খ্যাতি পেয়েছেন। একজন আবু আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ আলতাঈ আর অপরজন আরসালান জাযেব। আবুল কাদেরের আলোচনা তেমন পাওয়া যায়নি। কিন্তু বেশী আলোচিত ব্যক্তিত্ব না হলেও দায়িত্ব পাওয়ার পর সেনাপতি আবুল কাদের কন্নৌজের নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও প্রশাসন এভাবে বিন্যস্ত করেছিলেন যে, কন্নৌজকে তিনি অজেয় দুর্গে পরিণত করেছিলেন।

মহারাজা কন্নৌজের খোঁজ পাওয়া সহজসাধ্য ছিল না। পুরোহিত মহারাজা রাজ্যপালকে অজগর দেবতা দিয়ে আতঙ্কিত করতে সক্ষম হয়েছিল। তাছাড়া রাণী ও রাজকুমারের চরম ঔদ্ধ্যত্ব তার সবচেয়ে প্রিয় নর্তকী নদীর বলিদান তাকে চরমভাবে হতাশ করে ফেলেছিল। তিনি এরপর থেকে খুবই কম কথাবার্তা বলতেন।

একদিন রাজকুমার গুহাভ্যন্তরে মহারাজার শয়নকক্ষে গিয়ে মহারাজাকে বললো, বারীকে রাজধানী বানানোর জন্যে আমাকে অনুমতি দিন পিতৃমহারাজ! আমি সেখানে প্রস্তুতি নিয়ে সুলতান মাহমূদকে কন্নৌজ থেকে বিতাড়িত করবো এবং পরাজয়ের প্রতিশোধ নেবো। রাজ কুমার আরো বললো, সে গোয়ালিয়র, কালাঞ্জর এবং লাহোরের রাজাদেরকে সঙ্গে নেবে।

"তুমি কি মনে করো সুলতান মাহমূদ তোমাকে নতুন রাজধানী তৈরীর অবকাশ দেবে? জানতে চাইলেন রাজা রাজ্যপাল। তুমি কি জানো, তার

গোয়েন্দাদের জাল সর্বত্রই বিস্তৃত। সে যখনই জানবে, বারীতে আমরা যুদ্ধ প্রস্তুতি নিচ্ছি, তখনই সে সেখানে আঘাত হানবে।

"তাহলে কি করবো? এভাবে আমরা কি জঙ্গলেই সারাজীবন লুকিয়ে থাকবো? অনেকটা উত্তেজিত কণ্ঠে বললো রাজকুমার লক্ষণপাল।

"আমি একটি নিরাপদ ব্যবস্থার কথা চিন্তা করেছি" বললো রাজা। আমি সুলতান মাহমূদের সাথে যোগাযোগ করে কন্নৌজ চলে যাবো। তাকে বলবো, আপনার যুদ্ধের যাবতীয় ব্যয় আমরা দিয়ে দেবো এবং আপনার অধীনতাও স্বীকার করে নেবো। তবে তিনি যেনো বারীতে আমাদের নতুন রাজধানী তৈরীর অনুমতি দেন। আমি তার সাথে এমন চুক্তি করতে চাই যে, কখনো তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো না, প্রয়োজনের সময় তাকে সৈন্য সাহায্য দেবো।"

"না, আপনার এই চিন্তা ঠিক নয়। আপনি এমন প্রস্তাব নিয়ে কন্নৌজ গেলে সে আপনার কাছে পুরো ধনভাণ্ডার চেয়ে বসবে। ধন-সম্পদ তার হাতে তুলে না দিলে আপনাকে সে হত্যা করবে।

এমনটি না হলেও আমরা আপনাকে যেতে দিতে পারি না। কারণ, আমরা আর আপনার উপর বিশ্বাস রাখতে পারছি না। আপনার অন্তরে গযনীর সুলতান এমনভাবে আসন গেড়ে বসেছে যে, আপনি সনাতন ধর্মের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করতে শুরু করেছেন।

"ওহ্, তার মানে আমি কি তোমাদের হাতে বন্দি?" জানতে চাইলেন রাজা।

"পণ্ডিতজী বলেছেন, আপনার উপর কোন শয়তান ভূতের আছর পড়েছে।" বললো রাজকুমার লক্ষণপাল। তিনি বলেছেন, এই অপছায়া নর্তকী বলি দানের দ্বারা অপসারিত হবে। পণ্ডিতজী আরো বলেছেন, ভগবান যখন কারো উপর তার ক্রোধ বর্ষণ করতে আসেন, তখন ধর্মের প্রতি তাকে বিদ্বেষী করে তোলেন।

"ধর্ম... ধর্ম...ধর্ম...। এই ধর্ম ধর্ম করে আমি নিঃশেষ হয়ে গেলাম। জেনে রাখো, আমি কারো কয়েদী নই। তুমি বারী চলে যাও, পারলে রাজধানী হিসেবে বারীকে প্রস্তুত করো। মনে রাখবে, আমি তোমার পিতা। তুমিই একমাত্র আমার স্থলাভিষিক্ত হওয়ার মতো পুত্র। আমি যে বিষয়টি তোমার জন্যে নিরাপদ মনে করবো তাই করবো।"

* * *

পুরোহিত তার তাঁবুটিকে মহারাজার তাঁবু থেকে একটু দূরে স্থাপন করাল। মহারাজার তাঁবুর মতো পুরোহিতের তাঁবুতেও ছিল তিনটি কক্ষ। একটি কক্ষে সে পূজা অর্চনা করতো। তার তাঁবুতে কারো প্রবেশাধিকার ছিল না। সে যখন তার কক্ষে নর্তকী নদীকে ডেকে পাঠালো, তখন সে বুঝতে পারলো মহারাজা কেন নদীকে বলি না দেয়ার ব্যাপারে এতোটা কঠোর অবস্থান নিয়েছিলেন।

নদীকে যখন পুরোহিত ডেকে পাঠালো নদী এতে বেশ আশ্চর্যান্বিত হলো। কারণ, পুরোহিতরা কখনো কোন নর্তকীর সাথে কথা পর্যন্ত বলে না; তার তাঁবুতে ডেকে পাঠানো তো দূরের কথা! ডাক পেয়ে নদী পুরোহিতের তাঁবুতে হাজির হলো।

"নদী! তুমি পাপের একটা জীবন্ত মূর্তি। তোমার মৃত্যু হলে পরজন্মে তুমি শূকর কিংবা শিয়ালের রূপ ধারণ করবে। তোমার সেই পুনর্জন্ম হবে দুঃখ শোকে ভরা। তোমার অন্তরাত্মা সব সময় দুঃখ ভারাক্রান্ত থাকবে। প্রথম জন্মকে স্মরণ করে করে তুমি দুঃখের সাগরে ভাসবে। এতো পাপ করার পরও জানি না হরিহরি মহাদেব তোমার প্রতি এতোটা প্রসন্ন কেন হয়ে গেলেন! তিনি তোমাকে নিজের স্ত্রী বানানোর ইচ্ছা পোষণ করেছেন। দেবতাদের ইচ্ছাই নির্দেশ। নদী! তুমি হয়তো বর্তমান জীবন ত্যাগ করতে চাইবে না কিন্তু তুমি যখন আকাশের রাণী হবে তখন তোমার অন্তর আনন্দে আত্মহারা হয়ে যাবে।"

"এটা কি করে সম্ভব পণ্ডিত মহারাজ?"

"আমরা তোমাকে দেবতার পায়ে উৎসর্গ করতে যাচ্ছি" বললো পণ্ডিত। এ চাঁদের বারোতম রাতে দেবতা তোমাকে নিতে আসবেন। তোমার রক্ত এই জমিনে ফেলে দেয়া হবে। এ রক্ত মাংস নিয়ে তুমি দেবতার কাছে যেতে পারবে না। কারণ, তোমার এই রক্ত মাংস পবিত্র নয়।"

"আমি বুঝে ফেলেছি মহারাজ! আপনি আমার মাথা কেটে ফেলবেন।" আতঙ্কিত কণ্ঠে বললো নদী। না না মহারাজ! আমি এমন মরণ মরতে চাই না।"

"না চাইলেও তোমাকে মরতে হবে নদী। স্বজাতির ধর্ম আর মহারাজার কল্যাণে তোমাকে জীবন উৎসর্গ করতেই হবে।

নদী পালিয়ে যাওয়ার জন্য এদিক সেদিক তাকাচ্ছিল। পণ্ডিত তাকে সান্ত্বনা দিতে দিতে বললো, দেবতাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ করলে তোমার চেহারায় কাটার মতো শত শত টিউমার হবে। পেত্নীর মতো কালো হয়ে যাবে তোমার শরীর। আর দুর্গন্ধে তোমার কাছে কেউ যেতে চাইবে না। তখন তুমি মহারাজার প্রিয়ভাজন তো দূরের কথা কাছে থাকার অনুমতি পর্যন্ত পাবে না। মহারাজার লোকেরা তোমাকে জঙ্গলে ফেলে আসবে। তোমার চোখ দুটো মরা মানুষের মতো সাদা হয়ে যাবে। কোমর বেঁকে যাবে। তুমি ঠিক মতো হাঁটতেও পারবে না।

"এসো নদী। এই তো সামনেই দেবতা রয়েছেন। একটু দেখে নাও।"

পুরোহিত নদীকে অপর কক্ষে নিয়ে গেল এবং ঘাসে ভরা একটি জায়গা থেকে ঘাসগুলো সরালে একটি গর্ত দেখা গেল। পণ্ডিত নদীকে সামনে নিয়ে গর্তের ভেতরটা দেখালো। গর্তের ভেতরে বিশাল এক অজগর কুণ্ডলী পাকিয়ে ছিল, নদী অজগর দেখে চিৎকার করে উঠলো।

"এটাই তো দেবতা যা তোমাকে নেয়ার মেহমান" বললো পুরোহিত।

"আপনি কি আমাকে গর্তের এই অজগরের মুখে ফেলে দেবেন?" কম্পিত কণ্ঠে জানতে চাইল নদী।

পুরোহিত একটি ফুল নদীর নাকের কাছে ধরে বললো, এটার ঘ্রাণ নাও। এটি দেবতা তোমাকে দিয়েছেন।

পুরোহিত একটি ফুল নর্তকীর নাকের কাছে তুলে ধরলো। নর্তকী সেটির ঘ্রাণ নিলে তার শরীর শিথিল হয়ে এলো এবং সে জ্ঞান হারিয়ে ফেললো। পুরোহিত নদীকে ধরে অন্য কক্ষে শুইয়ে দিল। এরপর পুরোহিত ঘাস দিয়ে অজগরটিকে ঢেকে দিলো।

এরপর কেটে গেলো তিনচার দিন। এ কয়দিন রাত হলেই একটি মানুষ ছায়ার মতো তাঁবুর আশপাশে পা টিপে আসা যাওয়া করেছে। এক রাতে সে পুরোহিতের তাঁবু ঘেঁষে দাঁড়াল। সে পুরোহিতের তাঁবুর সাথে কান লাগিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। এর পরদিন ছায়া মূর্তিটি মহারাজার তাঁবুর পাশে গিয়ে দাঁড়ালে মহারাজার নিরাপত্তা রক্ষীদের কেউ কিছু একটা অস্তিত্ব টের পেয়ে চেটিয়ে উঠলো, কে কে ওখানে? হুঁশিয়ারী শোনা মাত্রই ছায়ামূর্তিটি অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

অন্ধকারের মধ্যে রাজার নিরাপত্তা রক্ষীদের ছোঁড়া তীর ছায়া মূর্তিটির পাশ দিয়ে শনশন করে এসে মাটিতে বিদ্ধ হলো। ছায়ামূর্তি জঙ্গলী জন্তুর মতোই ঝোপের মধ্যে হারিয়ে গেল। একটু পড়েই শোনা গেল শেয়ালের ডাক। মহারাজার নিরাপত্তা রক্ষীরা মনে করলো, এটি ছিলো শিয়াল! তারা কোন বিপদাশঙ্কা বাদ দিয়ে ছায়ামূর্তিকে খোঁজাখুঁজি না করে আবার নিশ্চিন্ত মনে নিজেদের জায়গায় পায়চারী করতে লাগলো।

এর কয়েক দিন পর মহারাজা রাজ্যপাল দু'জন নিরাপত্তারক্ষীকে ডেকে পাঠালেন। উভয়েই নিরাপত্তা বাহিনীর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। এরা মহারাজার অতি বিশ্বস্ত।

সেনাবাহিনীতে ভর্তি হওয়ার পর থেকে এরা দু'জন সবসময় রাজার সঙ্গে থেকেছে এবং মহারাজার সুখ-দুঃখের সঙ্গী। এদের আনুগত্যও প্রশ্নাতীত। মহারাজার জন্যে এরা নিজেদের জীবন বিলিয়ে দিতে সামান্যতম কুণ্ঠাবোধ করবে না। এমনই তাদের আচার-ব্যবহার।

মহারাজার এই দুর্দিনেও এরা দু'জন মহারাজাকে এই আশ্বাস দিয়েছে, মহারাজার যে কোন সিদ্ধান্ত তারা মাথা পেতে নেবে এবং যে কোন বিপদে তাদের জীবন উৎসর্গ করতে কুণ্ঠাবোধ করবে না।

মহারাজা তাদের বললেন, "আমি কন্নৌজ গিয়ে সুলতান মাহমূদের আনুগত্য মেনে নিতে চাই। কারণ, তার সাথে বৈরীতা করে আমি আমার ভবিষ্যত গড়তে পারবো না।"

মহারাজা চাচ্ছিলেন সুলতান মাহমূদের আনুগত্য স্বীকার করে নিয়ে বারীকে রাজধানী রূপে গড়ে তুলতে। কিন্তু পণ্ডিত মহারাণী ও রাজকুমার লক্ষণপাল তার এই সিদ্ধান্তের ঘোরতর বিরোধী ছিল।

এক রাতে মহারাজা তার রাজকীয় পোশাক ত্যাগ করে সাধারণ প্রজার বেশ ধারণ করলেন। অনুরূপ পোশাক তার বিশ্বস্ত দুই সঙ্গীকেও পরালেন। চোখে মুখে মাথায় খেটে খাওয়া শ্রমিকের মতো করে মেটে রঙের প্রলেপ দিলেন। তারা তিনজন যখন বেশ বদল করছিল তখন পণ্ডিত রাজার তাঁবুর দিকে আসছিল এবং দূর থেকে তাদের বেশ বদলের দৃশ্য দেখে পণ্ডিতের মনে সন্দেহের উদ্রেক হলো। সে ঠাঁয় দাঁড়িয়ে গেল, আর অগ্রসর হলো না। সে এমন

গোবেচারার ভাব করলো যে, কিছুই দেখেনি। পণ্ডিত সন্দিগ্ধ মনে সেখান থেকেই ফিরে এলো।

* * *

বেশ ভূষা বদল করার পর মহারাজা ও তার একান্ত দুই সঙ্গী ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে সাধারণ পথ এড়িয়ে বনভূমির দিকে অগ্রসর হলো। কন্নৌজের দিকে যাওয়ার জন্য সেখানে একটি মাত্র পথ ছিল। আর এই পথটি ছিল দু'টি পাহাড়ের মাঝ দিয়ে। জায়গাটি ছিল ঘন গাছগাছালি ও ঝোপঝাড়ে ভরা। তিনজন অশ্বারোহী একটি পাহাড়ের আড়ালে চলে যাওয়ায় তাঁবুর শিবির তাদের আড়ালে হয়ে গেল। তাঁবুর আড়ালে গিয়ে তারা অনেকটাই স্বস্তির সাথে সামনের দিকে অগ্রসর হতে লাগল।

তারা যখন দু'টি পাহাড়ের মধ্যবর্তী রাস্তা দিয়ে সামনে অগ্রসর হচ্ছিল তখন সামনে থাকা মহারাজার ঘোড়া হঠাৎ কিছু একটা দেখে ভড়কে উঠলো এবং হ্রেষারব করে পিছপা হতে শুরু করল। এই অবস্থা দেখে মহারাজার এক সঙ্গী বললেন, ঘোড়া হয়তো সাপ দেখেছে। সাপ দেখলেই ঘোড়া ভয়ে এভাবে কাঁপতে থাকে।

দেখতে দেখতে অপর দু'টি ঘোড়াও ঠাঁয় দাঁড়িয়ে ভয়ে কাঁপতে শুরু করলো।

হঠাৎ করে পাহাড়ের ঝোপের আড়াল থেকে এক গুরুগম্ভীর আওয়াজ শোনা গেল, "ফিরে যাও। মনের ইচ্ছা ত্যাগ করো। যেখানে যাচ্ছ, সেখানে তোমাদের অপমানজনক মৃত্যু অপেক্ষা করছে।"

থেমে থেমে এই আওয়াজ আসছিল। সেই সাথে ক্ষীণ আওয়াজে মন্দিরের ঘণ্টা ধ্বনির মতো ঘণ্টার আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল। সকল হিন্দুর কাছেই এই ঘণ্টার আওয়াজ পরিচিত। সাধারণত মন্দিরেই এমন ঘণ্টা বেজে থাকে।

"এটা কোন ইহলোকের আওয়াজ মনে হয় না।" বললো মহারাজার এক সঙ্গী।

হঠাৎ ঘন একটি ঝোপের ভেতর থেকে একটি প্রকাণ্ড অজগর সাপ মাথা উঁচু করে দাঁড়াল। সেই সাথে সেটি ধীরে ধীরে সামনে অগ্রসর হতে লাগলো।

অজগরকে সামনে অগ্রসর হতে দেখে ঘোড়া তিনটি ভয়ে ভড়কে গিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে ডানে বামে দৌড়াতে লাগলো। এ অবস্থায় ঘোড়া লাগামহীন হয়ে পড়লো। কিন্তু মহারাজা ও তার দুই সফরসঙ্গী ছিল অশ্বচালনায় পারদর্শী। এমতাবস্থাতেও তারা সবাই ঘোড়ার পিঠে নিজেদেরকে সংহত রাখতে সক্ষম হলো। তারা ঘোড়াকে থামানোর চেষ্টা না করে ক্লান্ত হয়ে যাওয়া পর্যন্ত দৌড়ানোর সুযোগ দিল।

* * *

অশ্বারোহী পালিয়ে যাওয়ার পর অজগরটি শিকার হারিয়ে আরেকটি ঝোপের ভেতরে প্রবেশ করল। একটি গর্তের মতো গুহা থেকে ঘন সবুজ ঘাস ও গুল্মের ভেতর থেকে পণ্ডিত মাথা উঁচু করল এবং গুহা থেকে বেরিয়ে পাহাড়ের ঢালে এসে দাঁড়াল। সেখানে দাঁড়িয়ে এদিক সেদিক মাথা দোলাতে লাগলো। সে মনে মনে আফসোস করতে লাগলো তিনো অশ্বারোহী তার নাগালের বাইরে চলে গেছে। ব্যর্থতায় পণ্ডিত আকাশের দিকে তাকিয়ে সেখানেই স্থির দাঁড়িয়ে রইল।

হঠাৎ কোত্থেকে একটি লোক এসে পণ্ডিতের সামনে উদয় হলো।

পুরোহিত তাকে চিনতো। লোকটি ছিল অর্ধবয়স্ক এক সৈনিক। লোকটি তরবারী কোষমুক্ত করে উদ্যত কণ্ঠে পুরোহিতকে বললো, "যদি বাঁচতে চাও তাহলে বলো নদী কোথায়?"

"তুমি এখানে কোত্থেকে এলে? হুমকির সুরে বললো পণ্ডিত। ভালো চাও, তবে এখান থেকে চলে যাও। নয়তো মহারাজাকে বলে তোমাকে মৃত্যুদণ্ড দেবো।"

"তোমার আর রাজার জীবন এখন আমার হাতে।" বললো সৈনিক। আমি জানতে চাই, নদীকে তুমি কোথায় লুকিয়ে রেখেছো? আমি তাকে বলি দিতে দেবো না। নদীর খোঁজ না দিয়ে তুমি এখান থেকে জীবন নিয়ে পালাতে পারবে না পণ্ডিত!

পণ্ডিত তাকে দেবদেবীদের অভিশাপ ও ক্রোধের ভয়ভীতি দেখাতে লাগল এবং বলতে লাগল নদীকে দেবতার সন্তুষ্টির জন্যে বলি দিতে হচ্ছে। তাকে

দেবতা পছন্দ করেছেন। পৃথিবীর মতো নোংরা জায়গা থেকে বিদায় নিয়ে সে তখন থাকবে দেবতার স্ত্রী হয়ে আকাশে। তাতে তুমি বাঁধ সাধছো কেন?

পণ্ডিত যখন এসব কথা বলছিল, ঠিক সেই সময় তার পেছনের ঝোপ থেকে মাথা উঁচু করে উঁকি দিল বিশাল অজগর। অজগরটি মাথা উঁচু করে নিঃশব্দে সামনে অগ্রসর হতে লাগল। মধ্যবয়সী লোকটি অজগরকে আসতে দেখল কিন্তু সে পণ্ডিতকে সতর্ক না করে নিজে ধীরে ধীরে দূরে সরে যেতে লাগল। অজগরটি অগ্রসর হয়ে তার সামনে দাঁড়ানো পণ্ডিতের একটি পা মুহূর্তের মধ্যে মুখের ভেতরে পুরে নিল। পণ্ডিত আর্তচিৎকার দিয়ে উঠলো। অজগর পণ্ডিতকে উপরে উঠিয়ে জমিনে একটা আছাড় দিল। অজগর সাপও কুমিরের মতো খাবার আস্ত গিলে ফেলে। অজগর অনেকটা সময় নিয়ে ধীরে ধীরে শিকার পুরোটাই গিলে ফেলে। পণ্ডিতকে যখন ধীরে ধীরে অজগর গিলতে শুরু করল তখন সে চিৎকার করে সৈনিককে বলতে লাগলো, ভাই! দয়া করে তরবারী দিয়ে সাপটিকে কেটে ফেলো, ভগবানের দোহাই আমাকে উদ্ধার করো, জীবন বাঁচাও।"

"আরে এটা না তোমার দেবতা পণ্ডিতজী! বললো সৈনিক। আমি জানি কখন থেকে তুমি এটিকে দেবতা জ্ঞানে পুষে আসছো। আমি মহারাজার প্রতি বিশ্বস্ত, আমি তোমার সুহৃদ নই। আমি সব জানি। তোমার দেবতা আমার মহারাজার পথ রুখতে পারেনি।"

"আরে ভাই! এসব কথার সময় নয়, তুমি আগে এসে তরবারী দিয়ে এটার মাথা কাটো, আমাকে বাঁচাও।"

চিৎকার করে বারবার বলছিল পণ্ডিত।

"আগে বলো নদীকে কোথায় রেখেছো?"

"হ্যাঁ, বলে দিচ্ছি। ব্যথায় কোঁকরানো কণ্ঠে বললো পণ্ডিত। কিন্তু আগে অজগরটিকে কেটে ফেলো।

"নদী কোথায় বলো। তোমার কাছে একটা নর্তকী তেমন গুরুত্বপূর্ণ মানুষ না হতে পারে কিন্তু ওকে আমি নিজের বোন মনে করি। সে ছিল একটি এতীম মেয়ে। আমার মা বাবা তাকে লালন পালন করে অধিক সুখের আশায় মহারাজার হাতে তুলে দেয়। আমি ওকে এতোটাই আদর সোহাগ করতাম

আর সে আমাকে এতোটাই ভালবাসতো যে ওর ভালোবাসার টানে আমি মহারাজার কাছে চলে আসি। আমি মহারাজার কাছে এসে তরবারী চালনা ও তীর নিক্ষেপে নৈপুণ্য দেখালে তিনি তার একান্ত নিরাপত্তা বাহিনীতে আমাকে চাকরী দিয়ে দেন। সেই থেকে আমি প্রকাশ্যে মহারাজার কিন্তু আড়ালে নদীর নিরাপত্তা বিধানে কাজ করছি। কারণ, নদী আমার সহোদরা বোনের মতোই প্রিয়।

"তাহলে শোন! কোকাতে কোকাতে বললো পণ্ডিত, আমার তাঁবু থেকে দু'শগজ পূর্বদিকে যাবে। ওখানে দু'টি টিলার মাঝখানে গেলে ডানপাশের টিলার মধ্যে একটি গুহার মতো দেখতে পাবে। এর ভেতরে প্রবেশ করলে দেখতে পাবে খুব সাজানো গোছানো একটি জায়গা। যেনো একটি স্বর্গ। তুমি জায়গাটি দেখলে সেখানেই থেকে যেতে চাইবে। সেখানেই তুমি নদীকে পাবে...। আমি তো নদীর কথা তোমাকে বলে দিলাম। এখন সামনে এসো, সাপটাকে তোমার তরবারী দিয়ে কেটে ফেলো, আমাকে উদ্ধার করো...।"

"তুমি তোমার কুকর্মের শিকার হয়েছো পণ্ডিত। তোমার ধোঁকাবাজি আর প্রতারণা তোমাকে গিলে ফেলছে। কারণ, আমি নিশ্চিত জানি এটা নিছকই একটা অজগর, দেবতা নয়। অজগর দেবতা হতে পারে না।" বলে সৈনিকটি একটি অট্টহাসি দিয়ে তরবারী কোষবদ্ধ করে পণ্ডিতের দেয়া তথ্য মতো নদীর খোঁজে ছুট দিলো।

* * *

অজগরটি বারবার পণ্ডিতকে মাটির উপর আছড়াতে আছড়াতে আধমরা করে ফেলল এবং ডান পাটি ছেড়ে দিয়ে মাথাটি মুখের ভেতরে নিয়ে নিল। পণ্ডিত ইতোমধ্যেই জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল। অজগর এবার পণ্ডিতের মাথা মুখে পুড়ে নিয়ে আছাড় দিয়ে দিয়ে ধীরে ধীরে পণ্ডিতকে গিলতে শুরু করল।

অর্ধ বয়স্ক সৈনিক অনেকটা দূরে তার ঘোড়াকে বেধে রেখেছিল। সে দ্রুত ঘোড়ার উপর সওয়ার হয়ে পণ্ডিতের বলে দেয়া জায়গার দিকে ঘোড়া হাঁকাল। পণ্ডিতের বলে দেয়া জায়গাটির আলামত ছিল পরিষ্কার। তাতে কোন জটিলতা

সৈনিক অগ্রপশ্চাত না ভেবেই দ্রুত পাহাড়ের গুহায় প্রবেশ করল। গর্তের ভেতর দিকটা অনেক ফাঁকা। সেখানে মখমলের দামী কাপড়ের বিছানা বিছানো। একপাশে কয়েকটি মূর্তি বসিয়ে রাখা হয়েছে এবং বিছানার এক প্রান্তে সুগন্ধী আগর বাতি জ্বলছে। সারা গুহা লুবানের সুঘ্রাণে ভরে আছে।

নদী সৈনিককে দেখে এমন ভাবে তাকিয়ে রইলো যেনো সে তাকে চেনে না। সৈনিক ছিল বয়স্ক এবং অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ। সে সহজেই বুঝতে পারল নদীকে কোন ওষুধের দ্বারা অবচেতন করে রাখা হয়েছে। নয়তো একাকী থাকা অবস্থায় সে নিশ্চয়ই এখান থেকে বেরিয়ে যেতো। সৈনিক যখন তাকে নদী বলে ডাকল, নদী তার ডাক শুনে মোহনীয় ভঙ্গিতে একটি মুচকি হাসি দিল।

সৈনিক অযথা সময় নষ্ট করতে চাচ্ছিল না। সে বয়স্ক হলেও শরীরের কাঠামো ছিল শক্ত। সে নদীকে পাজা কোলে করে কাঁধে তুলে নিল এবং বাইরে এনে ঘোড়ার পিঠে বসিয়ে দিল এবং নিজেও ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে এক হাতে নদীকে আর অপর হাতে ঘোড়ার লাগাম ধরে জঙ্গলের দিকে রওয়ানা হয়ে গেল।

মহারাজার ছেলে লক্ষণপাল তার পিতা রাজ্যপালকে খুঁজছিলো। বাবার খোঁজে সে পণ্ডিতের তাঁবুতে গেল কিন্তু সেখানে তার বাবাকে পাওয়া গেল না। লক্ষণপাল জানতো পণ্ডিত নদীকে কোথায় রেখেছে। সেখানে গিয়ে সে নদীকেও দেখতে পেল না। শিবিরে ফিরে এলে এক সৈনিক তাকে জানাল, সে পণ্ডিতকে পাহাড়ের ওই দিকে যেতে দেখেছে। লোকটি আরো জানাল, পণ্ডিত একটি বিশাল পোটলা টেনে নিয়ে যাচ্ছিল।

লক্ষণপাল সৈনিকের দেখানো পথে পাহাড়ের দিকে অগ্রসর হলো। পথিমধ্যেই তার চোখে পড়লো পোটলা টেনে হেঁচড়ে নেয়ার চিহ্ন। এই চিহ্ন দেখে দেখে লক্ষণপাল সেখানে চলে গেল। যেখানে অজগর তখনো পণ্ডিতকে গিলে শেষ করতে পারেনি। অর্ধেকের চেয়ে বেশী শরীর মুখের ভেতরে ঢুকিয়ে ফেলেছে। তখনো পণ্ডিতের পা দুটো অজগরের মুখের বাইরে ঝুলছে।

লক্ষণপাল অবস্থা দেখে সাথে সাথে তরবারী কোষমুক্ত করে অজগরটিকে কুপিয়ে দ্বিখণ্ডিত করে ফেলল। কিন্তু পণ্ডিতকে অজগর যে পরিমাণ মুখের ভেতরে ঢুকিয়ে ফেলেছিল সেখান থেকে তাকে আর বের করে আনা সম্ভব হলো

না। লক্ষণপাল অদূরে পড়ে থাকা একটি মোটা কাপড় ও রশি দেখতে পেল। রশিটা দেখেই সে চিনতে পারলো এই রশিটাই সে সেদিন পণ্ডিতকে দিয়ে ছিল যা দিয়ে ফাঁস তৈরী করে পণ্ডিত অজগরকে বশে আনতে সক্ষম হয়। অজগরটির দিকে তাকিয়ে সেটিকেও সে চিনতে পারল। কিন্তু লক্ষণপাল রশি অজগর আর পণ্ডিতের সাপের পেটে যাওয়ার পরিস্থিতি দেখে বুঝে উঠতে পারছিল না, এখানে আসলে কি ঘটেছে এবং কেনই বা ঘটেছে।

* * *

মহারাজা রাজ্যপাল অনেক দূরে গিয়ে তার সঙ্গীদের সাথে মিলিত হলেন। তার ঘোড়াটি অজগর দেখে ভীত হয়ে উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়াতে দৌড়াতে এক পর্যায়ে দৌড়ানোর ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। মহারাজা ও তার সঙ্গীদের ঘোড়াগুলো সাপ দেখে ভয় পেয়ে তীব্রগতিতে দৌড়ানোর ফলে ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে গিয়েছিল বটে কিন্তু তারা যে পথ সারা দিনে অতিক্রম করতেন সেপথ অর্ধেক দিনেই অতিক্রম করলেন। তারা সোজা কন্নৌজের দিকেই অগ্রসর হতে থাকলেন।

* * *

এদিকে নদীকে নিয়ে বয়স্ক সৈনিক সারা দিন এদিক সেদিক ঘুরাঘুরি করলো এবং নদীকে পণ্ডিতের খাওয়ানো ওষুধের প্রভাবমুক্ত করার চেষ্টা করলো। সন্ধ্যার কিছুটা পর নদী তার প্রকৃত অবস্থায় ফিরে আসতে শুরু করল। স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসার সময় নদী তার জ্ঞাতি ভাইয়ের সাথে এভাবে কথা বলছিল যেন সে একটা গভীর স্বপ্ন থেকে জেগে উঠেছে। পণ্ডিত এমন কোন ওষুধ খাইয়েছিল যার প্রভাবে নদী তার স্বাভাবিক বোধ শক্তি হারিয়ে ফেলেছিল। সম্বিত ফিরে আসার পর নদীর স্পষ্ট মনে পড়লো, পণ্ডিত তাকে বলেছিল, দেবতাকে খুশী করার জন্যে সে নদীকে বলি দেবে। এরপরের বিষয়গুলোকে সে স্বপ্ন বলে মনে করলো।

"আরে পণ্ডিত নিজেই তো তার দেবতার খোরাক হয়ে গেছে।" বললো বয়স্ক সৈনিক। সে একটি অজগর ধরে রেখেছিল। অজগর ছেড়ে দিয়ে সে

মহারাজার পথ রোধ করতে চেয়েছিল। কিন্তু অজগর শেষ পর্যন্ত পণ্ডিতকেই গিলে ফেললো।"

"মহারাজা এখন কোথায়?" জানতে চাইলো নদী।

"মহারাজা কন্নৌজ চলে গেছেন। তিনি মুসলমানদের সাথে মৈত্রী চুক্তি করবেন।" বললো সৈনিক।

"মুসলমানদের সাথে মৈত্রীচুক্তি করতে গেছেন!" বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো নদী।

"হ্যাঁ, তাই। এর মধ্যেই মহারাজার মঙ্গল।" বললো সৈনিক। আমার মতো মহারাজাও বুঝে গেছেন, পণ্ডিত পুরোহিত ঠাকুরদের তৈরী হিন্দুধর্ম আসলে একটা ধোঁকা। আসলে এসব দেবদেবী যুদ্ধের ময়দানে কোনই সাহায্য করতে পারে না। মহারাজা তো প্রকাশ্যেই বলছেন, মুসলমানরা একে একে আমাদের ঐতিহ্যবাহী সব মন্দির ধ্বংস করে দিচ্ছে। আমাদের দেবদেবীরা তাদের কিছুই তো করতে পারলো না। বরং দেবদেবীদের মূর্তিগুলোকে ওরা ঘোড়ার পায়ে পিষে মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়েছে। তাতেও কি দেবদেবীদের উচিত ছিল না, নিজেদের এই অপমান অপদস্থের জন্যে মুসলমানদের শাস্তি দেয়া?"

"তুমিও কি সনাতন ধর্মের প্রতি বিরূপ হয়ে গেছো দাদা?" জিজ্ঞেস করলো নদী।

"আচ্ছা নদী! বলতো আমাদের ধর্মটা আসলে কি? রাজা মহারাজাদের আনন্দ দেয়া আর তাদের সুখ-আহ্লাদের জন্যে আমাদের মতো মানুষের জীবন বিলিয়ে দেয়াই কি আমাদের ধর্ম নয়? এসব ব্যাপারে তো আমাদের কখনো ভাবতে দেয়া হয়নি। এখন সময় এসেছে এসব বিষয়ে আমাদের চিন্তা করার। আমাদের ভাবতে হবে আসলে আমরা কোথায় যাচ্ছি, কোথায় যাবো। কালাঞ্জর এখান থেকে এখনো দেড় দিনের পথ। চলো আগে সেখানেই যাই। সেখানে গিয়ে আমরা রাজ দরবারে আমাদের উপস্থাপন করবো। কেউ যদি আমাদের ঠাঁই দেয় তবে সেখানে থেকে যাবো, নইলে অন্য কোন জায়গার জন্যে বেরিয়ে পড়বো।"

নদী ও তার সৈনিকরূপী জ্ঞাতি ভাই সারা দিন রাত পথ চলল। রাত শেষে সকালের দিকে তারা কালাঞ্জরের উপকণ্ঠে পৌঁছলো। তারা যে সময় কালাঞ্জর পৌঁছল ঠিক সেই সময়ে মহারাজা রাজ্যপাল কন্নৌজের সীমানায় প্রবেশ করলেন। তার অপর দুই সঙ্গীও সাথে ছিল। তাদের সবার পেশাক পরিচ্ছদ ছিল অতি সাধারণ মানুষের মতো।

মহারাজা যখন তার ভগ্নপ্রায় রাজধানী দেখলেন, তখন তার মনের মধ্যে বিরাট এক ধাক্কা লাগল। গোটা শহরটিকে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। তখনও পর্যন্ত কোন কোন বাড়ীতে আগুন জ্বলছিল। ভগ্নস্তূপের মধ্য দিয়ে মহারাজা অগ্রসর হলেন এবং প্রধান মন্দিরের সামনে গিয়ে ঘোড়া থেকে নামলেন। তার দিকে চোখ তুলে তাকানোর মতো একটি লোকও ছিল না। মহারাজা মন্দিরের মূল বেদীতে উঠলেন। মন্দির স্থির। সেখানে পূজারীদের কোন তৎপরতা নেই। জনশূন্য মন্দির থেকে দুর্গন্ধ বেরিয়ে এলো, অথচ এখানটায় সবসময় লুবানের গন্ধে সুরভি থাকতো।

মহারাজা মন্দিরের ভেতরে গিয়ে দেখলেন সব শূন্য। না ছিল সেখানে দেবদেবী না ছিল দেবদেবীর মূর্তি। তিনি মন্দিরের ভেতরের কক্ষে প্রবেশ করলেন।

এক পর্যায়ে স্বগতোক্তির মতো তার কণ্ঠে ধ্বনিত হলো, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। আমি জানি না এটা কি দেবতাদের অভিশাপের বহিঃপ্রকাশ যে আমরা আমাদের শহর থেকে উচ্ছেদ হলাম; আমাদের শহর ধ্বংস হয়ে গেলো? এটা কি আমার কোন অপরাধের ফসল? আমি বুঝতে পারছি না, আমরা মিথ্যা, না আমরা সত্যিকার পথে আছি? এখানে পূজা-অর্চনায় দেবদেবীদের সাথে আমার নামও তো উচ্চারিত হতো।"

'সত্য সেই খোদা, যিনি ভজন ও ঘন্টা ধ্বনির উর্ধ্বে।' তার পেছন থেকে উচ্চারিত হলো।

আওয়াজ শুনে মহারাজা ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখলেন, এক লোক তার ভাষায় একথা বলছে। লোকটি আরো বললো, কন্নৌজের রাজা কি ভগ্নস্তূপের মধ্যে নিজের জাঁকজমক এবং ভ্রান্তধর্মের ধ্বংসাবশেষ দেখছেন? মহারাজা কি এসব থেকে শিক্ষা নেয়ার জন্যে এসেছেন?

"আরে তুমি, সংগ্রাম? তুমি এখানে? এখানে কি করছো তুমি?" চেনা লোকটির নাম উচ্চারণ করে তাকে জিজ্ঞেস করলেন মহারাজা?

"যারা বেশ বদল করে এখানে আসে তাদের প্রকৃত রূপ আবিষ্কারের কাজ করি আমি।" জবাব দিলো সংগ্রাম। এখন আর সংগ্রাম নই আমি, উসমান। আমি মুসলমান হয়ে গেছি। আপনি আমাকে গাদ্দার বলতে পারেন। কিন্তু মহারাজা নিজেই যদি জাতির সাথে গাদ্দারী করতে পারেন তাহলে...?"

"না, সংগ্রাম। আমি এখানে কাউকে গাদ্দার বলতে আসিনি। আমি গযনী সুলতানের সাথে সাক্ষাত করতে এসেছি।"

"সুলতানতো গযনী চলে গেছেন। এখানে এখন দায়িত্ব পালন করছেন সেনাপতি আব্দুল কাদের সেলজুকী" বললো উসমান।

"ঠিক আছে, আমাকে তুমি তার কাছেই নিয়ে চলো।"

* * *

সেনাপতি আব্দুল কাদের সেলজুকীকে যখন জানানো হলো, এই ব্যক্তি কন্নৌজের মহারাজা, তখন তিনি একথা বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। কিন্তু তাকে যখন নিশ্চিত করা হলো, এই ব্যক্তিই কন্নৌজের মহারাজা, তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন, মহারাজা কি উদ্দেশ্যে এখানে এসেছেন?"

"সুলতানের শাসনকে মেনে নিতে এসেছি, তার কাছে আত্মসমর্পণের জন্যে এসেছি।" বললেন রাজা রাজ্যপাল। আপনি এখন ইচ্ছা করলে আমাকে বন্দী করতে পারেন, আবার ইচ্ছা করলে হত্যাও করতে পারেন।"

"একজন মহারাজাকে এই বেশে আমি দেখতে চাই না।" বললেন সেনাপতি আব্দুল কাদের সেলজুকি। আপনার শরীর যদি রক্তে রঞ্জিত থাকতো তাহলে আমি দেখে খুশী হতাম, মনে করতাম, আপনি আপনার রাজ্যের জন্য লড়াই করেছেন; কিন্তু আপনি এসেছেন ভিন্ন বেশে। আমি আপনাকে একজন মহারাজা হিসাবে শ্রদ্ধা জানাচ্ছি, আপনাকে সম্মান করছি।"

কাদের সেলজুকি তার সহকর্মীদের নির্দেশ দিলেন, "মহারাজাকে গযনীর শীর্ষ উমারা অভিজাতদের পোশাক পরিয়ে এখানে আনা হোক এবং তার সফর সঙ্গীদেরকে রাজকীয় অতিথি হিসাবে সম্মান দেয়া হোক।"

কিছুক্ষণ পর মহারাজা রাজ্যপাল গোসল করে শরীরে মাখানো ধুলো ময়লা পরিষ্কার করে সুন্দর রাজকীয় পোশাক পরিধান করে সেনাপতি আব্দুল কাদের সেলজুকির সামনে হাজির হলেন। আব্দুল কাদের সেলজুকি মহারাজাকে জিজ্ঞেস করলেন–

"আপনি যে গযনী সুলতানের আনুগত্য করবেন এবং নিজেকে বন্দী থেকে মুক্ত ভাবছেন এর বিনিময়ে আপনার কাছে এমন কি আস্থার জিনিস আছে যার প্রেক্ষিতে আমরা আপনাকে বিশ্বাস করবো?"

"আপনারা নিশ্চয় এখানে আমার খাজাঞ্চীখানা শূন্য পেয়েছেন। আমি সব ধন-সম্পদ এবং রাষ্ট্রীয় ধন-ভাণ্ডার আমার সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলাম। আমার রাজ্যে বারী নামক আরেকটি জায়গা আছে এবং সেখানে আমার কিছু সৈনিকও রয়েছে। আপনি যদি এ ব্যাপারে আমাকে আশ্বাস দেন বারীতে আমি পুনর্বার আমার রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারবো তাহলে আমি আপনাদেরকে এই যুদ্ধের সম্পূর্ণ ব্যয়ভার পরিশোধ করবো এবং বার্ষিক করও দেবো। তাছাড়া আপনাদের সাথে মৈত্রী চুক্তিও স্থাপন করবো।"

"আপনি রাজধানী ত্যাগ করেছিলেন কেন? জিজ্ঞেস করলেন সেলজুকী।

"এ প্রশ্নের জবাব দেয়া আমার পক্ষে কঠিন। এর জবাব ভবিষ্যতের জন্যে থাক। এর কারণ জানাটা খোশামোদী হবে। আমি আমার দেবতাদেরকেও কখনো তোষামোদ করিনি।"

"আপনি কি ইসলাম গ্রহণ করবেন?"

"ধর্মের ব্যাপারে আমি খুবই বিরক্ত" বললেন মহারাজা। আপনার আচার-ব্যবহারে আমি এতোটাই মুগ্ধ হয়েছি যে, কোন দিন হয়তো আমার অন্তর আমাকে বলে বসতেও পারে তুমি ইসলাম গ্রহণ করো। কিন্তু এ মুহূর্তে আমি ওসব কথা বলতে চাই না। আপনি আমার আবেদনের ব্যাপারে চিন্তা করুন।"

"আমি গযনী সুলতানের পক্ষে আপনার আবেদন মঞ্জুর করলাম" বললেন সেনাপতি আব্দুল কাদের। আপনি নতুন করে রাজ্য গঠন করুন, তবে আমার কয়েকজন সামরিক কর্মকর্তা বারী গিয়ে আপনার কার্যক্রমের ব্যাপারে খোঁজ খবর নেবে। এখনই আপনার সাথে লিখিত মৈত্রী চুক্তি সম্পাদিত হয়ে যাবে।

আপনার যুদ্ধব্যয়ের ক্ষতি পূরণের পরিমাণ এবং বার্ষিক কর সুলতান নিজে নির্ধারণ করবেন। এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পয়গাম দিয়ে আজই আমি দূত পাঠিয়ে দেবো।"

* * *

এদিকে নদী তার জ্ঞাতি ভাইয়ের সাথে কালাঞ্জর পৌছে গেল। সৈনিক কালাঞ্জরের রাজাকে জানাল, মহারাজা রাজ্যপাল গযনীর আনুগত্য স্বীকার করে নেয়ার জন্যে কন্নৌজ গেছেন। একথা শুনে কালাঞ্জরের রাজা গুণ্ডা ক্ষোভে প্রায় লাফিয়ে উঠলেন। তখন গোয়ালিয়রের রাজা অর্জুনের কাছে পয়গাম পাঠালেন, "আমরা যা আশঙ্কা করেছিলাম অবশেষে তাই ঘটেছে। রাজ্যপাল গযনীর আনুগত্য স্বীকার করে মুসলমানদের সাথে মৈত্রী চুক্তি করেছে।

এখন রাজ্যপালকে হত্যা করা ছাড়া আমাদের আর কোন গত্যন্তর নেই। আর রাজা ভীমপালকে সাথে নিয়ে চিরদিনের জন্য গযনীর সুলতানকে খতম করা ছাড়া আমাদের আর বিকল্প কোন পথ নেই। আসুন আমরা শেষ এবং চূড়ান্ত লড়াইয়ে নেমে পড়ি।"

গযনীর সম্ভ্রম

১০১৯-২০ খ্রিস্টাব্দের হজ্জ মৌসুমের আর কয়েকটি মাস মাত্র বাকি আছে। হজ্জে যাওয়ার জন্যে হজ্জগমনেচ্ছুক যাত্রীরা প্রস্তুতি শুরু করেছেন। তখনকার দিনে এক একটি অঞ্চল থেকে হাজারো যাত্রী একত্রিত হয়ে গন্তব্যে যাত্রা শুরু করতেন। তখনকার দিনে আজকের মতো উড়োজাহাজ ছিলো না। হজ্জযাত্রীরা উট, গাধা, ঘোড়া কিংবা পায়ে হেঁটে দল বেধে হজ্জ যাত্রা করতেন। হজ্জযাত্রীদের সাথে ব্যবসায়ীরা থাকতেন। কেউ কেউ স্ত্রী-সন্তান নিয়ে হজ্জ কাফেলায় অংশগ্রহণ করতেন।

কাফেলা যতো বেশী বড়ো হতো যাত্রীরা ততো বেশী নিরাপদ বোধ করতো। আর কাফেলা যতো ছোট হতো ততোই বাড়তো নিরাপত্তাহীনতা। কারণ প্রায়ই হজ্জ কাফেলার উপর সঙ্গবদ্ধ ডাকাত দলের আক্রমণ হতো। এজন্য সবার চেষ্টা থাকতো বড় কাফেলার সঙ্গী হওয়ার। তাই কাফেলা যতোই সামনে অগ্রসর হতে থাকতো পথে পথে বিভিন্ন এলাকার মুসাফিররা কাফেলার সাথে যুক্ত হতো। ফলে দিন দিন কাফেলার লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পেতো।

ডাকাতেরাও কম যেতো না। ডাকাত দলও বিশাল বিশাল ডাকাত কাফেলা গড়ে তুলতো। এক সময় এশিয়া মাইনর থেকে যাওয়া হজ্জযাত্রীদের লুটতরাজ করতে খ্রিস্টান রাজশক্তিগুলো লুটেরাদের সঙ্গে তাদের নিয়মিত সেনাদেরও নিয়োগ করতো।

আবুল কাসিম ফারিশ্‌তা বহু ঐতিহাসিকের সূত্র উল্লেখ করেছেন, হাম্মাদ বিন আলী নামের এক লোক ছিল সুলতান মাহমূদের শাসনামলে আরব অঞ্চলের সবচেয়ে কুখ্যাত ও শক্তিশালী ডাকাত সর্দার। এই ডাকাত সর্দার পশ্চাদপদ আরব বেদুঈনদের একত্রিত করে বিশাল এক ডাকাতগোষ্ঠী গড়ে তুলেছিল। তার এই ডাকাত দল সারা বছরই বিভিন্ন কাফেলায় লুটতরাজ করতো। তার ডাকাত দল ছিল নিয়মিত একটা সেনাবাহিনীর মতোই শক্তিশালী এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। এই ডাকাতগোষ্ঠী আরব দেশের সীমানাবর্তী এলাকাগুলোয় হজ্জযাত্রীদের কাফেলাতেও লুটতরাজ চালাতো এমনকি যুবতী মেয়েদের পর্যন্ত তুলে নিয়ে যেতো। ডাকাত সর্দার হাম্মাদ বিন আলীর ডাকাতরা গযনীর কয়েকটি হজ্জ কাফেলাও লুট করেছিলো।

সুলতান মাহমূদের কানেও এ খবর পৌঁছেছিল। কিন্তু হিন্দুস্তানের যুদ্ধ আর স্বগোত্রীয় কুচক্রী শাসকদের শত্রুতার করণে তিনি ডাকাত দল নির্মূলের প্রতি মনোযোগ দিতে পারেননি। তাছাড়া এ ব্যাপারে কোন পদক্ষেপ নেয়ার জন্যে অনেক বাঁধা-বিপত্তিও ছিল। কারণ, গযনীর যেসব হজ্জ কাফেলা লুটতরাজের শিকার হয়েছিল এর ঘটনাস্থল ছিল আরব এলাকায়। যে এলাকা ছিল গযনীর রাষ্ট্র সীমানা থেকে অনেক দূরে অন্য শাসকদের নিয়ন্ত্রণে। অন্যের সীমানায় গযনী থেকে শত শত মাইল দূরের কোন ডাকাত দলের বিরুদ্ধে অভিযান চালানোটাও ছিল তার জন্যে দুরূহ ব্যাপার।

ঐতিহাসিক ফারিশ্তা লিখেছেন, সুলতান মাহমূদের শাসনামলে বাগদাদের কেন্দ্রীয় খলীফা ছিলেন আল কাদের বিল্লাহ আব্বাসী। তখন মুসলিম বিশ্বের কেন্দ্রীয় শাসন বাগদাদ কেন্দ্রিক ছিল। তখন নামে মাত্র খেলাফত ছিল। মূলত খেলাফত তখন রাজতন্ত্রের মতোই ক্ষমতার মসনদে পরিণত হয়েছিল। আলকাদের বিল্লাহ একটি এলাকার শাসকও ছিলেন। তিনি তার শাসনাধীন এলাকার বিস্তৃতির জন্যে সচেষ্ট ছিলেন। যদিও কেন্দ্রীয় খলীফা হিসেবে এটা ছিল একেবারেই তার জন্য অন্যায় ও বেমানান। তার এই প্রচেষ্টা ছিল পর্দার অন্তরালে। ক্ষমতালিপ্সু আর দখলদারদের জন্যে মিথ্যা প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ করাটা সাধারণ ঘটনা। বস্তুত ক্ষমতালিপ্সু হওয়ার কারণে মুসলিম সালতানাতের ভেতরে নানান ভাঙ্গাগড়ায় খলীফার নেপথ্য হাত থাকতো। অনেক ক্ষেত্রে তিনি নিজেই গোলযোগের ক্রীড়নক হিসেবে কাজ করতেন। এ কারণে সুলতান মাহমূদের সাথে তার একটা দ্বন্দ্বও ঘটে গিয়েছিল।

বহু ঐতিহাসিক বলেছেন, খলীফা আল কাদের বিল্লাহ জানতেন হাম্মাদ বিন আলীর নেতৃত্বে আরবের বহু বেদুঈন গোষ্ঠী ডাকাতিতে লিপ্ত। কিন্তু তিনি সবকিছু জেনেও চোখ বুজে থাকতেন।

১০১৯-১০২০ সালের হজ্জ মৌসুমে যখন হজ্জ কাফেলা প্রস্তুত হচ্ছিল, তখন বাগদাদে ডাকাত সর্দার বিন আলী খলীফার একজন সেনাপতির কক্ষে অবস্থান করছিল। তার সাথে ছিল দু'টি সুন্দরী যুবতী। সেনাপতি যুবতীদের দেখে মুচকি হাসছিল। যুবতী দু'জন ছাড়া, ডাকাত সর্দার হাম্মাদ বিন আলী আরো বহু উপহার উপঢৌকন সাথে নিয়ে এসেছিল।

কিছুক্ষণ পর দুই তরুণী আর উপহারগুলো অন্য কক্ষে চলে গেল। সেনাপতি ও ডাকাত সর্দার হাম্মাদ শুধু সেই কক্ষে থাকল।

খলীফার মন-মানসিকতা ও মেজাজ-মর্জি এখন কেমন হচ্ছে সম্মানিত সেনাপতি! জিজ্ঞেস করল হাম্মাদ। কারণ হজ্জের মৌসুম তো আসছে।

"খলীফার মেজাজ আমার হাতে"। বললো সেনাপতি। আমি জানতাম মওসুম শুরু হওয়ার আগে তুমি আসবে। আমার অংশ যদি তুমি ঠিক মতো পৌঁছে দাও তাহলেই হলো। তুমি খলীফার চিন্তা করো না। খলীফা ক্ষমতা আর গদির প্রেমিক। তার চারপাশে এমন দরবারী লোকজন দরকার এবং আছেও যারা তাকে ধারণা দেবে, খলীফা সারা দুনিয়ার বাদশা, দুনিয়ার সিংহ ভাগের রাজত্ব তার অধীন। প্রজারা তার রাজত্বে অত্যন্ত খুশী। তোষামোদির এ কাজ আমরা দক্ষতার সাথে করছি। খলীফা যেসব ব্যাপারে খুশী থাকে আমরা তাকে তেমনটাই রাখতে চাই। আমরা ধারণা দিয়েছি, তুমি একজন বিরাট বড় ব্যবসায়ী। যার ব্যবসা গযনী থেকে হিন্দুস্তান এবং আরব থেকে মিশর পর্যন্ত বিস্তৃত।

"এখন আমি আমার ব্যবসা গযনী পর্যন্ত বিস্তৃত করতে চাই। ওখান থেকে আমি খবর পেয়েছি হাজারো লোকজনের কাফেলা হজ্জের জন্য আসছে। ধীরে ধীরে তাদের সংখ্যা নাকি আরো বাড়বে। আমাকে জানানো হয়েছে, এই কাফেলার মধ্যে হিন্দুস্তান থেকে আনা মূল্যবান অনেক ধন-সম্পদ আসছে...। আচ্ছা সেনাপতি সাহেব, একথা কি ঠিক গযনীর সুলতান হিন্দুস্তান খালি করে সব ধন-সম্পদ নিয়ে এসেছে?

"আরে তার পাঠানো উপহার তো খলীফার কাছেও পৌঁছেছে।" জবাব দিলো সেনাপতি। এটা ঠিক সুলতান মাহমূদ হিন্দুস্তান থেকে এই পরিমাণ সোনাদানা, মণিমুক্তা সোনা-রুপার মুদ্রা নিয়ে এসেছে যা তোমার আমার মতো মানুষ কল্পনাও করতে পারবে না।"

"আমাকে বলা হয়েছে, সে নাকি তার সেনাবাহিনীকে এসব ধন-সম্পদের অংশ থেকে বিনা হিসাবে দুহাতে ঢেলে দিয়েছে।" বললো হাম্মাদ। এই সেনাদের আত্মীয়-স্বজনরাই এ বছর হজ্জ করতে আসছে। হিন্দুস্তানের অনেক দামি দামি জিনিস তারা হজ্জে নিয়ে আসবে। এগুলো আবার আরব দেশের

বাজারে বিক্রির জন্যে অনেকেই নিয়ে আসছে। তাছাড়া সুলতানের সেনাবাহিনীর কাছ থেকে যে ব্যবসায়ীরা মাল পত্র কিনে সেই ব্যবসায়ীরা ও এই হজ্জ কাফেলার সাথে আসছে। এমন ধন-সম্পদে প্রাচুর্যময় কাফেলা আমার জীবনে একটিও পাইনি। খবর শোনার পর থেকেই আমি এই কাফেলার প্রতি সম্পূর্ণ মনোযোগ দিয়েছি। আমি আপনার কাছে এজন্য এসেছি, আমি নিশ্চিত হতে চাই, যদি গযনীর এই কাফেলার উপর হাত দেই তাহলে খলীফা না আবার আমার ঘাড় কাটার ব্যবস্থা করে। কারণ সে তো সুলতান মাহমূদকে ভয় পায়।"

"আরে কি বলছো তুমি? আমি তোমাকে বলিনি খলীফা তো তোমাকে ব্যবসায়ী বলেই জানে, বললো সেনাপতি। কে জানবে গযনী কাফেলাকে তুমি লুট করেছো?... অবশ্য তোমাকে একটা ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। কাফেলা অনেক বড় হবে, তোমার কাফেলাতেও জনবল বেশী থাকতে হবে। হতে পারে সুলতান মাহমূদ কাফেলার সাথে সেনাবাহিনীর কোন ইউনিট পাঠিয়ে দিতে পারে। শুনেছি, সে নাকি একজন পাক্কা মুসলমান। হজ্জযাত্রীদেরকে সে খুবই সম্মান করে এবং হজ্জ যাত্রীদের সম্ভাব্য সব ধরনের সাহায্য সহযোগিতা করে।"

"এখন আমিও ইচ্ছা করলে বিরাট বাহিনী গড়ে তুলতে পারি। কারণ সকল উপজাতি বেদুঈন আমার নিয়ন্ত্রণে। সাত আটশ লোক সহজেই আমি নিয়ে আসতে পারবো, বললো হাম্মাদ। মাননীয় সেনাপতি! আপনি তো বেদুঈন কবিলাগুলো সম্পর্কে জানেন... এরা জন্ম থেকেই যোদ্ধা। এরপরও আমি সরাসরি সম্মুখ যুদ্ধে লিপ্ত হবো না। আমি তো সুযোগ বুঝে হঠাৎ ঝটিকা আক্রমণ করে সব লুটে নেবো।"

"হ্যাঁ, কোন পাহাড়ী এলাকায় সুবিধাজনক জায়গায় অতর্কিত আক্রমণ চালাবে... এই তো?" বললো সেনাপতি।

"না না, পাহাড়ী জায়গা কেন, কায়েদ মরু অঞ্চলে। আপনি কেমন সেনাপতি? কায়েদ মরু অঞ্চল সম্পর্কে বুঝি আপনার ধারণা নেই। কায়েদ মরু অঞ্চলে যখন কোন কাফেলার উপর আক্রমণ হবে তখন কাফেলার লোকজন খালি ময়দান পেয়ে এদিক সেদিক ছড়িয়ে পড়বে। কিন্তু লুকানোর মতো কোন জায়গা তারা পাবে না। কায়েদ মরু অঞ্চল সম্পর্কে আমি জানি। সেখানে

একটা জায়গা আছে যেখানে অসংখ্য বালিয়াড়ী। এই জায়গা সম্পর্কে আমার কবিলা অবগত। কোন অপরিচিত লোক ওখানে পথ হারিয়ে ফেললে তার পক্ষে বালিয়াড়ীর প্যাক মাড়িয়ে পথ পাওয়া কঠিন। এই স্থানে গযনীর বাহিনীও সুবিধা করতে পারবে না। আমার সাথে যেসব বেদুঈন কবিলার লোক আছে এরা মানুষ নয়, মানুষরূপী দৈত্য। আপনি আমাকে খলীফার সাথে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে দিন। তার খেদমতেও আমি কিছু উপহার পেশ করতে চাই।"

খলীফা আল কাদের বিল্লাহ্ তার খাস কামরায় উপবিষ্ট ছিলেন। তার একান্ত বিশ্বস্ত সেনাপতি তাকে বলছিল, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী হাম্মাদ বিন আলী তার সাথে সাক্ষাত করতে এসেছে। হাম্মাদের নিয়ে আসা বিপুল উপহার উপঢৌকন খলীফার সামনে পেশ করা হলো। সেনাপতি হাম্মাদ বিন আলীর দীর্ঘ গুণকীর্তন করলো। সেই সাথে বললো, হাম্মাদ বিন আলী অনেক কাজের লোক। সে সকল বিদ্রোহী বেদুঈন গোষ্ঠীগুলোকে আপনার তাবেদার বানিয়ে ফেলছে এবং সে এসব বেদুঈন গোষ্ঠী থেকে আপনার সেনাবাহিনীর জন্যও লোক সংগ্রহ করতে শুরু করেছে। প্রয়োজনের সময় এসব বেদুঈন আমাদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করবে।"

'এসব বেদুঈন খুবই স্বাধীনচেতা ও উগ্র। আমি শুনেছি এরা নাকি বিভিন্ন কাফেলা লুটে নেয় এবং অনেক তরুণী মেয়েদের অপহরণ করে এনে বিক্রি করে দেয়' বললেন খলীফা।

'জনাবে আলী মুহতারাম, এসব হচ্ছে ওদের দেয়া অপবাদ, যারা হাম্মাদ বিন আলীর জনপ্রিয়তা এবং তার শক্তির প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ। তোষামোদীর চূড়ান্ত নিদর্শনস্বরূপ বললো সেনাপতি।

"আসলে প্রতিটি জনপ্রিয় লোকই পরশ্রীকাতর ঈর্ষাপরায়ণদের গলার কাটা হিসেবে বিবেচিত হয়। আপনারও হয়তো শত্রু আছে যখন দেখে আপনার প্রজারা আপনার নাম উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শ্রদ্ধায় মাথা অবনত করে দেয়। তখন হিংসুটেদের গায়ে জ্বালা শুরু হয়। ওরা অস্বস্তিবোধ করে। হাম্মাদ বিন আলী সকল বিদ্রোহী বেদুঈন গোষ্ঠীগুলোকে তার অনুগত বানিয়ে ফেলেছে এবং সে আপনার একজন অন্ধ ভক্ত। সমস্ত বেদুঈন গোষ্ঠীগুলোকেই সে আপনার অনুগত বানিয়ে ছাড়বে।"

"আমীরুল মু'মিনীন! সেনাপতির অনুগত আরেক তোষামোদকারী দরবারী আমলা বললো, এই বয়সেও আপনারা চেহারা মোবারকে যৌবনের দীপ্তি বিদ্যমান। হাম্মাদ বিন আলী আপনার জন্যে যে তুহ্‌ফা এনেছে তা আপনি রাতে আপনার হারেমে দেখতে পাবেন।

"আপনিই এই হাদিয়া উপযুক্ত" বললো সেনাপতি।

"হাম্মাদ বাইরে অপেক্ষা করছে। আপনি হাম্মাদকে সাক্ষাতের অনুমতি দিয়ে তাকে সম্মানিত করুন।"

"তাকে আর বাইরে অপেক্ষমাণ রাখা হলো কেন? সারা জগতের বাদশার মতো শাহী মেজাজে বললেন খলীফা। তাকে আমি আমার সাথে বসিয়ে সম্মানিত করবো।"

খলীফার অনুমতির সাথে সাথে হাম্মাদ বিন আলীকে খলীফার সামনে হাজির করা হলো। সে ছিল প্রকৃতপক্ষেই জাত আরব। তার চেহারা ছিল টকটকে লাল আর চোখ ঘন কালো। বয়স পৌঢ়ত্বের কাছাকাছি; কিন্তু শরীরের গাঁথুনী এতোটাই মজবুত যে, তখনো দেখতে যুবকের মতো। তার চেহারার মধ্যে সেই সব আরবের দ্যুতি ছিলো যারা রোমানদের গর্ব খর্ব করে তাদের অহংকার ধুলায় মিশিয়ে দিয়েছিল। যারা আরবের সীমানার বাইরে সাগর পাড়ি দিয়ে ইসলামের ঝাণ্ডা ইউরোপের বুকে গেড়ে দিয়েছিল। হাম্মাদের বাহু ছিলো লম্বা, কাঁধ চওড়া। বুক ও বাহু পেশীবহুল মাংসল।

সে যখন খলীফার কক্ষে প্রবেশ করল তখন তার পায়ের নীচে পৃথিবীটা যেনো দুলছিল। তার ঠোঁটে ছিল ঈষৎ হাসির রেখা এবং চেহারায় পৌরুষের দীপ্তি। তার চেহারার গভীর দৃষ্টি, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পোশাক-পরিচ্ছদের দ্বারা কারো সন্দেহ করার উপায় ছিল না এই লোকটি লুটেরাদলের সর্দার।

হাম্মাদ বিন আলী প্রবেশ করতেই খলীফা দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, এগিয়ে এসো হাম্মাদ বিন আলী। আল্লাহর কসম! তোমার চেহারা দেখেই আমি বুঝে ফেলেছি তুমি খেলাফতের মর্যাদা রক্ষার একজন নিবেদিতপ্রাণ সৈনিক। লুটতরাজকারী বেদুঈন লোকগুলোকে বশে এনে তাদের নিয়ন্ত্রণ করে তুমি ইসলাম ও খেলাফতের বিরাট খেদমত আঞ্জাম দিচ্ছো।"

"আমীরুল মুমিনীন! আমি আপনার নগণ্য একজন প্রজা মাত্র বললো হাম্মাদ। প্রজাদের মধ্যে এমন কোন ব্যক্তিটা আছে, যে আপনার আনুগত্য না করার ধৃষ্টতা দেখাবে। আপনি ঠিকই বলেছেন, এই অধম খেলাফতের একজন নগণ্য সৈনিক। আপনার খেদমতে আমার জীবন এবং সমগ্র বেদুঈন গোষ্ঠীগুলোর আনুগত্য পেশ করতে এসেছি।

খলীফা হাম্মাদ বিন আলীকে এমনভাবে তার পাশাপাশি বসালেন যেন কেউ অবচেতন মনে কোন কেউটে সাপ তার জামার আস্তীনে ভরে ফেলল।

* * *

বাগদাদের খলীফার প্রাসাদ যেমন তোষামোদকারী ভোগবাদী আমলা, সেনাপতি আর দরবারীদের দ্বারা পূর্ণ ছিল। খেলাফত একটি প্রতীকে পরিণত হয়েছিল। খলীফা ভোগবিলাসিতায় আকণ্ঠ ডুবে গিয়েছিলেন। ইসলাম ও মুসলমানদের স্বার্থের কথা চিন্তা না করে জাতি ধর্মের সমূহ ক্ষতি হলেও তারা নিজেদের ভোগবাদিতা ও ক্ষমতার মসনদ আঁকড়ে থাকাটাতেই বেশী গুরুত্ব দিতে শুরু করেছিলেন। ঠিক তখন সেদিনকার আন্দালুস তথা আজকের স্পেনের অবস্থাও এমনই হয়ে পড়েছিল। তৎকালীন আন্দালুসিয়ার রাজধানী কর্ডোভা চক্রান্ত আর ষড়যন্ত্রকারীদের আখড়ায় পরিণত হয়েছিল। স্পেন বিজয়ী তারেক বিন যিয়াদের হাড়মাংস হয়তো তখন মাটির সাথে মিশে গিয়েছিল। তার আত্মা হয়তো পরিবর্তিত আন্দালুসকে জয় করার জন্য মহাসাগর পাড়ি দিয়ে সকল জাহাজ পুড়িয়ে দিয়েছিলেন, ফিরে আসার সব ব্যবস্থা ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। সেই তারেক বিন যিয়াদের আন্দালুস তখন তোষামোদকারী, ক্ষমতালিপ্সু স্বার্থপর দরবারী ও আমত্যবর্গের আখড়ায় পরিণত হয়েছিল।

যেদিন বাগদাদের খলীফার দরবারে এক লুটেরা ডাকাত সর্দারকে বিশিষ্ট ব্যবসায়ীর সম্মানে ভূষিত করা হয়েছিল, ঠিক সেই সময় আন্দালুসিয়ায় চলছিল ক্ষমতার মসনদ দখলে চাচা ভাতিজার দ্বন্দ্ব।

খোলাফায়ে রাশেদীনের পর প্রায় অধিকাংশ খলীফার যুগেই তোষামোদকারী ও চাটুকারদের একটি গোষ্ঠী খলীফাদের ঘিরে রেখেছে। তারা কখনো শাসকদের সত্যিকার পথে পরিচালিত হতে দেয়নি। প্রশংসা আর ভোগ

বিলাসিতায় শাসক গোষ্ঠীকে লিপ্ত রেখে নিজেদের জাগতিক স্বার্থ উদ্ধার করেছে। আর এই সুযোগে ইসলামের শত্রুরা ইঁদুরের মতো ক্ষমতার শিকড় কেটেছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এসব তোষামোদকারীদের প্ররোচনায় অযোগ্য অসৎ লোকেরা শাসনকার্যের গুরুত্বপূর্ণ পদগুলো দখল করেছে। আর খেলাফতের ছত্রছায়ায় বসে এরা খেলাফতের বিরুদ্ধে সব ধরনের চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র এবং ধ্বংসাত্মক কাজ করেছে।

ইতিহাস সাক্ষী, অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীরাও তাদের বিবেক বিক্রি করে দিয়েছেন। ফলে আন্দালুসে যখন ইসলামের প্রদীপ নিষ্প্রভ হয়ে আসছিল বাগদাদেও খেলাফতের প্রাণশক্তি নিঃশেষ হয়ে রাজতন্ত্রের রূপ ধারণ করছিল। ফলে হাম্মাদ বিন আলীর মতো ডাকাত সর্দার বাগদাদের খলীফার কাছে পাচ্ছিল বিশিষ্ট ব্যবসায়ীর মর্যাদা। অপর দিকে সত্যিকার মুসলমান ও ইসলাম প্রেমিক সুলতান মাহমূদ ছিলেন এদের সবার জন্যেই গলার কাঁটা।

* * *

হাম্মাদ বিন আলীর সাথে চারজন নিরাপত্তারক্ষী ছিল। তাদের একজন ছিল তুর্কী বংশোদ্ভূত ইরতেগীন। দু'বছর আগে সে হাম্মাদের ডাকাত দলে ভিড়ে যায় এবং হাম্মাদের অতি বিশ্বস্ত সঙ্গী ও নিরাপত্তা রক্ষীতে পরিণত হয়।

অন্যান্য বছরের মতো সেই বছর গযনীতেও একটি হজ্জ কাফেলা মক্কা যাওয়ার জন্য তৈরী হচ্ছিল। প্রস্তুতির অন্যতম লক্ষ্য ছিল কিভাবে বেশী লোক হজ্জ কাফেলাতে জড়ো করা যায়। এর ফলে ডাকাত ও লুটেরাদের হাত থেকে নিরাপদে থাকা যায়। গযনী ছাড়াও আরো বহু দূর-দূরান্ত থেকে লোকজন এসে গযনীর হজ্জ কাফেলায় শরীক হচ্ছিল। এ উপলক্ষে বহু উট, ঘোড়া এবং গরুর বেচাকেনা হচ্ছিল। ঘোড়ার গাড়ি ও গরুর গাড়ি তৈরীর ধুম পড়ে গিয়েছিল গযনীতে। অনেকটা মেলার আকার ধারণ করেছিল হজ্জ যাত্রীদের আয়োজনে। এই মেলায় হাম্মাদ বিন আলীর লোকজনও ঘোরাফেরা করছিল। তারা পর্যবেক্ষণ করছিল কাফেলার সাথে কতজন লোক যাওয়ার সম্ভাবনা আছে এবং মালপত্র কি পরিমাণ যাবে। যে সব লোক যাবে তাদের কি লড়াইয়ের শক্তি থাকবে কি-না।

মাস দেড়েক পরে হজ্জ কাফেলার রওয়ানা হওয়ার কথা। কাফেলার যাওয়ার পথে আরব এলাকায় মরু অঞ্চলে একটি মরুদ্যান পড়ে। মরুদ্যানটি ছিল যথেষ্ট বিস্তৃত এবং গাছপালা সজ্জিত। সেখানে বহু অভিযাত্রী তাঁবু ফেলেছিল। রাতের বেলায় বহু মশাল জ্বলছিল। যেন তাঁবুর শহর। তাঁবু থেকে একটু দূরে কয়েকজন লোক আসর বেধে বসেছিল। আসরের এক জায়গায় গালিচা বিছানো ছিল। সেখানে বসেছিল হাম্মাদ বিন আলী। সেখানেও মশাল ও বাতি জ্বলছিল।

আসরের মাঝখানে এক নর্তকী নাচছিল। হাম্মাদের সাথে আরো তিন চারজন সুন্দরী যুবতী বসেছিল এবং এরা অন্যদের শরাব পেশ করছিল। যুবতীদের কাঁধ পেট ছিল অর্ধনগ্ন। তাদের পরিধেয় পাগড়ির মতো পোশাকে ছিল তারকা খচিত। এদের চালচলন এমন ছিল যেন মরুর উপর এরা সাঁতার কাটছে। সবার সামনে কয়েকটি আস্ত খাসী ভুনা করে রাখা হয়েছিল।

নর্তকীর নাচ আর বাদকদের বাজনার তাল মিলিয়ে মরুভূমির মধ্যে একটা মন মাতানো সুরের আবহ তৈরী করেছিল। সেই রাতটি যেন ছিল আলিফ লায়লার রহস্য রজনীর মতোই রহস্যে ঘেরা একরাত। মরুভূমির এই অংশটি ছিল সাধারণ গমন পথ থেকে অনেকটা দূরে। এটাই ছিল হাম্মাদ বিন আলীর জগৎ। মরুভূমির মধ্যে যে নৈসর্গিক মরুদ্যান ছিল এটিকেই হাম্মাদ বিন আলী তার শিষ্যদের আবাসস্থলে পরিণত করেছিল। হাম্মাদ বিন আলী ছিল এই জগতের সর্দার, রাজা বাদশা। এখানে হাম্মাদ ছাড়া জগতের আর কারো কোন হুকুম চলতো না।

সেই রাতে তার পাশে যারা বসেছিল তারা ছিল বিভিন্ন আরব বেদুঈন স্বাধীন গোত্রগুলোর সর্দার। যারা কোন খলীফার শাসন মানতো না। তাদের উপর কারো কোন হুকুম চলতো না। তাদের চেহারা ছবিই বলে দিচ্ছিল তারা কোন আইন কানুনের ধার ধারে না এবং তারা আল্লাহ্ রাসূলকেও ভয় করে না। বেদুঈনদের এই সমাবেশে সুন্দরী এই তরুণীদের মনে হচ্ছিল এরা অন্য কোন জগতের বাসিন্দা।

হাম্মাদ বিন আলীর এ রাত এভাবেই ভোগ বিলাসিতা আর শরাব পানের মধ্যে কেটে গেল। সকাল বেলা যখন সূর্য উঁকি দিল, তখন সব লোক সবুজ

বৃক্ষের ছায়ায় টাঙানো তাঁবুতে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লো। মরুভূমিতে আগুন জ্বালিয়ে সূর্য যখন ডুবে গেল তখন তারা সবাই জেগে উঠলো এবং গত রাতের মতো আজো সেই আসরে গিয়ে জমায়েত হলো। কিন্তু পরের রাতে আর নর্তকী ছিলো না। অবশ্য শরাব পানকারিণীরা যথারীতি উপস্থিত ছিল।

"বন্ধুগণ!" বেদুঈন সর্দারের উদ্দেশ্যে হাম্মাদ বিন আলী বললো, হজ্জ কাফেলার যাত্রা শুরু হতে যাচ্ছে। দূরের লোকজন এরই মধ্যে যাত্রা শুরু করে দিয়েছে। এবার বিরাট বড় এক শিকার আসছে। এই শিকার হলো গযনীর হজ্জ কাফেলা। এই কাফেলার সাথে গযনী বাহিনীর অর্জিত হিন্দুস্তানের গনীমতের ধন-সম্পদ আসছে। তোমরা এর আগেও গযনীর কাফেলা লুটেছো কিন্তু তেমন কোন সম্পদ পাওনি। আমি খবর পেয়েছি এ বছর যে কাফেলা আসছে এটা লুট করতে পারলে তোমাদের সারা জীবনের কামাই হয়ে যাবে। কিন্তু এই কাফেলায় হাত দেয়া সহজ ব্যাপার নয়। কাফেলায় কমপক্ষে হাজার দেড়েক লোক থাকবে, সবাই থাকবে অস্ত্রসজ্জিত। তাছাড়া তাদের নিরাপত্তার জন্য সেনাবাহিনীর লোকজনও থাকবে। দু'একশ লোকের পক্ষে এই কাফেলায় হাত দেয়া সম্ভব নয়। আমাদের সবাইকে মিলে একটি সংঘবদ্ধ সেনাবাহিনীর মতো আক্রমণ করতে হবে...। তোমরা সবাই কি বলতে পারো, তোমরা প্রত্যেকেই কতোজন করে লোক সাথে আনতে পারবে?"

"এক হাজার" একজন হাত তুলে বললো।

"ছয়শ" আরেক গোত্রপতি হাত তুলে বললো।

"চারশ'" বললো আরেকজন।

একে একে সব গোত্রপতি বললো কতোজন লোক আনতে পারবে। সব মিলে সংখ্যা দাঁড়ালো পাঁচ হাজার।

"মনে রেখো, আমাদের দরকার সিপাহী যোদ্ধা। পাঁচ হাজার যুবক দিয়ে আমাদের কোনই কাজ হবে না" বললো হাম্মাদ বিন আলী। হয়তো আমাদের যুদ্ধ করার দরকার নাও হতে পারে। কিন্তু আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। আমি বাগদাদ থেকে এসেছি। খলীফার এক সেনাপতি আমাকে বলেছে, গযনীর সুলতান মাহমূদ হাজীদের খুব সম্মান করে এবং তাদের সেবা যত্নের প্রতি খুবই খেয়াল রাখে। বিরাট এই কাফেলার নিরাপত্তার জন্যে সে হয়তো কোন সেনা ইউনিটও পাঠিয়ে দিতে পারে।"

প্রত্যেক গোত্রপতি হাম্মাদকে এই বলে আশ্বস্ত করলো, তারা এমন লোকদেরই আনবে যারা গযনীর সেনাবাহিনীকেও কচুর মতো কেটে ফেলবে।

"তোমরা যদি সত্যিই সৈনিকের মতো শক্তি নিয়ে আসতে পারো তাহলে তোমাদেরকে আমি বাড়তি আরেকটি পুরস্কার দেবো।" বললো হাম্মাদ। হাম্মাদের পাশেই বসা ছিল এক সুন্দরী তরুণী। বিগত এক বছর যাবত এই তরুণী হাম্মাদের সাথে ছিল। হাম্মাদ তরুণীর মাথায় হাত রেখে বললো, এ হলো গযনীর সুন্দরীদের নমুনা। গযনীর কাফেলা থেকেই আমি একে পেয়েছি। এবার এমন বহু সুন্দরী আসছে। অনেকেই আসছে গোটা পরিবার পরিজন নিয়ে। কাজেই বহু সুন্দরী থাকবে এবারের কাফেলায়। এমন পুরস্কার তোমরা আর কোথাও পাবে না।"

তরুণীটি তখন মুচকি হাসছিল। কিন্তু গযনীর কাফেলা থেকে তরুণীদের অপহরণের কথা শুনে তার চেহারা লাল হয়ে গেল।

হাম্মাদ এরপর বলতে শুরু করলো, কোথাও কোন মোক্ষম সুযোগে গযনীর কাফেলার উপর আক্রমণ করা হবে। হাম্মাদের পেছনেই দাঁড়ানো ছিল তার বডিগার্ড ইরতেগীন। মরুর এই মজলিসে কোন নিরাপত্তারক্ষীর দরকার ছিল না। কিন্তু হাম্মাদ এই মরুরাজ্যের রাজা। রাজার মর্যাদা বুঝানোর জন্যে তার পেছনে একজন নিরাপত্তারক্ষীকে দাঁড় করিয়ে রাখা হতো।

হাম্মাদ যখন বেদুঈন গোত্রপতিদের সাথে কথা বলছিল তখন তরুণী আড়চোখে কয়েকবার তাকিয়েছিল ইরতেগীনের প্রতি। ইরতেগীনের চেহারায় কোন প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়নি। কিন্তু যখন গযনীর কাফেলা থেকে তরুণীদের অপহরণের কথা বললো ডাকাত সর্দার হাম্মাদ, তখন তরুণী গভীরভাবে তাকালো ইরতেগীনের দিকে। তরুণী দেখলো, একথা শোনার পর ইরতেগীনের চেহারা পুরো বদলে গেছে। যেন তার কোন মারাত্মক ভুল হয়ে গেছে।

বেদুঈন গোত্রপতিরা মিলে গযনীর হজ্জ কাফেলা লুটে নেয়ার পরিকল্পনা চূড়ান্ত করলো এবং কিয়াদ নামক মরু অঞ্চলকেই তারা একাজের জন্যে উপযোগী বলে সাব্যস্ত করলো।

* * *

সেই রাতের ভিন্ন একটি পর্ব। হাম্মাদ বিন আলী গভীর ঘুমে অচেতন। তার পাশের তাঁবুতে সবিলা নামের হাম্মাদের এক রক্ষিতা শুয়ে ছিল। কিন্তু তার দু'চোখে ঘুম নেই। এই সবিলা জন্মসূত্রে গযনীর মেয়ে। সারা ডাকাতপল্লী যখন ঘুমের ঘোরে নীরব নিস্তব্ধ তখনো নিজের তাঁবুতে দুচোখের পাতা এক করতে পারছিলো না সবিলা। রাতের এই ডাকাতপল্লী যেন তখন মৃত নগরী। সবাই নির্বিঘ্নে অঘোর ঘুমে আচ্ছন্ন। ঘুমাবেই না কেন, এই ডাকাতদের দুনিয়ার কোন ভয় তো তাদের ছিল না। না! তাদের উপর চলতো কোন শাসকের শাসন। তাদের উপর কেউ রাতের বেলায় হানা দেবে এমন দুঃসাহস আরব কেন পৃথিবীর কোন জনগোষ্ঠীরও তখন ছিলো না। এমনই ভয়ঙ্কর হিংস্র ছিল এরা। তাদের এখানে রাতের বেলায় পাহারার কোন ব্যবস্থা ছিল না।

নির্ঘুম সবিলা বিছানা ছেড়ে উঠে তাঁবুর পর্দা সরিয়ে বাইরের দিকে তাকাল। বাইরে নিকষ কালো অন্ধকার। কিছুই দেখা গেলো না। জন মানুষের কোন সাড়া শব্দ নেই। কিছুক্ষণ বাইরের দিকে তাকিয়ে থেকে আবার এসে শুয়ে পড়লো সবিলা। কিছুক্ষণ পর আবার বিছানা ছেড়ে উঠলো সবিলা। এক অসহনীয় অস্থিরতা তার বুকে। কোন মতেই সেটা তাকে ঘুমাতে দিচ্ছিল না। আবার তাঁবুর পর্দা ফাঁক করে বাইরের দিকে তাকাল সে। বাইরের দিকে তাকাতেই আড়াআড়িভাবে থাকা দু'টি খেজুর গাছের ফাঁকে তার দৃষ্টি আটকে গেল। রাত অন্ধকার, কিন্তু তারা ভরা আকাশ। কিছুটা তারার আলো যেন অন্ধকার রাতের মধ্যে আলোর আভাস ছড়িয়েছে। সবিলা হঠাৎ দেখতে পেলো একটা ছায়া মূর্তি। তার দৃষ্টি একটি জোড়া খেজুর গাছের মধ্যে এসে স্থির হয়ে গেছে। সবিলার বুঝতে বাকি রইলো না এই তার কাঙ্ক্ষিত আগন্তুক। সে একটি পুরুষের আলখেল্লা গায়ে জড়িয়ে খুব সন্তর্পণে তাঁবুর বাইরে বের হয়ে খেজুর বৃক্ষের দিকে অগ্রসর হলো।

সবিলা অগ্রসর হলে আগন্তুক ছায়া মূর্তিটি খেজুর গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে ঘন খেজুরবীথির দিকে অগ্রসর হলো। কিছুক্ষণ পর ঘন খেজুরবীথির মধ্যে মিলিত হলো দু'জন। ছায়ামূর্তিটি আর কেউ নয় সবিলার অতি পরিচিত তার কথিত স্বামীর দেহরক্ষী ইরতেগীন।

রাতের বেলা যখন বেদুঈন গোত্রপতিদের মদের আসর শেষ হলো তখন সুযোগ বুঝে এক ফাঁকে সবিলা ইরতেগীনকে বলেছিল, "আজ রাতে তুমি পানির ধারের জোড়া খেজুর গাছটার কাছে এসো। তোমার সাথে আমার জরুরী কথা আছে।"

ইরতেগীন ও সবিলার মধ্যে গোপনে সাক্ষাতের মতো কোন সম্পর্ক ছিলো না। এমন সম্ভাবনাও ছিল না তাদের মধ্যে। সম্পর্ক বলতে শুধু এতটুকু তারা একজন অপরজনকে দেখলে মুচকি হাসতো। তাছাড়া এক সময় উভয়েই ছিল একই মালিকের মালিকানাধীন ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসী। এই লুটেরা জনগোষ্ঠীর সাথে তাদের কারো দূরতম কোন সম্পর্ক বা পরিচয় ছিল না। এরা দু'জনকে একই কাফেলা থেকে অপহরণ করে এনেছিল এই ডাকাত গোষ্ঠী।

সবিলা ছিল গযনী সেনাবাহিনীর উট ইউনিটের এক সৈনিকের মেয়ে। তার বাবা সেনাবাহিনীর শুধু একজন উট চালকই ছিলো না, সে ছিল সুলতান মাহমূদের একজন গুণমুগ্ধ সিপাহী। এই সৈনিক সুলতান মাহমূদের সাথে দুইবার হিন্দুস্তান অভিযানে গিয়েছিল। সে যেমন ছিল ধার্মিক তেমনই ছিল দেশ, জাতি ও ইসলামের জন্যে উৎসর্গিত প্রাণ। সন্তানদেরকে সে সব সময় বলতো, ইসলামই একমাত্র সত্য ধর্ম। ইসলামকে সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে দেয়া প্রতিটি মুসলমানের কর্তব্য। তার বাবা তাদেরকে সময়ে সময়ে যুদ্ধ ও জিহাদের নানা গল্প শোনাতো। ছোটবেলা থেকে শোনা এ গল্পের চেতনা সবিলার রক্তে মিশে গিয়েছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সবিলার তেরো বছর বয়সেই তার পিতৃবিয়োগ ঘটে। সেনাবাহিনীর উটের পরিচালক ইউনিটের সৈনিক সবিলার পিতা এক যুদ্ধে নিহত হয়। মৃত্যুর পর সবিলার মা তার স্বামীর জানা শোনা এক ব্যক্তির সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। সবিলার সৎ পিতার আগের সন্তান ছিলো। তাদেরকেই সে আদর স্নেহ করতো, সবিলা ও তার ছোট এতীম দুই ভাইয়ের ভাগ্যে আর তেমন আদর স্নেহ জুটেনি। তার মায়ের পক্ষেও তাদের প্রতি যথার্থ যত্ন নেয়ার অবকাশ ছিলো না। কারণ এই নতুন স্বামীর সাথে বিয়ে হওয়ার পর আবারো সবিলার মায়ের দুটি বাচ্চা হয়। এদের এবং সবিলার বৈপিত্রেয় সন্তানদের নিয়েই সবিলার মাকে ব্যস্ত থাকতে হতো।

সবিলার বয়স যখন ষোল সতেরো তখন তার সৎপিতা বয়স্ক এক লোকের সাথে তাকে বিয়ে দিয়ে দেয়। সবিলা ছাড়াও এ লোকের আরো দুজন স্ত্রী ছিল।

সবিলার এই স্বামী ছিল বিত্তবান সম্মানী লোক। সে অবাধে মদ্যপন করতো। ইরতেগীন ছিল সবিলার স্বামীর কেনা গোলাম।

সবিলাকে তার সৎ বাবা এই বয়স্ক লোকটির সাথে বিয়ে দিয়ে মোটা অঙ্কের পণ নিয়েছিলো। আসলে এটা বিয়ে ছিলো না ছিল এক প্রকার বিক্রি।

ইরতেগীন ছিল তুর্কি বংশজাত। শৈশব থেকেই গোলামীর শেকলে বাধা তার জীবন। যৌবনে পদার্পণ করার সাথে সাথে ইরতেগীনের দেহের অঙ্গ সৌষ্ঠব দৃশ্যমান হয়ে ওঠে। যৌবনের দীপ্তি ছড়িয়ে পড়ে তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গে। তার তখনকার মালিক ইরতেগীনের সুঠাম দেহসৌষ্ঠবে মুগ্ধ হয়ে তাকে অশ্বারোহণ, তীরন্দাজী ও তরবারী চালনা শিখিয়ে ইরতেগীনকে তার দেহরক্ষীতে রূপান্তরিত করে। সেই যুগে কারো সাথে একজন দেহরক্ষী রাখাটা বিরাট মর্যাদা ও সম্মানের বিষয় ছিল।

সেই মুনীবের মৃত্যুর পর তাকে আরেক ধনী ব্যক্তি কিনে নেয়। সেই লোক কয়েক বছর পর এক ব্যবসায়ীর মেয়েকে বিয়ে করে এবং মেয়ের বিনিময়ে ইরতেগীনকে ব্যবসায়ীর হাতে দিয়ে দেয়। শেষ পর্যন্ত এই লোকও ইরতেগীনকে বিক্রি করে দেয়। শেষ বার তাকে খরিদ করে সবিলার কথিত ধনী স্বামী। সবিলার স্বামীর একান্ত দেহরক্ষী ও সেবক হিসেবে যতটুকু সম্পর্ক থাকা স্বাভাবিক ইরতেগীনের সাথে সবিলার এতটুকুই পরিচয় ও সম্পর্ক ছিল।

প্রায় বছর খানে আগে সবিলার স্বামী সবিলাকে সহ একটি সফরে যাচ্ছিল। পথিমধ্যে গোটা কাফেলাকেই ডাকাতদল ঘিরে ফেলে। কাফেলার লোকেরা প্রথমে মোকাবেলা করলো বটে কিন্তু তারা কিছুক্ষণের মধ্যেই হাতিয়ার ফেলে দিতে বাধ্য হলো। কিন্তু এই দলের মধ্যে একমাত্র ইরতেগীন তখনো একাকী লড়ে যাচ্ছিল। সে তার ঘোড়াকে জায়গা বদল করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে মোকাবেলা করে যাচ্ছিল। ডাকাতদলের লোকেরা তাকে বশে আনতে পারছিল না। এই অবস্থা দেখে ডাকাত দলের সর্দার ঘোষণা করলো ওকে হত্যা না করে জীবিত পাকড়াও করে আনো।

কাফেলার লোকজন হতাশ হয়ে পড়েছিল। বহু ডাকাতের সাথে একা ইরতেগীন মোকাবেলা করছিল। শেষ পর্যন্ত ইরতেগীনকে কাবু করতে না পেরে ডাকাতেরা তার গোড়াকে আহত করে বেকার করে তাকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে

বন্দী করে ফেললো। ডাকাত দল কাফেলার সমস্ত মালপত্র কেড়ে নিল। সেই সাথে তারা হাতিয়ে নিলো অমূল্য দু'জন মানবসম্পদ। তন্মধ্যে একজন ইরতেগীন আর অপরজন সবিলা।

নিজের অস্বাভাবিক সৌন্দর্যই ছিল সবিলার জন্যে সবেচেয়ে বেশী দুর্ভাগ্যের কারণ। সে ছিল অবলা নারী। শত কান্নাকাটি করেও মুক্তি পেলো না। ডাকাতরা তাকে নিয়ে গেলো। আর ইরতেগীনকে হাতে পায়ে রশি দিয়ে বেধে ঘোড়ার পিঠে ফেলে দিল। তবুও সে বারবার ডাকাতদের হুকমি দিচ্ছিল, "তোমরা কাপুরুষের মতো আমাকে এভাবে না বেধে দু'জন দু'জন করে আমার মোকাবেলায় এসো। যদি আমি টিকতে না পারি তবে নিয়ে যেয়ো।" কিন্তু ডাকাতরা সর্দারের কথায় ইরতেগীনকে মোকাবেলার সুযোগ না দিয়ে কয়েকজন মিলে ঝাপটে ধরে তাকে বেধে ফেলতে সক্ষম হলো। ফলে ইরতেগীনের আর করার কিছুই রইলো না।

কয়েক দিনের সফরের পর ইরতেগীন ও সবিলাকে হাম্মাদ বিন আলীর সামনে পেশ করা হলো। এই ডাকাত দলটি ছিল হাম্মাদের নিয়ন্ত্রিত। সবিলা তো কোন কথাই বলতে পারছিল না। কিন্তু ইরতেগীন হাম্মাদকেও হুমকি দিচ্ছিল।

কিন্তু হাম্মাদ ছিল কথার যাদুকর। নানা কথায় অল্প সময়ের মধ্যেই সে ইরতেগীনের ক্ষোভকে প্রশমিত করে তাকে শান্ত করে ফেলল। স্বাভাবিক হলে নানা কথাবার্তায় ও নিজের পরিচয় দিয়ে ইরতেগীন যখন জানাল সে ছিল গোলাম। এ পর্যন্ত সে তিন মুনীবের হাত বদল হয়েছে। এ কথা শুনে হাম্মাদ তাকে সস্নেহে কাছে বসালো এবং বললো-

"আজ থেকে তুমি কারো গোলাম নও। এখানে তুমি বাদশা। তুমি একজন সুলতান। তোমার উপর কেউ খবরদারি করবে না। আমি আমার লোকদের কাছে শুনেছি সবাই মিলেও নাকি তোমাকে বশে আনতে তাদের ঘাম ঝরাতে হয়েছে। তখনই আমি তোমাকে আমার একান্ত দেহরক্ষী হিসেবে রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমি ছাড়া তোমার মর্যাদা আর কেউ দিতে পারবে না।"

"তুমি কি আমাকে তোমার মতোই ডাকাত বানাতে চাও?" ক্ষুব্ধ কণ্ঠে জানতে চাইলো ইরতেগীন।

"তুমি কি গোলাম থাকাই পছন্দ করো? স্বাধীন জীবনের স্বাদ নেয়ার ইচ্ছা কি তোমার কাছে পছন্দ নয়?" উল্টো প্রশ্ন করলো হাম্মাদ।

অনেক কথার পর হাম্মাদ শেষ পর্যন্ত ইরতেগীনকে সম্মত করালো সে হাম্মাদের একান্ত দেহরক্ষী হয়ে তার সাথে স্বাধীন ভাবে থাকবে।

হাম্মাদ যখন জানতে পারলো, ইরতেগীন ছিল সবিলার স্বামীর দেহরক্ষী যে মেয়েকে তার দল অপহরণ করেছে। তখন সে সবিলাকে বললো–

"তুমি যদি আমার কাছে রাণীর মর্যাদায় থাকতে চাও, তবে তোমার স্বামীর দেহরক্ষীকে আমার সাথে থাকতে রাজী করাও: নয়তো তোমাদের উভয়ের পরিণাম খুব খারাপ হবে।"

"একথা শুনে সবিলা ইরতেগীনকে আলাদা জায়গায় নিয়ে বললো– "আমার দিকে তাকিয়ে তুমি এদের সাথেই থাক। সবিলা তাকে আরো জানালো, হাম্মাদ এ প্রশ্নে তাকে কি হুমকি দিয়েছে। ইরতেগীন হাম্মাদের যাদুকরী কথায় মুগ্ধ হয়েই তার সাথে থাকতে সম্মত হয়েছিল। সবিলার করুণ মিনতি ও তার চোখের অশ্রু ইরতেগীনকে হাম্মাদের সাথে থাকতে বাধ্য করলো। তার এ ইচ্ছা আরো দৃঢ় হলো।

হাম্মাদ পরদিনই ইরতেগীনকে একটি তাজী ঘোড়া উপহার দিল এবং সবিলাকে রক্ষিতা হিসেবে নিজের কাছে রাখল। আর ইরতেগীনকে বললো, তোমার ডাকাতি করতে হবে না। তুমি সব সময় আমার সাথে আমার একান্ত প্রহরী হিসেবে থাকবে।

কিছু দিনের মধ্যেই এরা ডাকাত দলের রীতিনীতির সাথে মিশে গেল। ইরতেগীন যেহেতু হাম্মাদের একান্ত দেহরক্ষী ছিল এজন্য তাকে ডাকাতিতে শরীক হতে হতো না।

সে সময়কার অধিকাংশ আরব বেদুঈন জনগোষ্ঠী ছিল হিংস্র ও লড়াকু। এরা নিজ গোত্রের গোত্রপতিকে ছাড়া পৃথিবীর আর কারো কোন হুকুমের পরওয়া করতো না। কিন্তু হাম্মাদ বিন আলীকে সব বেদুঈনই মানতো এবং সম্মান করতো। এরা তাকে মুকুটহীন বাদশা মনে করতো। কারণ তৎকালীন খলীফা এবং খলীফার যেসব কর্মকর্তা হাম্মাদকে গ্রেফতার করে এই দুর্ধর্ষ ডাকাত দলকে নির্মূল করে দিতে পারতো, হাম্মাদ তাদের সবাইকে এবং বিশেষ

করে খলীফাকে তার একান্ত শুভাকাঙ্ক্ষী বানিয়ে নিয়েছিলো। ফলে নির্বিঘ্নে এসব ডাকাত বেদুঈন গোষ্ঠী রাহাজনীও লুটতরাজে লিপ্ত থাকতে পেরেছিল। খলীফার কাছে হাম্মাদকে উপস্থাপন করা হয়েছিল একজন খ্যাতিমান বেদুঈন ব্যবসায়ী হিসেবে। আরো বলা হয়েছিল, হাম্মাদ সকল বেদুঈন জনগোষ্ঠীকে তার অনুগত বানিয়ে ফেলেছে, যেসব লোক বাগদাদের খেলাফতের শাসনকেও স্বীকার করতে নারাজ।

এভাবেই যেতে লাগল সবিলার দিন। সবিলাকে এক অর্থে হাম্মাদ রাজরাণী বানিয়ে দিল। আর ইরতেগীনকেও যথার্থ অর্থেই স্বাধীনতার স্বাদ অনুভব করার সুযোগ দিল। দিনে দিনে তারা উভয়েই সন্ত্রাসী ও বেদুঈন জীবনে অভ্যস্ত হয়ে উঠল। সবিলা ও ইরতেগীনের মধ্যে প্রতিদিনই দেখা হতো। তাদের মধ্যে সম্পর্কের বড় উপাদান ছিল তারা উভয়েই অপহৃত হয়ে বেদুঈন সর্দারের হাতে নীত হয়েছিল। পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে তারা উভয়েই ভাগ্যকে মেনে নিয়েছিল।

রাতের অন্ধকারে অতি সন্তর্পণে সাবিলা ইরতেগীনের সাথে সাক্ষাত করতে এলো। তাদের মধ্যে এটাই ছিল প্রথম সাক্ষাত। গোপন সাক্ষাতের প্রস্তাবে ভাবনায় পড়ে গেলো ইরতেগীন। সাবিলা তাকে কেন রাতের বেলায় একান্তে সাক্ষাত করতে বললো? সে কি তার মুনিবের সাথে বেঈমানী করতে চায়? সে কি কোন অভিসারের জন্যে ইরতেগীনকে সম্মত করাতে চায়?

এদিক সেদিক সতর্ক চোখ রেখে একটি খেজুর ঝোপের মধ্যে গিয়ে সাবিলাকে একটু শক্ত গলায় জিজ্ঞেস করলো ইরতেগীন।

কী ব্যাপার সাবিলা? এমন কি জরুরি কথা আছে, যেটা তুমি দিনের বেলায় তোমার তাঁবুতে ডেকে বলতে পারলে না, রাতের বেলায় এখানে নিয়ে এসেছো সে কথা বলতে?

দেখো ইরতেগীন! আমি তোমাকে আমার মৃত স্বামীর গোলাম মনে করে সেই সম্পর্কের সূত্র ধরে এখানে ডাকিনি। তুমি নিজেকে আমার গোলাম মনে করো না এবং হাম্মাদ বিন আলীরও গোলাম মনে করো না। বললো সাবিলা।

আমি তোমার ভিতরের গোলামীর জিঞ্জির ছিড়ে এক স্বাধীন সক্ষম পুরুষকে জাগাতে এসেছি। আমি তোমার মধ্যে এমন মানুষকে জাগাতে এসেছি যে মানুষ কারো গোলামী করে না, যে শুধু আল্লাহর গোলামী করে। যে মানুষ নিজের দেশ ও ধর্মের জন্য জীবন বিলিয়ে দেয়।

এসব কি বলছো সাবিলা? ম্লান হেসে ইরতেগীন বললো– মনে হচ্ছে তুমি স্বপ্ন দেখছো, ঘুমের ঘোরে কথা বলছো।

না না, আমি কোন স্বপ্ন দেখছি না ইরতেগীন! আমি ঘুমের ঘোরেও কথা বলছি না। আমি একথাই তোমাকে বলতে এসেছি, আমি জেগে উঠেছি। আমি এখন ডাকাত সর্দারের রক্ষিতা নই। আমি এখন গযনীর সেই

শহীদ সৈনিকের মেয়ে সাবিলা। যার পিতা জিহাদে শাহাদত বরণ করেছে। কিন্তু এতোদিন সেই সাবিলা মরে গিয়েছিল। কারণ, আমার বাবার শাহাদতের পর আমার মা যখন এক ব্যবসায়ীকে বিয়ে করেছিল। সেই অর্থলোভী লোকটি আমার যৌবনের শুরুতেই টাকার লোভে তোমার মালিকের কাছে বিয়ের নামে আমাকে বিক্রি করে দিয়েছিল। তোমার মুনীবের কাছে বিক্রি হওয়াটাকে জীবনের নিয়তি ভেবে আমি আমার আশৈশব লালিত নারীর সত্তাকে গলাটিপে মেরে ফেলেছিলাম।

অবলা নারী আর গোলামের বিধিলিপি এমনই হয়ে থাকে। বললো ইরতেগীন।

তুমি যেমন তোমার দুর্ভাগ্য দেখেছো। আমিও আমার ভাগ্যের নির্মম পরিণতি সহ্য করেছি। কিন্তু এ নিয়ে আমার কোন দুঃখ নেই। কারণ, গোলাম হিসেবেই আমার জন্ম হয়েছিল। বেদুঈন গোত্রের সাথে এখানে ওখানে যাযাবর অবস্থাই আমি বড় হয়েছি আর এক হাত থেকে অন্যের হাতে বিক্রি হয়েছি।

অবশ্য আমি একবার শুনেছিলাম, ইসলাম কোন মানুষকে গোলাম বানিয়ে রাখার অনুমতি দেয় না। একথা শুনে আমি হেসে ছিলাম। কারণ, মুসলমান আমীর উমারারাই তো মানুষকে গোলাম বানিয়ে রাখে।

এরা ভোগবিলাসে মত্ত অবাধ্য মুসলমান। বললো সাবিলা। ইসলামের দৃষ্টিতে কাউকে গোলাম বানিয়ে রাখা মস্তবড় অপরাধ। তোমার মুনিবের সাথে আমার বিয়েটাও ছিল এমনই একটা অপরাধ। প্রকৃত পক্ষে এটা বিয়ে ছিলো না। রীতিমতো একটা লেনদেন। পয়সার বিনিময়ে সৎপিতা নামের ওই অসৎ লোকটা আমাকে বিক্রি করে দিয়েছিল। প্রথমে এটা আমি কিছুতেই মেনে নিতে পারছিলাম না। সব সময় আমার মন উদাস থাকতো। কিন্তু একপর্যায়ে নারীর ভাগ্য এমনই হয় ভেবে সব মেনে নিলাম। নিজেকে ধীরে ধীরে স্বাভাবিক করে নিলাম। সয়ে নিলাম সবকিছু। নিজের সুখ স্বপ্ন সোহাগ আহ্লাদকে নিজ হাতে দাফন করে হাসি খুশী থাকতে এবং যা ভাগ্যে জুটেছে তাই নিয়ে সুখী হতে চেষ্টা করলাম। তখন হয়তো কখনো আমাকে হাসতে দেখেছো তুমি। কিন্তু এটা আমার স্বতস্ফূর্ত হাসি ছিলো না। এটা

ছিলো দামী অলঙ্কার ও দামী কাপড়ে মোড়ানো কৃত্রিম হাসি। আমার এই বিক্রি হওয়ার মূলে ছিল আমার যৌবন আর রূপ। সেই বণিক টাকা দিয়ে আমার শরীরটা কিনে নিয়েছিল। কিন্তু আমার শরীরটা দামী কাপড় ও অলঙ্কারে মোড়ানো থাকলেও অন্তরটা দিন রাত গুমড়ে কাঁদতো।

ঠিক বলেছো। তোমার মতো মেয়ের বিয়ে তোমার মতোই কোনো সুন্দর যুবকের সঙ্গে হওয়া উচিত ছিলো। বললো ইরতেগীন।

এখন আমি আমার এই মন্দ নিয়তি আর অসম বিয়ের কান্না কাঁদছি না ইরতেগীন! আমার বাবা বেঁচে থাকাবস্থায় কখনো আমি বিয়ে করবো এমনটি চিন্তাও করিনি। কারণ বাবা আমার মনে একটাই চিন্তা ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন, আমি একজন মুসলমান। আমাকে জীবন ও সম্পদের লোভ ত্যাগ করে কুফর খতম করতে হবে। কখনো কখনো আমার মনে হতো, হিন্দুস্তানের মূর্তিগুলো যেন আমাকে হুমকি দিচ্ছে। কারণ, আমার বাবা দু'বার হিন্দুস্তান গিয়েছিলেন। তিনি হিন্দুস্তানের বহু মন্দিরের ধ্বংসযজ্ঞ নিজ চোখে প্রত্যক্ষ করেছেন। তিনি বিজিত মন্দিরে মুসলমানদের আযানও শুনেছেন। আমার বাবা সেই সব মুজাহিদদের একজন যাদের জীবন রণাঙ্গণেই বেশি কেটেছে। সেই বাবার রক্ত আমার দেহে প্রবাহিত ইরতেগীন!

সাবিলা! তুমি কি ভুলে গেছো আমরা কোথায় বসে এসব কথা বলছি? কেউ যদি দেখে ফেলে আর হাম্মাদকে জানিয়ে দেয় তবে হাম্মাদ আমাদেরকে হাত-পা বেধে মরুভূমিতে ফেলে রাখবে। মরুভূমির মৃত্যুর কষ্ট যে কী তা তুমি কল্পনাও করতে পারবে না সাবিলা!

আমাকে আগে এ কথাটি বলো, আজ রাতে তোমার এই অতীতের কাহিনী আমাকে কেন শোনাচ্ছো? তুমি যদি নিজের স্বাধীন সত্তাকে মেরেই ফেলে থাকো তবে আবার জাগিয়ে তুলছো কেন? যে শিকল এখন তোমার গলায় লেগেছে, তা আর ছেড়া সম্ভব নয়। আমি তো দেখছি তুমি বেশ সুখেই আছো?

হ্যাঁ, ইরতেগীন! এখানে আমি বেশ সুখেই ছিলাম। আমি যদি শুধু হাড়মাংসের অনুভূতিহীন পুতুল হতাম তাহলে এ নিয়ে আমার সুখী না

থাকার কোন কারণ থাকতো না। কিন্তু আজ রাতে আমার পুতুল সর্বস্ব জীবন চাপা পড়ে আমার ভেতরে আবার সেই কৈশোরের স্বাধীনসত্তা জেগে উঠেছে। এক ডাকাত সর্দারের রক্ষিতার স্থলে আগের সেই বীর মুজাহিদ কন্যার সত্তা ফিরে এসেছে। যার কারণে আমি তোমাকেও জাগাতে এসেছি, কারণ তোমার সাহায্য ছাড়া আমার আর কোন উপায় নেই।

আমি কি তোমাকে এখান থেকে নিয়ে পালিয়ে যাবো? জানতে চাইলো ইরতেগীন। এটা কিন্তু সহজ ব্যাপার নয়!

না, পালানোর ব্যাপার নয়। আমি এখান থেকে পালাতে চাই না। কিন্তু তোমাকে পালাতে হবে...।

শোন ইরতেগীন! তুমি যখন আমার স্বামীর গোলাম ছিলে, তুমি জানো তখন তোমার সাথে আমার কি সম্পর্ক ছিলো? তোমার হয়তো মনে আছে, একবার আমার স্বামী তোমাকে কোথাও পাঠাতে চাচ্ছিল, তখন তুমি ছিলে খুবই অসুস্থ। কিন্তু আমার স্বামী বলছিল পথের মধ্যে তুমি মারা গেলেও তোমাকে যেতে হবে। তখন আমি তোমাকে এই দুর্দশা থেকে রক্ষা করেছিলাম।

এজন্য আমার স্বামীর সাথে আমাকে লড়াই করতে হয়েছিল। আমি তাকে বলেছিলাম, যে লোকটি অসুখের কারণে উঠে দাঁড়াতে পারে না, তাকে তুমি কিভাবে এমন কষ্টকর দীর্ঘ সফরে পাঠাচ্ছো? সেদিন আমি তোমাকে পাঠাতে বাঁধা দিয়ে বাড়িতে রেখে ডাক্তার ডেকে তোমার চিকিৎসা করিয়েছিলাম। তুমি জানো না, তোমার প্রতি এই মানবিক মমতা দেখানোর কারণে আমার স্বামীর কাছে আমাকে কতো কটু কথা শুনতে হয়েছে।

সবই আমার মনে আছে সাবিলা! মুনিব এজন্য আমাকেও অনেক গালমন্দ করেছিল। সে তো আমাকে এতটুকু পর্যন্ত বলেছিল, তোর আর সাবিলার মধ্যে এমন মাখামাখি যেন আর কখনো দেখা না যায়। যদি দ্বিতীয়বার এমনটি ঘটে তবে তুই ভালো করেই জানিস গোলামের শাস্তি ও পরিণতি কি ভয়ঙ্কর হয়ে থাকে...।

ওই সময়ের চেয়ে এই ডাকাতদের সাথে আমি বেশ ভালো আছি সাবিলা! এখানে আর কিছু না পাই, অন্ততঃ আমাকে কেউ গোলাম বলে তাচ্ছিল্য করে না।

তবে তুমি যদি ভীষণ কোন কষ্টে থেকে থাকো, তোমার উপকারের প্রতিদান দিতে আমি জীবন দিতেও কুণ্ঠাবোধ করবো না সাবিলা!

এরপর দীর্ঘ সময় ইরতেগীনের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে রইলো সাবিলা। গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে ইরতেগীনের মনোভাব বোঝার চেষ্টা করছিল সে। মরুভূমির সেই রাতটি ছিল নীরব নিস্তব্ধ। মনে হচ্ছিল তাঁবুর পল্লী যেন প্রাণহীন মূর্তির পল্লী। সেই রাতে মরুর শিয়ালগুলোও যেন ডাকতে ভুলে গিয়েছিল, ঘুমিয়ে পড়েছিল শিয়ালের পাল। কিন্তু সাবিলার বুকের মধ্যে বারবার জেগে উঠছিল কৈশোরের ঈমানের স্ফূলিঙ্গ।

কী ব্যাপার! নীরব হয়ে গেলে কেন সাবিলা? বলো কি বলতে চাও। এই গোলামকে একবার পরীক্ষা করে দেখো। বললো ইরতেগীন।

ভাবছি, তুমি আমার কথার আসল অর্থ বুঝবে কি না। দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললো সাবিলা। যাক, তবুও বলছি। শোন...। আমি নিজের জন্যে তোমার কাছে কিছুই চাই না। তোমার কাছে কোন প্রতিদানও প্রত্যাশা করি না। তুমি কি হাম্মাদ বিন আলীর কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনেছিলে, যে কথাগুলো সে বেদুঈন সর্দারদের বলছিলো? সে গযনীর হজ্জ কাফেলা লুটে নিতে চায়।

তুমি কি তা রুখতে পারবে? বিস্মিত কণ্ঠে বললো ইরতেগীন। এখনো কি মন থেকে গযনীর মায়া দূর করতে পারোনি?

গযনীর স্মৃতি আমি মন থেকে বিদায় করে দিয়েছিলাম। কিন্তু গযনীর সম্ভ্রম আমি মন থেকে মুছে ফেলতে পারিনি। হাম্মাদ গযনীর হজ্জ কাফেলা লুটে নেয়ার কথা বলছিল, তাতে আমার মনে কোন আঘাত লাগেনি। কিন্তু সে যখন আমার মাথায় হাত রেখে বললো–

এ হলো গযনীর সুন্দরী মেয়েদের নমুনা। ঐ কাফেলা লুটতে পারলে একে তোমরা পাবে। আর এর মতো অনেক সুন্দরী সেই কাফেলায় থাকবে, যেগুলো তোমাদেরকে উপহার স্বরূপ দেয়া হবে; তখন আমার শরীর কেঁপে উঠলো। যেন প্রচণ্ড হিম শীতল কোন বাতাস আমার শরীরের শিরায় শিরায় ঢুকে গেছে। কিংবা হঠাৎ জমিন কেঁপে উঠেছে।

তখন আমার মুজাহিদ বাবার চেহারা আমার চোখের সামনে ভেসে উঠলো। তার সেইসব কথা আমার কানে বাজতে লাগলো, যেসব কথা তিনি

আমাকে বারবার বলেছেন। কিন্তু আমি অবলা নারী। আমি অসহায়। তবুও হাম্মাদের কথার তীরে আমার হৃদয়ে রক্তক্ষরণ ঘটছে। অসহায়ের মতো আমি শুধুই ফ্যাল ফ্যাল করে তার দিকে তাকিয়ে থেকেছি। কিছুই করার ছিল না আমার।

ও আচ্ছা! তার কথায় ক্ষেপে গিয়েই হয়তো তখন তুমি আমার দিকে তাকিয়ে ছিলে?

হ্যাঁ, এজন্যই তোমার দিকে তাকিয়েছিলাম। কারণ, আমার বুকে তখন প্রতিশোধের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ জ্বলে উঠেছিল। আর তখন আল্লাহ ছাড়া আমার পাশে কেউ ছিল না। কিন্তু তোমার চেহারা দেখে বুঝা যাচ্ছিল, হাম্মাদের কথায় তোমার মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়াই হয়নি। তখনই আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, একান্তে তোমাকে ডাকবো এবং তোমার মধ্যেও গযনীর সম্ভ্রম ও মর্যাদার আগুন জ্বেলে দেবো, যে গযনী তোমার মতো বীর যুবককে জন্ম দিয়েছে।...

আমি এটাও ভেবেছি, আমি নিতান্তই এক অসহায় মেয়ে। ডাকাতদের এই পল্লীতে ডাকাত সর্দারের আমি কিছুই বিগড়াতে পারবো না। একথা ভেবে আমি যন্ত্রণাটা সামলে নেয়ার চেষ্টা করেছি। কিন্তু হাম্মাদ তাঁবুতে গিয়েই আমার দিকে চরম আসক্তি নিয়ে তার নোংরা হাত বাড়ালো এবং আমাকে কাছে টেনে নিল। আমি যখন তার শরীরের উষ্ণতা অনুভব করলাম, তখন আমার মধ্যে আবার সেই আগুন জ্বলে উঠলো।

ইরতেগীন এতোটাই নীরব ছিলো যেন সে কোন কিছুই শুনছিলো না। তাই তাকে পরখ করার জন্যে সাবিলা জিজ্ঞেস করলো– আমার কথা শুনতে পাচ্ছো ইরতেগীন?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনোযোগ দিয়েই তোমার কথা শুনছি সাবিলা! বুঝতে পারছি তোমার প্রতিশোধের আগুন এখন অনিয়ন্ত্রিত এবং তোমাকে সেটা ক্রমেই অস্থির করে তুলেছে।

শোন ইরতেগীন! হাম্মাদ আমাকে আজ রাতেই বলেছে– সাবিলা! শুনেছি গযনীর সুলতান মাহমূদ নাকি নিজেকে মূর্তিবিনাশী বলে বড়াই করে। এই বলে সে একটা অট্টহাসি দিয়ে বললো, আসলে সে একটা লুটেরা।

আমার মতো সেও একটা ডাকাত। দেখবে একদিন আমি সেই মূর্তি বিনাশীর মূর্তিই ভেঙে দেবো।

একথা শোনার পর আর আমি স্বাভাবিক থাকতে পারলাম না। সে যখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লো, তখন আমি তার খঞ্জরটি হাতে তুলে নিলাম। তখন আমার হাত কাঁপছিল। বাইরের মশালের আলোয় আমি তার বুক ঠিকই চিহ্নিত করতে পেরেছিলাম। আমি চাচ্ছিলাম একই আঘাতে তাকে দুনিয়া থেকে বিদায় করে দিতে। কিন্তু আমার অজান্তেই আমার হাত স্থির হয়ে গেল। আমার মনের মধ্যে হঠাৎ একথা উঁকি দিলো, এতো আমি গযনীর বাদশা আর গযনীর অমর্যাদার প্রতিশোধ নিচ্ছি। এই ভাবনার সাথে সাথেই কোন অদৃশ্য শক্তি যেনো আমার হাত ধরে থামিয়ে দিল।...

আমার কানে যেনো ধ্বনিত হলো−

একা এই লোকটিকে হত্যা করে তুমি নিজে যেমন বাঁচতে পারবে না, গযনীর বহু নিস্পাপ তরুণীর সম্ভ্রমও বাঁচাতে পারবে না। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে এই হিংস্র জীবগুলো তাদের নেতা হত্যার জন্যে তোমার ওপর কি নির্মম প্রতিশোধ নেবে, এটা একটু চিন্তা কর, ভেবে দেখো।

তখন আমি আমার হাত গুটিয়ে নিলাম। এরপর আমি গভীরভাবে চিন্তা করলাম, নানাভাবে বিষয়টাকে বোঝার চেষ্টা করলাম। বুঝতে পারলাম, আমি কোন অন্যায় কাজ করছি না। এজন্যই হয়তো আমার বিবেক আমাকে সঠিক সময়ে সঠিক দিশা দিচ্ছে। হয়তো বা তাতে মহান প্রভুর ইঙ্গিত আছে। তখন হঠাৎ আমার মনে পড়লো, আরে, আমি তো তোমাকে আসতে বলে রেখেছিলাম। তখনই ভেবে রেখেছিলাম, এ ব্যাপারে তোমার সাথে আলাপ করে কিছু একটা করবো।...

ইরতেগীন! গযনীর আর কোন মেয়েকে যেন ডাকাতদের রক্ষিতা হতে না হয়, সে চেষ্টাটা তো আমরা করে দেখতে পারি। সুলতান মাহমূদ কোন ডাকাত কিংবা লুটেরা নন। আমি হজ্জ কাফেলার সাথে আসা মেয়েদের ইজ্জত বাঁচিয়ে নিজের কাফফারা আদায় করতে চাই।

তুমি কি আমাকে দিয়ে হাম্মাদ বিন আলীকে হত্যা করাতে চাও?

না, জবাব দিল সাবিলা। এই একজনকে হত্যা করে তেমন কিছু অর্জিত হবে না। হাম্মাদ মারা গেলেও এই ডাকাতেরা গযনীর হজ্জ কাফেলা লুট করবে।

আমি চিন্তা করেছি, যে করেই হোক তুমি এখান থেকে চলে যাবে। আমি এখানেই থাকবো। আমিও যদি তোমার সাথে চলে চাই, তাহলে এরা আমাদের পিছু ধাওয়া করবে। তুমি পুরুষ। দ্রুত ঘোড়া চালাতে পারবে, সফরের কষ্টও ক্লান্তি সহ্য করতে পারবে। আমি হয়তো ততোটা পারবো না। তখন আমি হয়ে যাবো তোমার জন্যে একটা বোঝা। পালানোর গতি যদি শ্লথ হয়ে যায় তাহলে আমরা উভয়েই ধরা পড়বো।

আমি একা পালালেও এরা পিছু ধাওয়া করতে পারে। বললো ইরতেগীন। কারণ, আমি একাকী চলে গেলেও তাদের এই আশঙ্কা হবে যে, আমি গযনী গিয়ে সুলতান মাহমূদকে কাফেলা লুটের খবর দিয়ে দেবো। তখন হয়তো তিনি কাফেলার সাথে সেনাবাহিনীর দু'একটি ইউনিট পাঠিয়ে দেবেন।

এই আশঙ্কা হয়তো আছে। তবুও তোমাকে যেতে হবে। বললো সাবিলা। ঝুঁকি তো আমাদের নিতেই হবে।...

তুমি যে ভয় পাচ্ছ তা সঠিক। চিন্তা করো, তোমার কোন মেয়ে নেই, তোমার কোন বোন নেই। আজ যদি আমি তোমার বোন হতাম তাহলে আমার জন্যে তো তুমি জীবন দিয়ে দিতে।

ইরতেগীন! গযনীর প্রতিটি মেয়েই তোমার বোন, তোমার মা। আমি জানি গযনীর মাটি তোমাকে কিছুই দেয়নি। সেখানে তোমাকে গোলাম মনে করা হতো। আমি বুঝি যে দেশের শাসক তার প্রজাদের ভুখা নাঙা রাখে এবং আল্লাহর দেয়া অধিকার থেকে মানুষকে বঞ্চিত রাখে, সে দেশের মানুষের মন থেকে দেশের প্রেম ও ধর্মের ভালোবাসা নষ্ট হয়ে যায়। সেখানে ভাই ভাইয়ের শত্রুতে পরিণত হয়।...

আমি দৃঢ়তার সাথে বলতে পারি, তুমি যদি সুলতান মাহমূদ পর্যন্ত পৌঁছতে পারো, আর তাঁর কাছে বলো যে, আমি গোলাম ছিলাম, তাহলে তিনি তোমাকে বুকে জড়িয়ে নেবেন। এরপর আর তোমাকে গোলাম থাকতে হবে না। তুমি সুলতানের কাছে এবং আল্লাহর কাছে সম্মানিত মানুষ বিবেচিত হবে।

নিজের মধ্যে আত্মমর্যাদাবোধ জাগিয়ে তুলো ইরতেগীন! নিজ দেশ ও ধর্মের মেয়েরা সেই দেশের সম্ভ্রম। সেই জাতি ধ্বংস ও বেইজ্জতির শিকার হয় যারা তাদের মেয়েদের ইজ্জতের মর্যাদা দেয় না।

আমি তোমার একটা কথা বুঝতে পারছি না। ইরতেগীন বললো। আমার মধ্যে তো এর আগে কেউ দেশ প্রেম জাগিয়ে তুলেনি। আমার এসবের কি প্রয়োজন? আমি তো শ্রমের বিনিময়ে এই লুটেরাদের কাছে থেকেও ভালো বোধ করছি। এখন তুমি যা বলছো, তা করতে আমি অস্বীকারও করছি না। কারণ তুমি মজলুম হওয়ার পর এখনও তোমার ঈমান মজবুত রয়েছে। আমি আগেই বলেছি, তোমার উপকারের প্রতিদান আমি অবশ্যই দেবো। এখন বলো, আমাকে কি করতে হবে?

এখান থেকে এভাবে তুমি পালিয়ে যাবে, যাতে কেউ টেরই না পায়। গযনীর পথ তো তুমি চেনো। আশা করি পনেরো বিশ দিনের মধ্যে তুমি গযনী পৌছে যেতে পারবে।

তুমি পৌছার আগেই যদি গযনীর হজ্জ কাফেলা রওয়ানা হয়ে যায় তবে তাদের ফেরাবে এবং কাফেলার দায়িত্বশীলদেরকে যথা সম্ভব বোঝাতে চেষ্টা করবে সামনে তাদের কি বিপদ অপেক্ষা করছে।

তাদেরকে বলবে, তুমি সুলতানের কাছে যাচ্ছো। তুমি গিয়ে যদি কাফেলাকে গযনীতেই পাও, তাহলে সরাসরি সুলতান মাহমূদের কাছে চলে যাবে।

সুলতানকে বলবে, এই হজ্জ কাফেলার ওপর পাঁচ হাজার বেদুঈন ডাকাত হামলা করবে। সুলতানকে বলবে, গযনীর এক মজলুম কন্যা এ খবর দিয়ে পাঠিয়েছে যে, হজ্জ কাফেলাকে বাঁধা দেয়া সম্ভব নয়, কিন্তু ডাকাতদের গতিরোধ করা সম্ভব। এই কাফেলার সাথে যথেষ্ঠ পরিমাণ সেনা সদস্য না পাঠালে বাবেল ও বাগদাদের বাজারে গযনীর কন্যা জায়ারা বাদী হিসেবে বিক্রি হবে। সুলতানকে বলবে, হজ্জ কাফেলা থেকে যদি একটি মেয়েও অপহৃত হয় তাহলে আল্লাহ্ সুলতানকে ক্ষমা করবেন না।

ঠিক আছে, আমি সব বলবো সুলতানকে। বললো ইরতেগীন। তুমি দুআ করো আমি যেন জীবিতাবস্থায় সেখানে পৌছতে পারি। কিন্তু তুমি কি এখান থেকে বের হবে না? এই জংলীগুলোর কাছে তোমাকে ফেলে রেখে আমি কি করে চলে যাবো?

তুমি চলে যাও, যাও ইরতেগীন! যদি জীবিত থাকি তাহলে এই দেহ ও শরীর নয় আমার হৃদয় ও আত্মার অধিকারী হবে তুমি। তখন তুমি না, আমি

হবো তোমার বাঁদী। আশা করি তুমি গযনী পৌছে যাবে। কারণ, তুমি কোন অপরাধ করছো না, আল্লাহ্ তোমাকে সাহায্য করবেন।

তুমি কি এই জংলীগুলোকে কোনভাবে আমার পিছু ধাওয়া করা থেকে বিরত রাখতে পারবে?

সাধ্যমতো চেষ্টা করবো। এখন এদের কাছ থেকে আমি অনেক কিছু শিখে নিয়েছি। তোমার আগের মুনিবের কথা মনে আছে না? সে ছিল আমার স্বামী। তার অন্য স্ত্রীদেরকেও তুমি চিনতে ও জানতে। তুমি এটাও জানতে রাজপ্রাসাদের মতো সেই হাবেলীতে কি ভয়ানক চক্রান্ত হতো।

আসলে যেখানে সম্পদ ও নারী থাকে, সেখান থেকে সততা, ভদ্রতা আর শালীনতা দূর হয়ে যায়। আমি এই শয়তান জগতের একটি অংশ হয়ে গেছি। ফলে অনেক শয়তানীও আমি শিখে ফেলেছি।

গোগীল নামের এক গোত্রপতিকে তুমি চেনো। এই গোগীলই বলেছে, ডাকাতিতে সে এক হাজার লোক নিয়ে আসবে। এই লোকটিকে আমি ঘৃণা করি। এই লোকটি আমাকে প্রস্তাব করেছিল, হাম্মাদের সঙ্গ ত্যাগ করে আমি যেন তার সাথে চলে যাই। আমি তার প্রস্তাবের জবাবে বলেছিলাম–

আমি হাম্মাদের স্ত্রী নই বটে, তবে হাম্মাদকে আমি ধোঁকা দিতে পারবো না। সে প্রথমে আমাকে লোভ দেখায় এবং পরে হুমকিও দিয়েছিল। তার প্রস্তাবে রাজী না হলে আমাকে সে অপহরণ করবে। সে এও বলেছিলো, আমি যদি হাম্মাদকে একথা বলে দেই তাহলে সে আমাকে খুন করিয়ে ফেলবে।

এখন আমি এর প্রতিশোধ নেবো এবং এদের মধ্যে একটা গণ্ডগোল বাঁধানোর চেষ্টা করবো।

এখানকার কথা থাক ইরতেগীন! তুমি এখান থেকে কবে যাচ্ছো?

এখনই যাবো। এ ব্যাপারে তুমি আমাকে আর কোন কথা জিজ্ঞেস করো না। তুমি তাঁবুর ভেতরে চলে যাও। দেখো, এখন রাতের শেষ প্রহর চলছে।

আবেগে সাবিলা ইরতেগীনের দু'হাত নিজের হাতে নিয়ে তার চোখে লাগাল এবং চুমু খেয়ে ধীরে ধীরে তার তাঁবুর দিকে চলে গেল।

* * *

রাতের শেষ প্রহরে তাঁবুর এই পল্লীতে মধ্যরাতের মতোই নীরবতা। পল্লীর লোকদের মধ্যে জেগে ওঠার কোন তাড়া ছিল না। ইরতেগীন ছিল এই ডাকাতপল্লীর মুকুটবিহীন সম্রাট হাম্মাদের একান্ত দেহরক্ষী। তাকে গোটা তাঁবু এলাকা জুড়ে সর্বত্র টহল দিতে হতো যে কোন ঘোড়া বা উট বাঁধন মুক্ত করে নিয়ে যেতে পারতো সে। যে তাঁবুতে খাবার দাবার থাকতো, সেখান থেকে ইচ্ছেমতো খাবার উঠিয়ে নিলেও তাকে কিছু বলার কেউ ছিলো না।

ইরতেগীন যখন দেখলো সাবিলা তার তাঁবুতে ফিরে গেছে তখন সে তার নিজের তাঁবুতে গেল। সেখান থেকে বর্শা, তীর ধনুক ও তরবারী তুলে নিল। কিছু পরিধেয় কাপড়ও সাথে নিয়ে খাবার দাবারের তাঁবুতে চলে গেল। সেখান থেকে একটা পুটলীতে খাবার ও পানির পাত্র নিয়ে একটি উটের বাঁধন খুলে সেটির গলায় এগুলো বাঁধলো। উটের সাথে প্রয়োজনীয় সবকিছু বেঁধে নিয়ে সে উটকে তাড়া করল।

সাবিলা তার তাঁবুর পর্দা একটু ফাঁক করে সবই দেখছিল। গোটা তাঁবু এলাকাটাই তখন কালো কালো স্তূপের মতো মনে হচ্ছিল। সাবিলার বুকটা দুরুদুরু কাঁপছিল। একটু পর সাবিলা দেখতে পেলো, তাঁবুর এলাকা থেকে একটি উট ধীরে ধীরে বাইরে চলে যাচ্ছে। মনের অজান্তেই তখন সাবিলার ঠোঁটে উচ্চারিত হতে লাগলো দু'আ কালাম। দেখতে দেখতে কিছুক্ষণের মধ্যে উটটি অন্ধকারে হারিয়ে গেলো।

মনের মধ্যে একটা চরম অস্থিরতা নিয়ে বিছানায় গিয়ে দু'হাতে মুখ চেপে পড়ে রইল সাবিলা। কখন সে ঘুমিয়ে পড়ল টেরই পেলো না।

* * *

সাবিলা যখন ঘুম থেকে জাগলো তখন ভরদুপুর। তার শরীরটা খুবই অবসন্ন। জোর করে বিছানা ছেড়ে বসল সাবিলা। রাতের ঘটনা মনে হতেই তার বুকটা ধুকধুক করে উঠলো। খুব ভয় ভয় লাগছিল সাবিলার। মনে হচ্ছিলো, ইরতেগীন তাকে ধোঁকা দিয়ে হাম্মাদকে সবই বলে দিয়েছে।

সে তার তাঁবু থেকে বের হয়ে ইরতেগীনের তাঁবুর পর্দা উঠিয়ে দেখল। না, তাতে ইরতেগীন নেই। তার হাতিয়ার এবং কাপড়-চোপড়ও সেখানে ছিল না। সাবিলা ইরতেগীনের তাঁবু থেকে যখন বের হচ্ছে ঠিক সেই সময় হাম্মাদ তার তাঁবু থেকে বের হলো। সে সাবিলাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলো, ইরতেগীনের তাঁবুতে সে কেন গিয়েছিল?

চোখে মুখে আতঙ্কের ভাব ফুঁটিয়ে সাবিলা বললো, আমি ইরতেগীনকে দেখতে গিয়েছিলাম সে তাঁবুকে আছে কি নেই। আমার আশঙ্কা হচ্ছে সে জীবিত নেই, তাকে খুন করা হয়েছে।

খুন? মনে হচ্ছে তোমার মাথা ঠিক নেই। এখানে কে কাকে খুন করবে? বিস্মিত কণ্ঠে বললো হাম্মাদ।

করতে পারে। তুমি জানো না। গোগীল খুন করতে পারে। আমার আশঙ্কা হচ্ছে, গোগীল ইরতেগীনকে গায়েব করে ফেলেছে। এখন আমার পালা। আমি তোমাকে একথা বলার সুযোগই পাইনি।

তুমি যখন আমাকে এই তাঁবুতে নিয়ে এসেছিলে, তখনই একবার গোগীল আমাকে কুপ্রস্তাব দিয়েছিলো, লোভও দেখিয়েছিল। লোভে কাজ না হওয়ায় আমাকে হুমকি দিয়ে বলেছিল আমি যেন তোমাকে ত্যাগ করে তার সাথে চলে যাই। কিন্তু আমি তাকে সাফ জানিয়ে দিয়েছিলাম, আমি আমার মুনিবকে ধোঁকা দিতে পারবো না।

এরপর সে গতকাল আবার এসেছিল। গত রাতে তুমি যখন তোমার তাঁবুতে চলে গিয়েছিলে আমি আমার তাঁবুতে না গিয়ে একটু ঝর্ণার পাশটায় পায়চারী করছিলাম। আমি জানতাম না গোগীল আমার পিছু নিয়েছে। সে আমার কাছে এসে আমাকে নানাভাবে প্ররোচিত করে অপহরণ করতে চাইলো। আমি তাকে বাধা দিলে সে আমার দিকে হাত বাড়ালো। নিজেকে একাকী ভেবে আমি ভীষণ ভড়কে গিয়েছিলাম কিন্তু হঠাৎ কোত্থেকে জানি ইরতেগীন এসে উপস্থিত হলো। আসলে আমার অজান্তেই সে আমার নিরাপত্তার জন্যে ধারে কাছেই কোথাও অবস্থান করছিল।

গোগীল ইরতেগীনকে গোলাম বলে খুব গালমন্দ করলো এবং সেখান থেকে চলে যাওয়ার নির্দেশ দিলো। কিন্তু ইরতেগীন বললো–

তুমি জানো না গোগীল! সাবিলা আমার মুনিব। আমার মুনিবের জন্যে আমি জীবন দিয়ে দেবো। কিন্তু ওকে নিয়ে যেতে দেবো না।

তখন গোগীল ইরতেগীনকে উদ্দেশ্য করে বললো, আজ রাতই তোর জীবনের শেষ রাত। যা, যদি জীবিত থাকতে চাস, তাহলে মুনিবের তাঁবুতে গিয়ে ঘুমা, নয়তো খতম হয়ে যাবি। এরপর গোগীল ফুসফুস করতে করতে চলে গেলো। ইরতেগীন গোগীলের ক্ষোভ ও হুমকিকে পাত্তা না দিয়ে আমাকে আমার তাঁবুতে পৌঁছে দিয়ে চলে গেলো। আমি জানি গোগীল খুবই হিংস্র। সে নিশ্চয় আজ রাতের মধ্যেই ইরতেগীনকে খুন করে গায়েব করে ফেলেছে।

সাবিলার কথা শুনে হাম্মাদ বিন আলী ক্ষোভে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলো এবং বাঘের মতো হুংকার ছাড়তে লাগলো। সেই সাথে সে গোগীলকে ডেকে পাঠালো।

আমি জানি গোগীল! তুমিও একটি গোত্রের সর্দার। কিন্তু তুমি কি ভুলে গেছো আমি কে? ক্ষুব্ধ কণ্ঠে গোগীলের উদ্দেশ্যে বললো হাম্মাদ।

আমি তোমাকে ক্ষমা করে দেবো, আমার লোকটিকে তুমি ফিরিয়ে দাও।

কাকে ফিরিয়ে দেব? জিজ্ঞাসু কণ্ঠে বললো গোগীল।

ইরতেগীনকে। সে আমার একান্ত নিরাপত্তারক্ষী। গত রাতে যে তোমার ও সাবিলার মধ্যে বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলো?

হাম্মাদের ক্ষোভ ও প্রশ্নের কারণ বুঝতে না পেরে গোগীল দারুন বিস্মিত ও অবাক হলো। হাম্মাদের এমন প্রশ্নের কোন কূল কিনারা খুঁজে পাচ্ছিল না। কেন? কিসের ভিত্তিতে হাম্মাদ তাকে এমন প্রশ্ন ও অভিযোগ করছে। ক্ষোভই বা দেখাচ্ছে কেন?

গোগীলের যখন এই অবস্থা তখন এই সুযোগে সাবিলা হাম্মাদের কানে কানে বললো, ধূর্ত গোগীল এখন সবকিছু এড়িয়ে যাওয়ার জন্য না জানার ভান করছে। সাবিলার এ কথায় হাম্মাদ গোগীলের ওপর আরো বেশি ক্ষেপে গেল।

সে গোগীলের উদ্দেশে বললো, গোগীল! একটি গোলাম ও রক্ষিতার জন্যে আমার সাথে শত্রুতা বাঁধাতে তুমি একটুও চিন্তা করছো না? অথচ এ

মুহূর্তে আমাদের মধ্যে জোটবদ্ধতা ও ঐক্য খুবই প্রয়োজন। আমি ইচ্ছা করলে সাবিলার মতো দশটি রক্ষিতা তোমাকে এনে দিতে পারি। কিন্তু ওকে তুমি আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়ার জন্য আমার নিরাপত্তা রক্ষীকে গায়েব করে দিয়েছো। তুমি কেমন সর্দার? কোন সরদারের পক্ষে কি একাজ করা মানায়? আমার সাথে শত্রুতা বাঁধিয়ে তুমি সর্দারী করতে পারবে? তুমি কি মনে করো তোমার পক্ষে এরপরও জীবিত থাকা সম্ভব?

এমন ঘটনার সাথে আদৌ জড়িত ছিল না গোগীল। তাই এ অভিযোগ সে মেনে নিতে পারছিল না। কথায় কথায় অনেক কথা হয়ে গেলো। তর্ক-বিতর্কে উভয়েই উভয়ের প্রতি চরম আক্রোশে ফেটে পড়লো।

এক পর্যায়ে হাম্মাদ সব গোত্রপতিদেরকে একত্রিত করে সাবিলাকে বললো, তুমি যা বলেছো, তা এদেরকে শোনাও। সাবিলাও কোন প্রকার জড়তা ছাড়া হুবহু যে কথা হাম্মাদকে বলেছিলো তাই সর্দারদের শুনিয়ে দিলো।

সাবিলার কথা যাচাই না করেই হাম্মাদ তার প্রতি এমন অভিযোগ আনায় রাগে ক্ষোভে গোগীল এই বলে জমায়েত থেকে উঠে গেলো–

ঠিক আছে, আজ থেকে আমার সাথে আর আমার কবিলার সাথে তোমার কোন সম্পর্ক থাকবে না।

ক্ষোভে অপমানে গোগীল উঠে যেই চলে যেতে শুরু করলো, অমনি হাম্মাদ তার পাশে দাঁড়ানো এক প্রহরীর কাছ থেকে ধনুক ছিনিয়ে নিয়ে তীর দান থেকে একটি তীর ধনুকে ভরলো এবং কালবিলম্বন না করে গোলীলের দিকে ছুঁড়ে দিলো। তীরটি গোগীলের পিঠে বিদ্ধ হয়ে এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে গেলো। সাথে সাথেই গোগীলের দেহটা মাটিতে পড়ে ছটফট করতে লাগল।

সেদিন রাতেই হাম্মাদ বিশেষ একটি অনুষ্ঠান ও গণজমায়েত করে গোগীলের জায়গায় আরেকজনকে গোগীল গোত্রের গোত্রপতি ঘোষণা করলো। সেই জমায়েতে হাম্মাদ বললো, আমার ক্ষুব্ধ প্রতিশোধের জন্য আমি তোমাদের কাছে দুঃখ প্রকাশ করছি। আমি জানতাম আমার লোককে আমি ফিরে পাবো না। কারণ গোগীল তাকে খুন করে গায়েব করে দিয়েছে। তবুও তোমাদের সবার স্বার্থে আমাকে এই কঠোর কাজটি করতে হয়েছে যাতে ভবিষ্যতে কোন গোত্রপতির দ্বারা এমন ঐক্য বিনষ্টকারী ঘটনা না ঘটে এবং নেতৃত্বের অবস্থান থেকে কেউ বিচ্যুত না হয়।

* * *

সাজানো অপরাধে গোগীল যখন হাম্মাদের প্রতিহিংসার শিকার হয়ে নিহত হলো, ততোক্ষণে ইরতেগীন দ্রুত উট তাড়া করে অনেক দূর চলে গেছে। দীর্ঘ সময় পেরিয়ে যাওয়ার পরও ইরতেগীন যখন দেখলো কেউ তার পিছু ধাওয়া করছে না, তখন সে স্বাভাবিক গতিতে সামনে চলতে লাগলো। রাতভর সে উর্ধ্বশ্বাসে উট হাঁকিয়েছে। রাত পেরিয়ে ভোরের আলো চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়লে বার বার পিছনের দিকে তাকিয়ে ইরতেগীন দেখছিল তাকে কেউ তাড়া করছে কি না। কিন্তু সূর্য অনেকটা উপড়ে উঠে যাওয়ার পরও পিছু ধাওয়াকারী কাউকে না দেখতে পেয়ে সে নিশ্চিন্ত মনে যথাসম্ভব দ্রুত গন্তব্যে পৌছার সিদ্ধান্ত নিলো।

এদিকে হাম্মাদ সকল গোত্রপতিকে গযনীর হজ্জ কাফেলা সম্পর্কে ধারণা দিল। সবশেষে নির্দেশ দিলো, আগামীকাল তোমরা সবাই নিজ নিজ গোত্রের লোকদেরকে কিয়াদ নামক জায়গায় জড়ো করবে। সে দিনই সকল বেদুঈন গোত্রপতি তাদের লোকজন নিয়ে কিয়াদের দিকে রওয়ানা হয়ে গেলো। হাম্মাদও জায়গা ত্যাগ করে অন্যত্র চলে গেলো।

হাম্মাদ যখন তার স্থায়ী ঠিকানায় পৌছলো তখন গযনী থেকে তার পাঠানো এক লোক খবর নিয়ে এলো। আগন্তুক তাকে জানালো, গযনীর হজ্জ কাফেলায় লোক অনেক বেড়ে গেছে। বিপুল সংখ্যক ব্যবসায়ীও এই কাফেলায় যোগ দিয়েছে।

সে হাম্মাদকে আরো জানালো, পথে পথে এই কাফেলার সঙ্গে আরো অনেক লোক যোগ দেবে। তবে হাম্মাদের সংবাদবাহক একথা বলতে পারেনি, হজ্জ কাফেলার নিরাপত্তার জন্য গযনীর সুলতান সেনাবাহিনীর কোন ইউনিটকে কাফেলার সঙ্গে পাঠাচ্ছেন কি না।

* * *

হেযায পর্যন্ত সেনাবাহিনীর কোন ইউনিটকে কি করে আমি পাঠাবো? সুলতান মাহমূদ হজ্জ কাফেলার এক প্রতিনিধিকে বলছিলেন। আমার হাতে তো সৈন্য খুবই সীমিত। তাছাড়া সীমান্তের অবস্থা ভালো না। এজন্য উচিত দেশের প্রতিটি লোকেরই সামরিক প্রশিক্ষণ নেয়া।

হজ্জ কাফেলার একটি প্রতিনিধি দল সুলতান মাহমূদের কাছে গিয়ে আবেদন করেছিলো, এবারের হজ্জ কাফেলা অনেক বড়। তাছাড়া বহু ব্যবসায়ী অনেক মূল্যবান পণ্য নিয়ে হজ্জ কাফেলায় শরীক হয়েছেন। সার্বিক দিক বিবেচনা করে নিরাপত্তার স্বার্থে কাফেলার সাথে একটি সেনা ইউনিট থাকা দরকার।

আমি জানি, প্রতি বছরই হজ্জ কাফেলা ডাকাত ও লুটেরাদের হাতে নাজেহাল হয়। হজ্জযাত্রীদেরকে আমি সব ধরনের সেবা দিতে চেষ্টা করি; কিন্তু মক্কা পর্যন্ত এদের সাথে কোন সেনা ইউনিট পাঠানোর ব্যাপারটি আমার কাছে অসম্ভব মনে হচ্ছে– বলছিলেন সুলতান। যেহেতু অনেক বড় কাফেলা, তাই তাতে অশ্বচালনাকারী এবং যুদ্ধ করার মতো বহু লোক নিশ্চয় আছে। তাছাড়া সেনাবাহিনীর অনেকেই এবার হজ্জে যাচ্ছে। আপনাদের উচিত হবে সবাই সশস্ত্র থাকা। প্রত্যেকেরই তীর-ধনুক, ঢাল-তরবারী সাথে রাখা প্রয়োজন। এতো বড় কাফেলাকে কেউ লুট করার সাহস পাবে বলে আমার মনে হয় না। কাফেলা ছোট হলে লুট হওয়ার আশংকা থাকে। আমার মনে হয় আপনারা নির্ভয়েই যেতে পারেন।

হজ্জ প্রতিনিধিদলকে বিদায় করে সুলতান মাহমূদ তার সেনাবাহিনীর কর্মকর্তাদের ডাকলেন। এবং তার উপদেষ্টাদেরও ডেকে পাঠালেন। সবাই একত্রিত হলে তিনি সবাইকে উদ্দেশ্য করে বললেন— হজ্জ প্রতিনিধিদলকে আমি হতাশ করে ফিরিয়ে দিয়েছি। তারা হজ্জ পালন করতে যাচ্ছেন। আমার উচিত ছিলো তাদের আবেদনে সাড়া দেয়া। কিন্তু আপনারা তো দেখতেই পাচ্ছেন, এ মুহূর্তে সেনাবাহিনীর এখানে থাকা বেশি প্রয়োজন। হিন্দুস্তান থেকেও খারাপ সংবাদ এসেছে। কন্নৌজের দুর্গপতি রাজ্যপাল কন্নৌজে নিয়োজিত আমাদের সেনাপতির কাছে গিয়ে আত্মসমর্পণ করে মৈত্রীচুক্তির আবেদন করেছে এবং যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতির ভর্তুকি ও খাজনা দিতে অঙ্গীকার করেছে। এর বিনিময়ে বেড়া নাশক স্থানে সে নতুন করে রাজধানী পত্তনের অনুমতি চাচ্ছে।

কিন্তু এতে লাহোর, গোয়ালিয়র ও কালাঞ্জরের রাজারা ক্ষেপে গেছে। তারা রাজ্যপালের শত্রুতে পরিণত হয়েছে। এরা রাজ্যপালকে তাদের সহযোগী করে আমাদের সাথে চূড়ান্ত বোঝাপড়া করতে চাচ্ছিলো। জানা

নেই, এই পরিস্থিতিতে কোন দিন আবার আমাদেরকে হিন্দুস্তান রওয়ানা করতে হয়।

* * *

হজ্জ কাফেলা রওয়ানা হওয়ার চূড়ান্ত প্রস্তুতি নিয়ে ফেলেছিল। যে প্রতিনিধিদল সুলতান মাহমূদের কাছে নিরাপত্তা বাহিনীর আবেদন নিয়ে গিয়েছিল তারা ফিরে এসে সবাইকে বললো—সুলতান সবাইকে অস্ত্রশস্ত্র সাথে নিয়ে যেতে বলেছেন। রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে বিভিন্ন অভিযানে সেনাদল ব্যস্ত থাকায় হজ্জ কাফেলার সাথে সেনাদল দেয়া সম্ভব হচ্ছে না।

এ সংবাদ পাওয়ার পর হজ্জ কাফেলার লোকদের অস্ত্রশস্ত্র যোগাড় করার জন্য আরো দু'দিন সময় বাড়ানো হলো। দু'দিনপর পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে কাফেলা রওয়ানা হয়ে যাবে।

পরদিন যথারীতি সুলতান মাহমূদ তার কক্ষে বসা। এমন সময় দারোয়ান এসে খবর দিলো, ইরতেগীন নামের এক লোক দীর্ঘ সফর করে খুবই করুন অবস্থায় এখানে এসেছে। সে এসেই বলেছে, হজ্জ কাফেলাকে যাত্রা মুলতবী করতে বলো, আর জলদী আমাকে সুলতানের কাছে নিয়ে চলো। জরুরী বার্তা আছে।

হজ্জ সংশ্লিষ্ট যেকোন ব্যাপারে সুলতান মাহমূদ ছিলেন খুবই সতর্ক। তিনি হাজীদের ব্যাপারে অন্যসব কাজ মুলবতী রেখে আগে তাদের বিষয়াদি দেখতেন।

সংবাদ বাহকের কাছে হজ্জ সংশ্লিষ্ট খবর শুনে তিনি তাৎক্ষণিক নির্দেশ দিলেন, আগন্তুককে আমার কাছে নিয়ে আসা হোক।

ইরতেগীন প্রায় জীবন্ত লাশে পরিণত হয়েছিল। তার মুখ চরম ফ্যাকাসে হয়ে পরেছিল এবং চোখ বন্ধ হয়ে আসছিল। ঠিকমতো পায়ের ওপর ভর করে দাঁড়াতে পারছিল না। তাকে একটা চেয়ারে হেলান দিয়ে বসানো হলো এবং তাৎক্ষণিক পানীয় ও খাবার সামনে হাজির করা হলো। কিছুটা পানীয় এবং খাবার গ্রহণের পর তার শরীরে সতেজতা ফিরে এলো। কিছুক্ষণ নীরব থেকে হঠাৎ সে দাঁড়িয়ে সুলতানের উদ্দেশ্যে বললো—

গযনী ও খোরাসানের সুলতানের কাছে গোস্তাখী মাফ চেয়ে নিচ্ছি। বিগত পঁচিশ দিনের মধ্যে আমি একদণ্ড দাঁড়ানোর অবকাশ পাইনি। প্রথমে যাত্রা শুরু করেছিলাম উটে সওয়ার হয়ে। কিন্তু পাহাড়ি এলাকায় পৌঁছে এক লোককে উটটি দিয়ে তার কাছ থেকে ঘোড়া নিয়ে নিয়েছি।

এভাবে পথিমধ্যে আরো দু'বার ঘোড়া বদল করেছি। ক্লান্ত-শ্রান্ত আমার আধমরা ঘোড়াগুলো অন্যদের দিয়ে তাদের কাছ থেকে তাজা ঘোড়া নিয়ে ঘোড়ার পিঠেই খাবার খেয়েছি, ঘোড়ার পিঠেই রাত কাটিয়েছি, এক মুহূর্তও বিশ্রাম নেইনি। ফলে দেড় মাসের দূরত্ব আমি মাত্র পচিশ দিনে অতিক্রম করেছি।

সেই কথাটি বলো, যে কথা বলার জন্য এমন কষ্ট শিকার করে তুমি আমার কাছে এসেছো? মমতামাখা কণ্ঠে বললেন সুলতান।

আপনি যদি হজ্জ কাফেলার সাথে দুই ইউনিট সেনা পাঠাতে না পারেন তাহলে এবারের হজ্জ যাত্রা মুলবতী করে দিন। কারণ, হজ্জ কাফেলাকে লুটে নেয়ার জন্যে ডাকাত ও লুটেরা দল একটি পূর্ণ সেনাবাহিনীর শক্তি নিয়ে কিয়াদ মরুভূমিতে অবস্থান করছে। বাগদাদের খলীফার আশির্বাদ আছে এই ডাকাতদের প্রতি। বলা চলে খলীফা নিজেই ডাকাতদের পৃষ্ঠপোষকতা দিচ্ছেন। বললো ইরতেগীন।

কি বলছো তুমি, বাগদাদের খলীফা ডাকাতদের পৃষ্ঠপোষকতা করছেন?

গযনীর সুলতানের যদি এক নগণ্য গোলামের কথা পছন্দ না হয় তবে গোলাম ক্ষমা প্রার্থনা করছে। সরাসরি খলীফার পৃষ্ঠপোষকতা যদি নাও থাকে তবে তার দরবারের সেনাপতি ও কর্মকর্তাদের পৃষ্ঠপোষকতা নিশ্চয় আছে। তাও যদি বাস্তবে না ঘটে থাকে তবে আমার একথা মোটেও মিথ্যা মনে করবেন না। হেযায়ের সকল লুটেরা বেদুঈন গোষ্ঠী হাম্মাদ বিন আলীর নেতৃত্বে কিয়াদ মরুভূমির যে জায়গাটি বেশি টিলাও বালিয়াড়ীতে ভরা সেখানে জড়ো হয়েছে গযনীর হজ্জ কাফেলা লুটে নেয়ার জন্য। এরা শুধু পণ্যসামগ্রীই লুট করবে না, হজ্জ কাফেলার সাথে থাকা সকল যুবতী নারীদের অপহরণ করবে।

ডাকাত সর্দার হাম্মাদ বিন আলী সম্প্রতি বাগদাদ থেকে এসেছে। আমি হাম্মাদের সাথে ছিলাম। হাম্মাদ প্রথমে খলীফার সবচেয়ে বিশ্বস্ত এবং

প্রভাবশালী সেনাপতির সাথে সাক্ষাত করে। তার পর আরো দু'জন উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তার সাথে দেখা করে। পরবর্তীতে এরাই ডাকাত সর্দার হাম্মাদ বিন আলীকে খলীফার কাছে নিয়ে যায়। খলীফার একান্ত বিশ্বস্ত সেনাপতি ডাকাত সর্দার হাম্মাদকে একজন আন্তর্জাতিক মানের বেদুঈন ব্যবসায়ী বলে খলীফার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। তারা খলীফাকে জানায়, হাম্মাদের ব্যবসা আরব থেকে গযনী পর্যন্ত বিস্তৃত। শুধু তাই নয় সে খলীফার শাসন বিরোধী এবং বিদ্রোহী সকল আরব বেদুঈন জনগোষ্ঠীকে নিজের নিয়ন্ত্রণে এনে খলীফার ভক্ত বানিয়ে ফেলেছে।

ইরতেগীন সুলতান মাহমূদকে হাম্মাদ বিন-আলী কিভাবে কোন প্রক্রিয়ায় গযনীর হজ্জ কাফেলা লুটে নেয়ার চক্রান্ত করেছে সবকিছু বিস্তারিত জানালো। হাম্মাদ কিয়াদ অঞ্চলে কতোজন বেদুঈনকে একত্রিত করেছে তা জানাতেও ভুললো না ইরতেগীন। ইরতেগীন জানালো, আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না, গযনীর কাফেলা লুট করার জন্যে হাম্মাদ পাঁচ হাজার লড়াকু বেদুঈনকে প্রস্তুত করে রেখেছে।

পাঁচ হাজার ডাকাত জড়ো হওয়ার কথা শুনে সুলতান মাহমূদ বেশ অবাক হলেন।

এতো বিপুল সংখ্যক ডাকাত দলের একত্রিত হওয়ার অর্থ হলো, ডাকাতের লোকেরা গযনীতে এসে কাফেলার লোকসংখ্যা দেখে গেছে। তারা জেনে গেছে কাফেলার সাথে ব্যবসায়ীরাও আছে এবং তারা হিন্দুস্তানের নামী দামী মালপত্র নিয়ে যাচ্ছে। ডাকাতের লোকেরা এটাও দেখে গেছে, কাফেলায় হজ্জযাত্রীদের মধ্যে প্রচুর সংখ্যক সেনাবাহিনীর লোকজন রয়েছে যারা মোকাবেলা করতে সক্ষম।

আপনি ঠিক বলেছেন সুলতানে মুহতারাম! ডাকাতের সংবাদ বাহক বলেছে, কাফেলায় দেড় দু'হাজার লোক হতে পারে– বললো ইরতেগীন।

আসলে কাফেলায় নিয়মিত কোন সেনা নেই। সৈনিকদের যদি হজ্জ করার সুযোগ হতো তাহলে সবার আগে আমি হজ্জ করতাম। বললেন সুলতান।

সুলতান এ খবরে গভীর চিন্তায় পড়ে গেলেন। তিনি বললেন, হজ্জগামী কাফেলাকে আমি বাধা দিতে পারি না। যদিও আমার হজ্জে যাওয়ার সুযোগ

হয় না. কিন্তু হজ্জযাত্রীদের সবধরনের সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করা আমার কর্তব্য। হজ্জযাত্রীদের নিরাপত্তার স্বার্থে আমি দেশের নিরাপত্তাকেও ঝুঁকিতে ফেলতে কুণ্ঠাবোধ করবো না।

একথা বলতে বলতে তিনি থেমে গেলেন এবং ইরতেগীনের দিকে গভীর ভাবে তাকিয়ে বললেন—

আমি তো এ পর্যন্ত তোমার নাম পরিচয় পর্যন্ত জিজ্ঞেস করলাম না। তুমি আসলে কে? কি তোমার পরিচয়? তুমি বলছো, ডাকাত দলের সর্দারের একান্ত ব্যক্তি ছিলে তুমি। এরপরও আমাদের প্রতি তুমি এতো দরদ কেন অনুভব করলে? তুমি কি আল্লাহর সেই সৈনিককে ধোঁকা দিতে পারবে, যার ভয়ে হিন্দুস্তানের মন্দিরগুলোর মূর্তিগুলো পর্যন্ত ভয়ে কাঁপে?

আমি নিজ থেকে আসিনি মহামান্য সুলতান! গযনীর এক শহীদ সৈনিকের হতভাগ্য কন্যা আমাকে পাঠিয়েছে। জঘন্য প্রতারণার শিকার হয়েছে সে। তার জীবনের কাফফারা দিয়ে সে গযনীর অন্যান্য মেয়েদের সম্ভ্রম রক্ষা করতে চায়। বললো ইরতেগীন।

সে গযনীর বিপদগ্রস্ত সম্ভ্রমকে রক্ষা করতে সুলতানকে আগে-ভাগেই ব্যবস্থা নেয়ার জন্যে আহবান জানাচ্ছে।

আমি গোলামের পুত্র গোলাম। আমি ঔরসজাতভাবে তুর্কি বাবার সন্তান। কিন্তু গযনীতে আমার জন্ম হয়েছিল।

যে মেয়ে আমাকে পাঠিয়েছে তার নাম সাবিলা। তার বাবা আপনার সেনাবাহিনীর উট ইউনিটের একজন সৈনিক ছিল। সে যুদ্ধে শাহাদতবরণ করেছে। এই শহীদের মেয়ে আমার হৃদয়ে গযনীর মমতা তৈরি করেছে। সুলতানের যদি শোনার অবসর থাকে তবে আমার জীবনবৃত্তান্ত শুনতে পারেন।

ইরতেগীন তার জীবন কাহিনী এবং সাবিলার জীবনকাহিনী সবিস্তারে সুলতানকে শোনালো। একথাও সে সুলতানকে জানালো, সাবিলা কিভাবে তার জীবন বাঁচিয়েছিল এবং কিভাবে সাবিলা তার মনে গযনীর মমতা জাগিয়ে তুলেছে। সবিলার গল্প শুনে সুলতানের চোখ দিয়ে পানি গড়িয়ে পড়ল।

যে জাতির কন্যারা এমন দুরবস্থায় থাকার পরও জাতির মর্যাদা ও নিজের আত্মসত্তাকে লালন করে হৃদয়ের মধ্যে ঈমানের স্ফুলিঙ্গ নিভে যেতে দেয়নি, সে জাতিকে কোন শক্তিই দাবিয়ে রাখতে পারে না। সামনে উপবিষ্ট সরকারি কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে সুলতান বললেন, তোমরা যদি নতুন প্রজন্মকে ঈমান থেকে সরিয়ে পাপের সাগরে ডুবিয়েও দাও, তবুও এক সময় না এক সময় ঈমানের স্ফুলিঙ্গ এই জাতির মধ্যে জ্বলে উঠবে। ঈমানের প্রদীপ নিভিয়ে দিতে পারে এমন কোন শক্তি পৃথিবীতে নেই। আবেগাপ্লুত সুলতান ইরতেগীনের প্রতি হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন—

তুমি গোলাম নও ইরতেগীন! এসো, এগিয়ে এসো। সুলতান তাকে বুকে জড়িয়ে নিয়ে বললেন—

আমরা সবাই গোলাম। তবে কোন মানুষের গোলাম নই আমরা, আমরা সবাই আল্লাহ ও তার রাসূলের গোলাম। এই গোলামী কোন অপমান নয় এই গোলামীতেই রয়েছে মুসলমানদের প্রকৃত মর্যাদাও সম্মান। সুলতান দরাজ কণ্ঠে ঘোষণা দিলেন, হজ্জ কাফেলা অবশ্যই যাবে এবং দুই ইউনিট সেনাও এই কাফেলার সাথে থাকবে। গযনী রাষ্ট্রের সীমানা পাহারার ব্যবস্থা আল্লাহ নিজে করবেন।

* * *

সুলতান অনেকটা আবেগাপ্লুত হয়ে বলে ফেলেছিলেন হজ্জ কাফেলার সঙ্গে সেনাবাহিনী থাকবে। কিন্তু বাস্তবে তিনি কখনো আবেগের বশীভূত হয়ে সেনাদের পরিচালনা করেননি।

কিছুক্ষণ পর তিনি দু'জন সেনাপতি এবং তার সামরিক উপদেষ্টাদের ডাকলেন। তারা এলে তিনি দেশের সীমান্তের অবস্থা, সেনাবাহিনীর অবস্থা এবং হিন্দুস্তান থেকে আসা সামরিক সংবাদের ওপর আলোচনা পর্যালোচনা করলেন। তিনি এব্যাপারটিও আলোচনায় আনলেন, যদি পাঁচ হাজার প্রশিক্ষিত ডাকাত আমাদের বিরুদ্ধে প্রস্তুত হয়ে থাকে, তবে এদের মোকাবেলায় কি পরিমাণ সৈন্য পাঠাতে হবে?

সুলতান বললেন, বেদুঈনরা খুবই লড়াকু হয়ে থাকে। এরা ঘোড়া ও উটকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে মোকাবেলা করতে জানে এবং পালানোর পথটি

সবসময় পরিষ্কার রাখে। এজন্য হজ্জ কাফেলার সাথে ঝটিকা বাহিনীর একটি ইউনিট এবং তীরন্দাজ বাহিনীর একটি ইউনিট পাঠাতে হবে।

সেই সময়ের ইতিহাস ঘাটাঘাটি করেও এ বিষয়টি সম্পর্কে পরিষ্কার হওয়া যায়নি, হজ্জ কাফেলার সাথে যে সেনা ইউনিট দু'টি সুলতান মাহমূদ পাঠিয়েছিলেন, এর নেতৃত্বের ভার কাকে দিয়েছিলেন। একটি সূত্রে জানা যায়, তিনি গযনীর তৎকালীন প্রধান বিচারপতি কাযিউল কুযযাতের কাধে এ দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন।

অবশ্য এ বিষয়টি পরিষ্কার যে তৎকালে যারা প্রধান বিচারপতি হতেন, তাদেরকে সামরিক বিদ্যায়ও পারদর্শী হতে হতো। তারা শুধু ধর্মীয় বিষয়েই ফয়সালা দিতেন না, সামাজিক রাজনৈতিক সব ব্যাপারেই প্রধান বিচারপতির ফায়সালা ছিল গুরুত্বপূর্ণ।

ঐতিহাসিক ফারিশ্তা লিখেছেন, তৎকালীন প্রধান বিচারপতি আবু মুহাম্মদকে সুলতান মাহমূদ হজ্জ কাফেলা এবং সেনাবাহিনীর চীফ কমান্ডারের দায়িত্ব দিয়ে হজ্জে পাঠিয়েছিলেন। তিনি প্রধান বিচারপতির হাতে প্রয়োজনীয় খরচ ছাড়াও আরো অতিরিক্ত ত্রিশ হাজার দিরহাম দিয়েছিলেন, ডাকাতদের সাথে সংঘর্ষে না গিয়ে এই ত্রিশ হাজার দিরহাম ডাকাত সর্দারকে দিয়ে হজ্জ কাফেলা নিরাপদে যাওয়া আসার জন্যে ডাকাত সর্দারের সাথে প্রধান বিচারপতি নিরাপত্তা চুক্তি করে নেন।

সুলতান যখন হজ্জ কাফেলার নিরাপত্তার জন্যে এমন নিরাপদ ব্যবস্থা নিলেন, তখন হজ্জ কাফেলায় আরো লোক শামিল হলো। লোকের সংখ্যা বেড়ে গেলো আরো কয়েক হাজার। এর ফলে তা হয়ে গেলো স্মরণকালের সবচেয়ে বড় হজ্জ কাফেলা। ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, এই অঞ্চল থেকে আগে এতো বড় হজ্জ কাফেলা একসাথে যাওয়ার কথা কখনো শোনা যায়নি।

হজ্জ কাফেলাকে বিদায় জানাতে সুলতান মাহমূদ ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে কাফেলার নেতৃস্থানীয় লোকদের সাথে কথা বললেন এবং অনেক দূর পর্যন্ত কাফেলার সাথে সাথে তিনিও ভ্রমণ করলেন। কাফেলা ছিল কয়েক মাইল দীর্ঘ। সুলতান ঘোড়া দৌড়িয়ে কাফেলার এ মাথা থেকে ও মাথা পর্যন্ত

প্রদক্ষিণ করলেন এবং হাত উঁচু করে যাত্রীদের অভিবাদন জানালেন এবং মুচকি হেসে তাদের সালামের জবাব দিলেন। কাফেলা যাতে সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে হজ্জভ্রমণ শেষে ফিরে আসতে পারে সেজন্য জন্য দু'আ করলেন।

অবশেষে তিনি একটি উঁচু জায়গায় গিয়ে দাঁড়ালেন এবং হজ্জ কাফেলার শেষ ব্যক্তিটি তাকে অতিক্রম করে যাওয়া পর্যন্ত তাদের প্রতি হাত নেড়ে শুভেচ্ছা জানাতে থাকলেন।

এক পর্যায়ে তাঁর কণ্ঠ থেকে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো। তিনি বললেন– এই কাফেলায় যারা হজ্জ করতে যাচ্ছেন তারা কতইনা সৌভাগ্যবান! আল্লাহ তাদের সবাইকে হেফাযত করুন।

নিরাপত্তা আয়োজনের প্রাণপুরুষ ইরতেগীন প্রধান বিচারপতির পাশাপাশি ঘোড়ায় চড়ে কাফেলার সাথেই রওয়ানা হলো।

* * *

কিয়াদ মরুভূমির একটি জায়গায় অসংখ্য উঁচু-নীচু টিলা ছিল। যেগুলোর আকৃতি ছিল উঁচু দেয়ালের মতো। আবার কোনটার আকৃতি ছিল খাড়া পিলারের মতো। এগুলোর মধ্য দিয়েই লোকজন যাতায়াতের জন্যে পথ তৈরি করে নিয়েছিল। জায়গাটি ছিল খুবই ভয়ংকর। পাহাড় টিলার মারপ্যাচে বহু লোক সঠিক পথ হারিয়ে ফেলতো।

ডাকাতির জন্যে এই জায়গাটিকেই বেছে নিয়েছিল হাম্মাদের দল। হাম্মাদের ডাকাতদল এই ভয়ঙ্কর জায়গাটির অনতিদূরে তাঁবু ফেলে অবস্থান নিয়েছিল। অন্তত পাঁচহাজার বেদুঈন জড়ো হয়েছিল ডাকাত দলে। এসব বেদুঈন যেমন ছিল দুঃসাহসী তেমনই লড়াকু এবং যুদ্ধ ও অশ্বারোহণে পটু। এদের কোন ধর্মকর্ম ছিল না। গোত্রপতিদের নির্দেশ মানাকেই এরা ইবাদত মনে করতো। বেদুঈন গোত্রপতিদের প্রধান সর্দার হাম্মাদকে এরা আল্লাহর বিশেষ প্রতিনিধি বলে বিশ্বাস করতো। এরা বিশ্বাস করতো হাম্মাদের মতো সর্দারের উপর কোন তীর তরবারী কাজ করে না। ডাকাতী ও লুটতরাজকে এরা বৈধ পেশা হিসেবেই বিশ্বাস করতো। তাদের দৃষ্টিতে এটি কোন দুষ্কর্ম ছিল না।

হাম্মাদ বিন-আলীর সাথে এই ডাকাতের তাঁবুতেই অবস্থান করছিল সাবিলা। ভেতরে ভেতরে খুবই বিধ্বস্ত ছিল সে। অধীর আগ্রহে সাবিলা অপেক্ষা করছিল হজ্জ কাফেলার জন্যে। এক দিন রাতের বেলায় এক বেদুঈন এসে যখন খবর দিলো—'হজ্জ কাফেলা খুবই বড় এবং কাফেলার সাথে সেনাবাহিনীও আসছে'—শুনে আবেগ উত্তেজনায় সাবিলার সারা শরীর কাঁপছিল। এক বেদুঈন এসে হাম্মাদকে জানালো, হজ্জ কাফেলা কয়েক মাইল দূরে তাঁবু ফেলেছে।

এই ভয়ংকর কিয়াদ মরু অঞ্চলকে নিজের শাসনাধীন অঞ্চল মনে করতো হাম্মাদ বিন-আলী। যেনো এই মরুভূমির বাতাসও তার কথা শুনে। এজন্য সে এই বিশাল কাফেলা ডাকাতির ক্ষেত্রে বাড়তি কোন সতর্কতা এবং প্রস্তুতি নেয়নি। সে ভাবছিল যতো বড় কাফেলাই হোক না কেন লুটেরাদের তীব্র আঘাত ও হামলা সামলানোর ক্ষমতা ওদের আদৌ নেই।

কিয়াদ মরুভূমির এই ভয়ংকর জায়গাটিতে পৌছার আগেই ইরতেগীনের পরামর্শে প্রধান বিচারপতি কাফেলার গতিরোধ করলেন এবং রাতেই সেনা কমান্ডাদের নিয়ে ডাকাতদের প্রতিরোধের কৌশল নির্ধারনে সলাপরামর্শ করলেন। তারা ঠিক করলেন প্রতিটি টিলার ওপর তীরন্দাজ থাকবে। রাতের বেলায় তিনি ডাকাত দলের সংখ্যা ও সার্বিক পরিস্থিতি জানার জন্যে একটি অনুসন্ধানী দলও পাঠালেন। কিন্তু তিনি আক্রমনাত্মক ভূমিকার বদলে আত্মরক্ষার কৌশলকে প্রাধান্য দিলেন। এজন্য তিনি দিনের বেলায় একটি প্রতিনিধি দলকে হাম্মাদের কাছে মৈত্রী ও সমঝোতার প্রস্তাব দিয়ে পাঠালেন। আর রাতের বেলায় গোটা কাফেলাকে সতর্কাবস্থায় রাখলেন এবং কড়া পাহারার ব্যবস্থাও করলেন।

সকাল বেলায় প্রধান বিচারপতি ও কাফেলার নেতাদের পক্ষ থেকে ডাকাত সর্দার হাম্মাদ বিন আলীর কাছে দু'জন অশ্বারোহী দূতকে পাঠানো হলো। তারা গিয়ে হাম্মাদকে প্রস্তাব দিলো, কাফেলাকে যদি নিরাপদে মক্কা যেতে এবং গযনী ফিরতে দেয়া হয় তাহলে তোমাকে পাঁচ হাজার দিরহাম উপঢৌকন হিসেবে দেয়া হবে।

প্রস্তাব শুনে হাম্মাদ ভয়ানক ক্ষেপে গেল এবং এ প্রস্তাবকে সে খুবই অপমানজনক মনে করে বললো—

পাঁচ হাজার দিরহাম? পাঁচ হাজার দিরহাম দিয়ে তোমরা আমার পায়ের ধুলোও কিনতে পারবে না। তোমরা আমাকে অপমান করতে এসেছো। আমি ভিক্ষা করি না।

হাম্মাদ ডাকাতদের দিকে ইঙ্গিত করে দূতদের বললো-তোমাদের নেতাকে গিয়ে আমার শক্তি ও জনবলের কথা বলবে। বলবে এদেরকে কি আমি এক দিরহাম করে দিয়ে ফিরে যেতে বলবো?

তোমাদের কাফেলার সকল ধনসম্পদ আমার। আর সকল যুবতী মেয়েরও মালিক আমি। সম্পদ ও যুবতী মেয়েদেরকে আমার হাতে সোপর্দ করে নিরাপদে তোমরা চলে যেতে পারো।

হাম্মাদ বিন আলী! নিজের শক্তির উপর এতোটা অহংকার করে ফেরাউন সেজো না! আমরা তোমার কাছে কোন আবেদন নিয়ে আসিনি, বন্ধুত্বের পয়গাম নিয়ে এসেছি। বললো এক দূত। সে আরো বললো, হতে পারে কাফেলার লোকজন সবকিছু নিয়েই মক্কায় যাবে। তাদের কিছুই হবে না। উল্টো তোমার লোকদের রক্তে মরুভূমির বালু রঙিন হবে।

একথা শুনে হাম্মাদের ক্ষোভ আরো বেড়ে গেল। সে গর্জন করে বললো, চলে যাও তোমরা। এক্ষণই আমার সামনে থেকে চলে যাও। আমরা কোন মেহমানকে হত্যা করি না, নয়তো এই ধৃষ্টতার জন্যে তোমাদের মাথা উড়িয়ে দিতাম।

অবশেষে দূতেরা ফিরে এলো। পথিমধ্যে তাদের দেখা হলো ইরতেগীনের সাথে। ইরতেগীন দূতকে জিজ্ঞেস করলো, হাম্মাদ কী জবাব দিয়েছে? জবাব শুনে ইরতেগীন হাসলো এবং তীর-ধনুক নিয়ে একটি উঁচু টিলার উপরে চড়ে বসলো।

ডাকাত সর্দার হাম্মাদকে ত্রিশ হাজার দিরহাম দিয়ে মৈত্রীচুক্তি করার জন্যে প্রধান বিচারপতিকে পরামর্শ দিয়েছিলেন সুলতান। এজন্য তিনি নগদ ত্রিশ হাজার দিরহাম প্রধান বিচারপতির হাতে তুলেও দিয়েছিলেন। কিন্তু এতোগুলো দিরহাম ডাকাত সর্দারকে দেয়া ঠিক মনে করেননি প্রধান বিচারপতি। এজন্য তিনি পাঁচ হাজার দিরহামের প্রস্তাব দিয়ে দূত প্রেরণ করেছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন এতো বড়ো ডাকাতদলের সর্দার পাঁচ হাজার

দিরহামের প্রস্তাবকে অপমান মনে করবে। তবুও তিনি তাই করলেন এবং পরোক্ষভাবে ডাকাতদের উস্কানি দিয়ে বললেন- এসো, ক্ষমতা থাকলে ডাকাতি করে যাও।

প্রধান বিচারপতি ফিরে আসা দূতদের কাছে হাম্মাদের জবাব শুনে তখনই সেনাদের কৌশলগত জায়গায় দাঁড় করিয়ে দিলেন এবং গোটা কাফেলাকে পূর্ণ রণপ্রস্তুতি নেয়ার নির্দেশ দিলেন।

অপমানজনক প্রস্তাবে হাম্মাদ বিন আলী প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হলো। ডাকাত সর্দারদের একত্রিত করে গিয়ে কাফেলার উপর আক্রমণের নির্দেশ দিলো।

হজ্জ কাফেলা অবস্থান করছিল টিলার বাইরে। কাফেলার সকল পুরুষ উট ও ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে লড়াইয়ের প্রস্তুতি নিল। আর মেয়েরা আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা বিধানের জন্যে দু'আ করতে শুরু করলো।

ডাকাত সর্দার হাম্মাদ একটি ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে ডাকাতদলের নেতৃত্ব দিচ্ছিল। তার ডানে ছিল দু'জন নিরাপত্তারক্ষী এবং তার আগে আগে একটি কালো পতাকা নিয়ে এক বেদুঈন যাচ্ছিল। ডাকাতদের নেতারা ছিল কুচকুচে কালো এবং ভয়ংকর। সাবিলা দূরের একটি টিলার উপরে দাড়িয়ে ডাকাত দলের অবস্থা এবং হজ্জকাফেলার অবস্থান দেখার চেষ্টা করছিল।

ডাকাতদলকে আসতে দেখে ইরতেগীন উঁচু টিলা থেকে নেমে নীচু টিলার আড়ালে আড়ালে সেই স্থানে চলে গেল, যে পথ দিয়ে ডাকাত দল অগ্রসর হচ্ছিল। একসময় তার নজরে পড়ল ডাকাত সর্দার হাম্মাদ বিন-আলী। হাম্মাদ মাথা উঁচু করে বুক ফুলিয়ে অহংকারী মেজাজে অগ্রসর হচ্ছিল। কিছুটা কাছাকাছি আসার পর ইরতেগীন তার ধনুকে একটি তীর ভরে হাম্মাদের চেহারা তাক করে ছুড়ে দিল। নিক্ষিপ্ত তীর গিয়ে হাম্মাদের কানপট্টিতে আঘাত হানল। তীর বিদ্ধ হওয়ার সাথে সাথে একটা চিৎকার দিয়ে হাম্মাদ ঘোড়ার পিঠ থেকে নিচে গড়িয়ে পড়ল। হাম্মাদের নিরাপত্তারক্ষীরা সর্দারের এই অবস্থা দেখে অবাক ও বিস্মিত। তখনো তারা ব্যাপারটি বুঝে উঠতে পারেনি কি হয়েছে। ইতোমধ্যে আরেকটি তীর এসে পতাকা বহনকারীর বুক ভেদ করে বেরিয়ে গেল এবং পতাকা মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

এ সময় ইরতেগীন দৌড়ে একটি টিলার উপরে উঠে গগন বিদারী চিৎকার করে বললো—

আল্লাহ্‌র কসম' আমি হাম্মাদকে হত্যা করেছি। গযনীর সম্ভ্রমের কসম! বেদুঈনদের পতাকা মাটিতে পড়ে গেছে।

সর্দারকে তীর বিদ্ধ হয়ে মরতে দেখে এবং পতাকা মাটিতে লুটিয়ে পড়তে দেখে ডাকাতরা আতংকিত হয়ে পড়লো এবং তাদের মধ্যে বিশৃংখলা দেখা দিলো। এই সুযোগে প্রধান সেনাপতি সেনাবাহিনীকে আক্রমণের নির্দেশ দিলেন।

ইরতেগীন আগেই প্রধান সেনাপতি আবু মুহাম্মদকে বলেছিল, সে হাম্মাদকে চিনে এবং হাম্মাদকে ধরাশায়ী করাই হবে তার প্রথম কাজ।

প্রধান বিচারপতি ইরতেগীনকে বলেছিলেন, তুমি যদি হাম্মাদকে হত্যা করতে পারো, তাহলে বুক ফাঁটা চিৎকার দিয়ে তা সবাইকে জানিয়ে দিয়ো।

ইরতেগীনের পরিকল্পনা ছিল নিখুঁত। সে সময় মতো হাম্মাদকে তীরবিদ্ধ করতে সক্ষম হয় এবং বেদুঈনদের পতাকাবাহীকে ধরাশায়ী করে উঁচু আওয়াজে সবাইকে জানিয়ে দেয়।

এরপর যুদ্ধ বলতে যা হচ্ছিল তাহলো বেদুঈনদের গণহত্যা। লড়াকু বেদুঈনরা তাদের ঝাণ্ডা ও সর্দারকে হারিয়ে আতংকিত হয়ে পড়েছিল। তারা আক্রমণের চেয়ে আত্মরক্ষায় সচেষ্ট ছিল বেশি। সেনাদের আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্যে বেদুঈন ডাকাতেরা টিলার আড়ালে লুকানোর চেষ্টা করছিল। কিন্তু টিলাগুলো তাদের জন্য মরন ফাঁদ হয়ে উঠলো। টিলার উপরে অবস্থানকারী তীরন্দাজদের তীরবিদ্ধ হয়ে লুটিয়ে পড়ছিল একের পর এক বেদুঈন। আর কেউ পালিয়ে যেতে চাইলে সৈন্যরা তাকে তাড়া করে মেরে ফেলছিল।

ডাকাত ও গযনী বাহিনীর মধ্যে যখন চলছে মরণযুদ্ধ, আহতদের আর্তচিৎকার, ঘোড়া ও উটের হ্রেষাধ্বনি ও কোলাহলের মধ্যেই একটি নারী কণ্ঠের ডাক চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ছিল– ইরতেগীন! ইরতেগীন! অবলা এই নারী ছিল সাবিলা। তাকে গযনীর এক সৈনিক ঘোড়ায় তুলে না নিলে সে হয়তো ঘোড়ার পায়ে পিষ্ঠ হয়েই মারা যেতো।

দিনের প্রথমভাগে শুরু হওয়া এই লড়াই দুপুরের দিকেই শেষ হয়ে গেল। প্রধান বিচারপতি যুদ্ধ শেষে নিরাপদে কাফেলাকে মক্কায় নিয়ে গেলেন। যাওয়ার পথে প্রধান বিচারপতি ইরতেগীনের উদ্দেশ্যে বললেন— তুমি আর এখন থেকে গোলাম নও, স্বাধীন। আর সাবিলা! তুমি গযনীর মর্যাদার প্রতীক, ইসলামের সম্মান। ইসলাম এ ভাবেই কেয়ামত পর্যন্ত টিকে থাকবে।

চতুর্থ খন্ড সমাপ্ত

VAROT OVIJAN : 1
ISBN 984-70109-0000-3 SET